চিত্র সূচী।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
প্রণীত গ্রন্থাবলী।
ছেলে ও ছবি 	৪র্থ সংস্করণ 	।৵০
ছেলে ভুলান ছড়া 	৩য় ,, 	।৴০
রাক্ষস খোক্ষস 	৪র্থ ,, 	।৵০
ভূত পেত্নী 	২য় ,, 	।৵০
খেলা ধূলা 	২য় ,, 	।৴০
চিত্ত রঞ্জন উপন্যাস 	২য় ,, 	১৲
বিশ্ব বৈচিত্র্য 	১৲
পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য 	২য় ,, 	॥০
সেতুবন্ধ যাত্রা 	১॥০
নিত্য পূজা পদ্ধতি 	২য় ,, 	॥০
কন্দর্প কোহিনুর 	২য় ,, 	১৲
বিবাহের প্রীতি উপহার 	।০
দাম্পত্য সোহাগ 	৯ম ,, 	।০
ঠকানে প্রশ্ন 	১৪শ ,, 	৵০
Clerk's Guide 	5th Ed. 	১।০
Complete Correspondence 	8th Ed. 	১৲
Dictionary of Letter Writing 	5th Ed. 	।৵০
Dictionary of Proverbs 	১৲
Leisure Hours 	3rd Ed. 	॥০
Bhagabat Gita (Sanskrit & English) 	5th Ed. 	৸০
S. C. AUDDY & Co.,—Calcutta.

সেতুবন্ধ-যাত্রা।

কলিকাতা হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের সকল দর্শনীয় স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং সিংহলের অপূর্ব্ব বিবরণ।

বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

PRINTED BY B. K. DASS, AT THE "WELLINGTON PRINTING WORKS,"
10, HALADHAR BURDHAN LANE, CALCUTTA.

সূচনা।

আর্য্যাবর্ত্তবাসীর ধারণা নাই যে দক্ষিণ ভারতের মন্দির কিরূপ বিশাল ব্যাপার। আমি আত্মীয়বর্গের সহিত সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করিয়া দাক্ষিণাত্যের গিরিশিখর সদৃশ গগনচুম্বিত গোপুরম্ বিশিষ্ট এক একটী মন্দির দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত, স্তম্ভিত ও পুলকিত হইয়াছিলাম। পূর্ব্বে যখন উত্তর-পশ্চিম ভ্রমণ করিয়াছিলাম তখন মনে ধারণা হইয়াছিল যে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি বোধ হয় কাশী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থের মন্দিরের মত। কিন্তু সেতুবন্ধ-যাত্রার সময় শ্রীক্ষেত্র পার হইয়া যতই দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই শিল্পবিদ্যা-দেবীর প্রিয়তম ভূষণস্বরূপ মনোমুগ্ধকর দেবমন্দির সমূহের বিশাল সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতে লাগিলাম। পূর্ব্বে ভাবি নাই যে আমাকে সেতুবন্ধযাত্রা লিখিতে হইবে। কিন্তু আমাদের এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভক্তহৃদয়রঞ্জক শিল্পনৈপুণ্যের মনোহর বিকাশ যে দাক্ষিণাত্যের দেবমন্দিরে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। উত্তম দ্রব্যের রসাস্বাদন একা উপভোগ করা মহাপাপ, তাই দাক্ষিণাত্যের নবপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় বিশাল সুন্দর মন্দিরগুলির কথা আর্য্যাবর্ত্ত-বাসীর নিকট প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মন্দিরগুলির গঠনপ্রণালী ও গোপুরমের শিল্পনৈপুণ্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হইবে, যেন কোনও অমরভূমিতে উপস্থিত হইয়াছি এবং মন্দিরগুলি সকলের হৃদয়ে আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিবার জন্যই যেন বিশাল আয়তনে উন্নতশিরে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই সমস্ত মন্দির প্রায়শই পঞ্চ বা সপ্ত প্রাকারে বেষ্টিত। তাহাদের কেন্দ্রস্থলে হেমকলসমণ্ডিত বিমান বা গর্ভগৃহে ভগবানের পরম রমণীয়

স্বরূপমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। যেন প্রাণময়, মনোময়, অন্নময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পঞ্চকোষের মধ্যে পরমাত্মার অধিষ্ঠান। মন্দির গুলি এত বড়, যেন এক একটী দেবতার নগর। এক মাইল দুই মাইলব্যাপী এক একটী মন্দিরের কথা শুনিলে কে না বিস্ময়রসে আপ্লুত হইবেন? মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শন করিলে মনে হইবে, যেন পাশ্চাত্য শিল্পবিদ্যা এখনও মাতৃজঠরে বীজাকারে নিহিত রহিয়াছে। ধন্য সেই সকল মহাপুরুষ, যাঁহাদের চেষ্টা, যত্ন, অর্থ ও অধ্যবসায়ের গুণে এখনও মন্দিরগুলি অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, এবং অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বর্ত্তমান সভ্যসমাজের চক্ষে এই সকল মন্দির দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় প্রতিভাত হইবে। দেখিলেই মনে হইবে, কিরূপে এই অদ্ভুত মন্দির সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক মন্দিরেই শত স্তম্ভ বা সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ বর্ত্তমান। আর্য্যাবর্ত্তে এরূপ বিশাল মন্দির বা মণ্ডপ কোন স্থানে নাই। অধিক কি শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরও ইহাদের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। দুর্ব্বল মনুষ্যের হস্তের দ্বারা যে এরূপ অদ্ভুত পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা সহজে ও সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই বলি, যদি পৃথিবীতে যথার্থ স্বর্গীয় শোভা দেখিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে একবার স্বচক্ষে এই সকল মনোমুগ্ধকারী বিশাল দেবমন্দির দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া আসুন।

বিশেষ, ভ্রমণের তুল্য সুখ বোধ হয় পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। ইহাতে জ্ঞানের বিকাশ, মনের সঙ্কীর্ণতা দূর, এবং মানসিক ও দৈহিক উন্নতি লাভ হয়। প্রকৃতিদেবীর স্বহস্তে নির্ম্মিত গিরি, নদী, উপত্যকা, প্রস্রবণ, অরণ্য, সমুদ্র প্রভৃতি দর্শন করিলে মনে শান্তি, প্রীতি ও ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন

লোক, তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ভাষা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি দর্শন করিলে মন বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে থাকে। তখন মনে কত কি ভাবের উদয় হয়। কূপমণ্ডূকবৎ কেবল গৃহে অবস্থান করিলে, এই সকল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে ভ্রমণের বিশেষ আবশ্যক।

বড় দুঃখের বিষয়, বঙ্গভাষায় ভ্রমণবৃত্তান্ত কিছুই নাই। যাহা দুই এক খানি দৃষ্ট হয়, তাহা অতি সামান্য, ও ভ্রমপূর্ণ। বিশেষ দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণ আদৌ নাই। এ ক্ষেত্রে অনেকস্থলে বরদা প্রসাদ বসু মহাশয় তীর্থ-দর্শন নামক পুস্তকে কোন কোন স্থানের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও যথেষ্ট নহে। যাহা হউক, তাঁহার পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী। আমার এই পুস্তকে লৌহবর্ত্ম সন্নিহিত মন্দির গুলির বিষয় এবং দেশের আচার-ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতির বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা সন্নিবেশিত করিয়াছি এবং কতকগুলি চিত্র দিয়াও পাঠকবর্গের আনন্দ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছি এক্ষণে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। আমার সহযাত্রী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের আগ্রহে আমি এতদূর ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষাল বি, এ, মহাশয় পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন; ইতি ১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "সেতু-বন্ধ-যাত্রা" পুস্তক লিখিয়াছেন। এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। আমি সানন্দে এ ভার গ্রহণ করিয়াছি।

বাঙ্গালা ভাষায় ভ্রমণ-কাহিনী বড় বিরল—বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের। দু' এক জন লেখক ইতঃপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিতে যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এই জাতীয় গ্রন্থের অভাব ঠিক্ দূর হয় নাই। ৺বরদা প্রসাদ বসু মহাশয়ের "তীর্থ-দর্শন" বিস্তর শ্লোক-পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইলেও কতকটা অসংযত এবং সাধারণের অনুপযোগী; উহা পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। আশুবাবুর গ্রন্থে সে দোষ দৃষ্ট হয় না। বিশেষ সে গ্রন্থ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং "সেতুবন্ধ-যাত্রা"কেই বর্ত্তমানে আমরা দক্ষিণ-ভারতের একমাত্র ভ্রমণ-কাহিনী বলিয়া ধরিতে পারি।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের 'দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ" নামক গ্রন্থ, নামে দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ হইলেও, বস্তুতঃ মধ্যদেশ-ভ্রমণ মাত্র! তিনি এই গ্রন্থে মধ্য-ভারতের প্রধান প্রধান স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া তাহাদের কথাই বর্ণনা করিয়াছেন; প্রকৃত দক্ষিণ-ভারতের দর্শনীয় স্থানগুলির কোনও বর্ণনা এই গ্রন্থে স্থান পায় নাই। সুতরাং এই গ্রন্থকে আমরা দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণ-কাহিনী বলিতে পারিলাম না। এতদ্ব্যতীত যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থে সমগ্র ভারতের ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের আকার প্রায়ই অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণ-কাহিনী বঙ্গভাষায় একরূপ নাই বলিলেও চলে।

আমি যখন দাক্ষিণাত্যের কিছুই দেখি নাই, তখন মনে করিতাম দাক্ষিণাত্যে বুঝি তেমন কিছুই দেখিবার নাই। আশুবাবুর নিকট তাঁহার ভ্রমণের গল্প শুনিয়া প্রথমে আমার সে ভ্রম দূর হয়। উত্তর-

ভারতের দেবালয় গুলি অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতের গোপুরম বিশিষ্ট গিরিশিখরসদৃশ উচ্চ উচ্চ মন্দির গুলি অনেক বৃহৎ ও অধিকতর শিল্পনৈপুণ্যে পরিপূর্ণ; না দেখিলে তাহাদের স্বরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে না। বিশেষ প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্য্যেও এক বিষয়ে দক্ষিণভারত উত্তর-ভারতের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। সাগর ও পর্ব্বত— প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এই দুইটী প্রধান উপকরণ। দক্ষিণ ভারতের এই দুইটীই আছে, কিন্তু উত্তর-ভারতের একটী নাই—সাগর নাই। সাগর দক্ষিণ-ভারতের বড় গৌরবের সামগ্রী! চিরমলয়মারুতস্নিগ্ধ শৈলশিখর-মালা-সমাচ্ছন্ন পূর্ব্বঘাট উপকূলে বসিয়া যিনি একবার নবোদিত রবির তরুণ কিরণমালা দর্শন করিয়াছেন, তিনিই এই কথাটী সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন। চিল্কার শৈলশিখরমালাবিক্ষিপ্ত দিগন্তবিস্তৃত স্থির, শান্ত অম্বুরাশি, ওয়ালটেয়ারের মৃদুনিনাদধ্বনিত সফেননীলোর্ম্মিমালা-ধৌত প্রস্তরাবদ্ধ অপূর্ব্ব বেলাভূমি, দূরাগতসিন্ধুবারি-সেবিত অপূর্ব্ব শ্যামলশোভাস্নিগ্ধ সিংহাচল ও বালাজীর অত্যুচ্চ শৃঙ্গ, প্রাকৃতিক মাধুর্য্য-জড়িত এবং আয়াসকল্পিতসৌন্দর্য্য মান্দ্রাজের অপূর্ব্ব হারবার, এই সকল দেখিলে মনে হয়, জগতে আর বুঝি এমন কিছু কোথাও নাই,— কোথাও থাকিতে পারে না। সাগরের সেই বিশাল গম্ভীর ভাব, পর্ব্বতের চিররমণীয় বিশালত্বের সহিত মিশিয়া মানবের ক্ষুদ্র মনকে এমন প্রবল ভাবে আঘাত করে যে, সেই আঘাতে মানুষ আপনাকে একবারে ভুলিয়া যায়। আপন, পর, ভূত, ভবিষ্যৎ সকল ভুলিয়া যাইয়া কি এক বিশাল সাম্যভাবে সে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। সেই সকল দেশের অপূর্ব্ব বর্ণনা কি বঙ্গভাষার আদরের সামগ্রী নহে?

কিন্তু কেবল প্রাকৃতিক শোভাসম্পদের কথাই বলিতেছি কেন? শিল্পনৈপুণ্য ও পুরাতত্ত্বেও দাক্ষিণাত্যের গৌরব কত অধিক তাহা আমাদের জানা নাই। ভুবনেশ্বর, পুরী, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, সীমাচল,

তাঞ্জোর, মাদুরা, কাঞ্চীপুর রামেশ্বর প্রভৃতির শিল্পভাণ্ডার গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যদি সীতারাম পড়িয়া থাক, একবার বঙ্কিম বাবুর ললিতগিরির বর্ণনা স্মরণ কর। কনারকের ভগ্নস্তূপ দেখিয়াছ কি ? না দেখিয়া থাক, একবার সেই কথা এই গ্রন্থে পাঠ কর—আমি বলিতেছি, নিশ্চিত মোহিত হইবে। তাজমহলের এত গৌরব করিয়া থাক, যদি একবার ভুবনেশ্বর দেখিতে! উজ্জ্বল মণিমাণিক্যে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় নাই, যদি একবার এইখানে আসিয়া সেই সৌন্দর্য্য সুধু প্রস্তরখণ্ডে অঙ্কিত দেখিতে! ত্রিচিনাপল্লীর, সপ্তপ্রাকারাবদ্ধ এক মাইলব্যাপী শ্রীরঙ্গজীর বিশাল মন্দির, মেডুরা ও রামেশ্বরের, সহস্রস্তম্ভোপরি স্থাপিত অপূর্ব্ব মণ্ডপ, ও নানা কারুকার্য্যপূর্ণ গোপুরম্‌বিশিষ্ট প্রকাণ্ড মন্দির শ্রেণী এই সকল যদি একবার দেখিতে! তোমার ঘরের কোণে ভুবনেশ্বর রহিয়াছে, একবার সেইখানে যাইয়া বিশাল মন্দিরের নিম্ন হইতে উপরের দিকে চাও না? মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর প্রভৃতি দেবালয় গুলির দিকে দেখ না? জোড়া-হীন, বন্ধনহীন, বিশাল, প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ড গুলির প্রতি চাহিয়া, দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরের গোপুরম্ গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, একবার ভাব দেখি, কেমন শিল্পিগণ এইরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত মন্দির সকল গঠিত করিয়াছিলেন!

শিল্প-কথার পরে দাক্ষিণাত্যের আর একটা সম্পত্তির দিকে আমাদিগের লক্ষ্য করিতে হইবে। উহা দাক্ষিণাত্যের দেবালয় গুলির বিশালত্ব! দাক্ষিণাত্যের মন্দির গুলি আকারে অতি বিশাল! তেমন উচ্চ, প্রকাণ্ড, বিশাল মন্দির উত্তর ভারতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আশুবাবু প্রবীণ ভ্রমণকারী—তিনি ভারতকে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে এক একবার করিয়া অতিক্রম করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে দ্বারকা এবং হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। আমার ভ্রমণের দৌড় দাক্ষিণাত্যে ততদূর নহে। কিন্তু তথাপি আমি যতদূর দেখিয়াছি,

ততদূর দেখিয়াই সেখানকার মন্দির গুলির বিশালত্বের অনেকটা আভাস পাইয়াছি। ভুবনেশ্বর, পুরী, সীমাচল—এই সকল মন্দির দেখিলে দর্শকের মন বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু আশুবাবুর নিকট শুনিয়াছি, দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় ইহারাও নাকি অনেক হীন। ত্রিচিনাপল্লী, তাঞ্জোর, চিদাম্বরম্, মাদুরা, রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানের মন্দির দেখিয়া যাহারা এই সকল মন্দির দর্শন করেন, তাহাদের চক্ষে ইহাদের বিশালত্ব বিলুপ্ত হয়। আশুবাবুর মুখে এ সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিয়াছি। তিনি সপরিবারে রামেশ্বর গিয়াছিলেন, এবং যাইবার সময় এবং আসিবার সময় উভয়-কালেই পুরী ও ভুবনেশ্বর দর্শন করেন। শুনিয়াছি, যাইবার সময় এই উভয় মন্দির দেখিয়া তাঁহারা যেরূপ বিশালত্ব অনুভব করিয়াছিলেন, আসিবার কালে তেমন কিছুই করেন নাই। বরং আশু বাবুর আত্মীয়বর্গ নাকি বাটী প্রত্যাবর্ত্তন কালে, পুরীর মন্দির দেখিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"শ্রীক্ষেত্রের মন্দির এমন ছোট হইয়া গিয়াছে কেন?" এই ঘটনা হইতেই দাক্ষিণাত্যের মন্দির গুলির বিশালত্বের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

দাক্ষিণাত্যের এই কয়েকটী অপূর্ব্বত্ব দেখিয়াই বোধ হয় আশু বাবু সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়াও এই দক্ষিণ-ভারতের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতেই উৎসাহিত হইয়াছেন। যতদিন রেল গাড়ী হয় নাই, ততদিন রামেশ্বর বাঙ্গালীর নিকট একবারেই অপরিচিত ছিল। সহস্রের মধ্যে একজনও কালে-ভদ্রে কদাচ এই সুদূর তীর্থে গমন করিত কিনা সন্দেহ। রেলগাড়ী খুলিবার পরও অবস্থা প্রায় তদ্রূপ রহিয়াছে। এখন অনেকে রামেশ্বর দর্শন করিতে যান বটে, কিন্তু তথাপি যত লোক মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি দর্শন করিতে যান, রামেশ্বরের যাত্রীর সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক কম। ইহার প্রধান কারণ, এই দেশ সম্বন্ধে

বাঙ্গালীর অজ্ঞতা! এই দেশের তীর্থস্থানগুলিতে কোন্ পথে যাইতে হয়, কোথায় কিরূপ ব্যয় পড়ে, কোথায় যাইয়া কি ভাবে থাকিতে হয়, সে দেশের লোকের আচার-ব্যবহার কেমন, কোন্ কোন্ স্থানে কি কি দর্শনীয় বস্তু আছে, সেই সকল তীর্থস্থান গুলির মধ্যে কোন্‌টীর কেমন মাহাত্ম্য—এই সকল বিষয় তাহারা কিছুই জানে না। সুতরাং তাহাদের এই সকল স্থান দেখিবার বিশেষ আগ্রহ বা উৎসাহও জন্মে না। কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থান হইতে সামান্য একখণ্ড শিলা বা সামান্য একটী বৃক্ষ কিংবা মন্দির দেখিয়া আসিয়াই আমাদের পিসিমা-দিদিমাগণ যেরূপ অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব গল্পের সৃষ্টি ও অবতারণা করেন, যদি এই সকল স্থান সম্বন্ধেও তাঁহারা ঐরূপ করিতেন, তাহা হইলে এই স্থান গুলিও বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানের ন্যায় বঙ্গবাসীদিগের নিতান্ত পরিচিত হইত। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, এই দাক্ষিণাত্যগামিনী দিদিমা-পিসিমার অভাবেই আজকাল দক্ষিণ-ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থগুলি বাঙ্গালীজনসাধারণের অপরিচিত। আমাদের একান্ত সৌভাগ্য যে আশুবাবু আজ এই দিদিমা-পিসিমা সম্প্রদায়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। যে অপূর্ব্ব শোভাসম্পৎশালী রম্য দেবালয় এত দিন কষ্ট-অসহিষ্ণু বাঙ্গালীর নিকটে চিররুদ্ধ ছিল, তাহা আজ আশুবাবুর চেষ্টায় মুক্ত হইল। অবশ্য তিনি এ কার্য্যে কতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা সাধারণের-বিচার্য্য। কিন্তু তিনি যে এই সব অজ্ঞাত তথ্য আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আমার নিকটে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় বলিয়া মনে হয়। এইরূপ একটী গুপ্ত মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করাই প্রতিষ্ঠার একটী উত্তম সোপান।

আমরা আজ আশুবাবুর এই মহৎ অনুষ্ঠানটীকে সাদরে বঙ্গভাষার মন্দিরে অভিনন্দন করিতেছি।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়।*

---

* উত্তর পশ্চিম ভ্রমণ প্রণেতা।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

হাবড়া হইতে পুরী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

খুরদা হইতে বেজওয়াড়া।

তৃতীয় অধ্যায়।

গুড়ুর হইতে মেডুরা।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

পঞ্চম অধ্যায়।

সেতুবন্ধ যাত্রা।

প্রথম অধ্যায়।

হাবড়া হইতে পুরী।
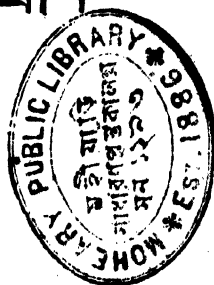
সন ১৩১৩ সালের ৬ই আশ্বিন শনিবার আমরা রাত্রি দশটার মেলে হাবড়া হইতে সেতুবন্ধ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মান্দ্রাজ বাষ্পীয়-শকট রামরাজাতলা, সাঁত্রাগাছি, আন্দুল, উলুবেড়িয়া, প্রভৃতি কতিপয় ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের সুবিশাল লৌহসেতু দুইটী পার হইয়া যথাসময়ে কোলাঘাট ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। তমলুক বা তাম্রলিপ্তের বিখ্যাত বর্গভীমাদেবী যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এইস্থানে অবতীর্ণ হন। কোলাঘাট ষ্টেসন ছাড়িয়া গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল। অন্য কতকগুলি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে খড়্গাপুর জংসন ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। এইস্থান হইতে একটী লাইন মেদিনীপুর দিয়া বরাবর এসানসোলে উপস্থিত হইয়াছে; আর একটী লাইন নাগপুর অভিমুখে গিয়াছে। বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ এই মেদিনীপুরে অবস্থিত।

খড়্গাপুর হইতে গাড়ী ক্রমে দাঁতনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টেসনের কিয়দ্দূরে গোপীনাথের মন্দির বিরাজিত। এইস্থানে বৈষ্ণব-দিগের একটী মঠ আছে। মেলার সময় মেদিনীপুরের যাবতীয় বৈষ্ণব মঠের দেবমূর্ত্তিগণ এইস্থানে নীত হন। সেই সময়ের উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা একটী দর্শনীয় স্থান; গাড়ী ক্রমশঃ চলিতে চলিতে বালেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইস্থানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মোহন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

খড়্গাপুরে যেন বাঙ্গালীর রাজ্য শেষ হইল। এখান হইতে বাঙ্গালী-গণ ক্রমশঃ যেন উড়িয়া হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কারণ হাবড়া হইতে খড়্গাপুর পর্য্যন্ত অধিবাসীগণের আকৃতি বাঙ্গালীর মত। তৎপরে মেদিনীপুর, দাঁতন প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীর আকৃতি যেন মিশ্রভাব। ইহারা না বাঙ্গালী, না উড়িয়া, কাহার বা অর্দ্ধ-মণ্ডিত মস্তক, কাহার বা কেশাচ্ছাদিত শিরোদেশ। সুতরাং এইস্থানগুলি বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী স্থান। ইহাদের ভাষাও বঙ্গভাষা ও উড়িয়া সংমিশ্রিত। ইহার পর বালেশ্বর, ভদ্রক প্রভৃতি স্থান হইতে যেন উড়িয়াদের রাজ্য আরম্ভ হইল। এখান হইতে চিল্কাহ্রদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই উৎকল প্রদেশ।

ভদ্রক পার হইয়া আমরা যাজপুর রোড ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ সন ১৩১২ সালের ২৮শে আশ্বিন পুরী যাইবার সময় আমরা এইস্থানে অবতরণ করিয়াছিলাম বলিয়া এবার আর নামিলাম না। এইস্থান হিন্দুর একটী মহাতীর্থ। তজ্জন্য আমরা এই স্থানের বিষয় অগ্রে বর্ণনা করিব। উৎকলে যতগুলি দ্রষ্টব্য তীর্থ আছে, তন্মধ্যে পাঁচটী প্রধান। শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চবিধ উপাসকদিগের পঞ্চতীর্থ বিদ্যমান। এই পঞ্চতীর্থ লইয়াই

উৎকলের পঞ্চদেবতার পঞ্চমন্দির। ভক্তপ্রাণ হিন্দুনরনারী বিষম ক্লেশ সহ্য করিয়া এই সকল তীর্থের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে আইসেন। পঞ্চ উপাসকদিগের পঞ্চতীর্থ কি কি তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

১ম—শাক্তদিগের জন্য—বিরজাক্ষেত্র।

২য়—গাণপত্য বা গণেশ উপাসকদিগের জন্য—মহাবিনায়ক-ক্ষেত্র।

৩য়—শৈব বা শিব উপাসকদিগের জন্য—ভুবনেশ্বর।

৪র্থ—বৈষ্ণবদিগের জন্য—পুরী বা শ্রীক্ষেত্র।

৫ম—সৌর বা সূর্য্য উপাসকদিগের জন্য—অর্কক্ষেত্র।

পঞ্চউপাসকদিগের এই পঞ্চ তীর্থের বর্ণনা করিয়া আমরা প্রথম অধ্যায় শেষ করিব।

বিরজাক্ষেত্র

প্রসিদ্ধ যাজপুর নগরে বিরজাক্ষেত্র অবস্থিত। যাজপুর কটকজেলার উত্তর সীমায় বিদ্যমান। কেশরীবংশীয় রাজা যযাতি কেশোরী অযোধ্যা হইতে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ আনাইয়া এইস্থানে নিষ্করভূমি দান করিয়া তাঁহাদিগকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই যাজপুরে বৈতরণী নদী এবং নাভিগয়া অবস্থিত হেতু ইহা হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থস্থান। এই মহাতীর্থ দর্শন করিবার জন্য আমরা রাত্রি দুইটার সময় যাজপুর রোড নামক ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হই। এক্ষণে উক্ত ষ্টেসনের নামের পরিবর্ত্তে বৈতরণী রোড নাম হইয়াছে। ষ্টেসন হইতে বৈতরণী-তীর্থ ১৪ মাইল। এই ১৪ মাইল পথ কেহ বা পদব্রজে কেহ বা গো-শকটে গমন করিয়া থাকে। আমরা ৩৲ টাকায় দুইখানি গো-শকট ভাড়া করিলাম।

সেই রাত্রেই আমরা রহনা হইলাম। ষ্টেসনে কতকগুলি পাণ্ডা ছিল, তন্মধ্যে একজনকে প্যাণ্ডা ঠিক করিয়া সমভিব্যাহারে লইলাম। আমাদের গাড়ী রাত্রি ২টা হইতে সকাল ৮টা পর্য্যন্ত ৬ ঘণ্টাকাল অনবরতঃ টানিয়া, রুড়িয়া নামক এক চটীতে উপস্থিত হইল। এইস্থানে মুখ হাত ধুইয়া একটু বিশ্রাম করিলাম। এই চটীতে একটা আম্রকুঞ্জ পথিক ও যাত্রিগণের শ্রমনিবারণার্থ যেন তাহার সুশীতল ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। হাঁড়ী, চাউল, দাউল, কাষ্ঠ প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যসম্ভার স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত। এই স্থানে আতা এত সুলভ যে আমরা পয়সায় ২টী ৩টী করিয়া ক্রয় করিলাম। ফলগুলি বেশ বড় বড় ও সুপক্ক। কলিকাতায় হইলে এক একটীর মূল্য এক আনা হইত। এইস্থানে আহারাদি করিয়া বৈকালে বিরজাক্ষেত্রে গমন করাই বিধেয়। কিন্তু আমরা ধূলিপায়ে দেব দর্শন করিব বলিয়া কোন স্থানে বিশ্রাম না করিয়া একেবারে বিরজাক্ষেত্রে যাওয়ার মত করিলাম। এইস্থানে অবস্থিতি না করিয়া একেবারে তথায় গমন করিতে অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল।

আমাদের গো-শকট বেলা ৮টার সময় পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়দ্দূর আসিয়া বৈতরণীর বালুকা প্রান্তে উপনীত হইলাম। ঘূর্ণমান শকটচক্র বালুকামধ্যে বসিয়া যাইতে লাগিল। তখন গরু দুইটী প্রাণপণ শক্তিতে টানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যেন তাহারা আর টানিতে পারে না। অতিকষ্টে গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বালুকার মধ্য দিয়া শকট সঞ্চালিত হওয়ায় চক্র সংঘর্ষনে কেমন একপ্রকার সোঁ সোঁ শব্দ হইতে লাগিল। তপনদেবের ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ রশ্মিতে এবং উত্তপ্ত বালুকার উষ্ণ বাতাসে দেহ যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া চলিলাম। মধ্যে মধ্যে বালুকাতে পদদ্বয় বসিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে সম্মুখে দেখি খরস্রোতা নীল-সলীল-বাহিনী

বক্রগামিনী তটিনী। এই নদীই বৈতরণী। ইহা পার হইতে হইবে, একখানিও নৌকা নাই, কিরূপে পার হইব, মহা ভাবনা উপস্থিত হইল। মনে মনে ভাবিলাম আজ এই সমান্য নদী পার হইতে মহা ভাবনা উপস্থিত; কিন্তু শেষের দিনে যে দিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া কালিন্দী-সোদর সমীপে বিচারার্থ দণ্ডায়মান হইতে হইবে, তখন সেই দুর্গন্ধা উষ্ণতোয়া মহাবেগা বৈতরণী পার হইয়া তথায় যাইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া তখন এই নদীকে সামান্য জ্ঞান হইল। প্রায়শ্চিত্তকালে বৈতরণী নদী পার হইতে হয়। সে নদী কিরূপ তাহা শ্রবণ করুন।

নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরা বহা।
উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থিকেশ তরঙ্গিণী ॥

প্রায়শ্চিত্ত বিবেক।

অন্তিম কালের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে এক্ষণে এই সম্মুখের বৈতরণী আবার হাঁটিয়া পার হইতে হইবে শুনিয়া আরও বিষণ্ণ হইলাম। গোশকট-চালক বলিল মহাশয় এইবার গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করুন। এই নদীর উপর দিয়া গাড়ী যাইবে। আমিত শুনিয়াই আশ্চর্য্য হইলাম, বলিলাম সে কি? তুমি কি গাড়ীশুদ্ধ ডুবাইয়া মারিবে? আর স্বর্গদ্বারের সে বৈতরণী পার হইতে হইবে না। সে কার্য্য দেখিতেছি অদ্য এই স্থানেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে। গাড়োয়ান বলিল না মহাশয় জল অল্প আছে, আপনি হাঁটিয়াও পার হইতে পারেন। পাছে কাপড় ভিজিয়া যায় তজ্জন্য আপনাকে গাড়ীর মধ্যে যাইতে বলিতেছি। কি করি তাহারই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, গাড়ী কিনারায় আসিল। জলের উপর দিয়া গাড়ী বেশ চলিতে লাগিল। ভয় ক্রমে তিরোহিত হইল এবং মনে একটু কেমন নূতন ধরণের আমোদও হইতে লাগিল। জলের মাত্রা আর একটু উর্দ্ধে স্ফীত হইলে

আমাদের পাদদেশ পর্য্যন্ত আদ্র হইত। এযেন তটিনীর জলরাশি গাড়ীর তলদেশ স্পর্শ করিতে গিয়া পরাস্থ হইল তাই রক্ষা! যাহা হউক এইরূপে বৈতরণী নদী পার হইয়া তীরে আসিলাম।

উপরে উঠিয়া একটু যাইতে না যাইতে দেখি আবার নদী। এই নদী সকল গুলিই বৈতরণী, কিন্তু প্রকৃত নাম "কুশভদ্রা"। বৈতরণী হইতে শাখা বাহির হইয়া কুশীনদী নাম হইয়াছে। ইহা এমনিভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে যে আমাদের ইহাকে ৩।৪ বার অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তীরে উঠিবামাত্র দেখি এই নদীর জল দূর হইতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সেই বিস্তৃত উচ্চ আবদ্ধ স্থান হইতে জলরাশি নিম্নে পতিত হইয়া যেন একটি সুন্দর জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। তদুপরি সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন মধ্যে মধ্যে রামধনুর ন্যায় রঞ্জিত বর্ণ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। সে দৃশ্য অতীব নয়নরঞ্জক। আমাদের গাড়ী এই প্রপাতের পার্শ্বদেশ দিয়া যাইতে লাগিল, ইহাকে বৈতরণীর আনিকট (Anicut) বলে। এই প্রপাতের শেষসীমা অতিক্রম করিয়া তীরে উঠিয়া দেখি আর একটী আনিকট, পাশাপাশি বিপরীত ভাবে দুইটি আনিকট দিয়া দুইদিকে জলরাশি অনবরত নির্গত হইতেছে। আনিকটের জলপ্রপাত দর্শন করিয়া সকলকারই মনে বিশেষ আনন্দ হইতে লাগিল। মৎস্যজীবিরা এই স্থানে মৎস্য ধরিতেছে।

তীরে উঠিয়া ভূমির উপর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল, কিয়দ্দূর পরেই দেখি কেবল সেঁকুল বন। কাঁটাযুক্ত কুলগাছের মত ছোট ছোট গাছ, তাহাতে আবার কুলের মত ছোট ছোট ফল ধরিয়াছে। একটীও বড় গাছ নাই, যে সেই স্থানে একটু বিশ্রাম করি। বেলা ক্রমে ১১টা হইল তথনও স্নান আহ্নিকাদি হয় নাই। একে রাত্রিজাগরণ, তৎপরে গোশকটের ক্লেশ, তদুপরি সূর্য্যদেবের তীক্ষ্ণকিরণ। তথন

সকলেই বলিতে লাগিল, চটিতে থাকিয়া বৈকালে আসিলে বেশ ভাল হইত, তাহা হইলে আর এত ক্লেশ হইত না। যাহা হউক এখন আর উপায় নাই। সেই অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। আমাদের কষ্ট দেখিয়া একজন বলিতে লাগিলেন এই সামান্য কষ্টে তোমরা কাতর হইতেছ; কিন্তু পূর্ব্বে আমরা এইরূপে হাঁটিয়া হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্র গিয়াছিলাম। সহিষ্ণুতার জন্য সকলেই তাঁহাকে উচ্চ আসন দিলেন এবং শ্রমকাতরতার জন্য আমাদের লজ্জা হইতে লাগিল। সেই সেঁকুল বন দিয়া, কখনও বা বালির উপর দিয়া, কখনও বা নদীর উপর দিয়া, প্রখর সূর্য্যকিরণে অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া, বেলা ১টার সময় আমরা বরাহ-দেবের মন্দির সন্নিকটে আসল বৈতরণীর তীরে উপনীত হইলাম। রাত্রি ২টার সময় যাজপুর রোড ষ্টেসন হইতে গোশকটে যাত্রা করিয়া বেলা ১টার সময় বৈতরণীতে পৌঁছিলাম। এই কষ্টের জন্য এখানে যাত্রী আদৌ হয় না। সকলে পুরীযাত্রা করেন বটে, তাঁহারা সাক্ষীগোপাল ও ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতি অল্পসংখ্যক যাত্রীই এই বৈতরণীতে আসিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বে যখন হাঁটা পথ ছিল তখন সকলকেই এই যাজপুরে আসিতে হইত। এখন পুরীর রেল হওয়ায় আর কেহ হাঁটিতে চাহে না। রেল কোম্পানি একটী শাখা লাইন করিলে বিশেষ যে লাভবান হন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক আমরা সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলে অসংখ্য পাণ্ডা তাহাদের জীর্ণ খাতা লইয়া আমাদিগকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল মহাশয়দের বাড়ী কোথায়, কি জাতি, পূর্ব্বপুরুষের নাম কি? এইরূপ প্রিয়সম্ভাষণে আমাদের আপাদ-মস্তক জ্বলিতে লাগিল। একে আমরা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় সবেমাত্র তথায় আসিয়াছি, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, নিত্যক্রিয়াদি কিছুই

হয় নাই, তখন সেই তীর্থ গুণ্ডারা আসিয়া আমাদের উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ষ্টেসন হইতে একটী পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে বরাবর আসিয়াছিল আমরা তাহাকেই পাণ্ডা ঠিক করিয়াছি, তথাপি তত্রস্থ পাণ্ডারা গোলযোগ করিয়া বলিতে লাগিল "ও কিসের পাণ্ডা, ভরদ্বাজ গোত্র আমার যাত্রী" ইত্যাদি রবে আমাদের জ্বালাতন করিয়া তুলিল। আমরা তাহাদের সঙ্গে পুনশ্চ বাক্যালাপ না করিয়া একটী বাসা ঠিক করিলাম। তথায় দ্রব্যসম্ভার রাখিয়া তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলাম। তখন সেই বাসাবাটীতেও পাণ্ডারা আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পাণ্ডার ভিড় দেখে কে? এমন দারিদ্র্যের দেশ কোথাও দেখি নাই। পাণ্ডার কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আর পুস্তকের কলেবর বর্দ্ধিত করিব না, তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, এখানে আমরা যে কয় দিবস ছিলাম সে কয়দিন প্রত্যহ ইহারা আমাদিগকে জ্বালাতন করিয়াছিল। যাহা হউক আমাদের পূর্ব্ব নিযুক্ত পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া বৈতরণীতে স্নান করিতে গমন করিলাম।

বৈতরণী।

বিরজাক্ষেত্রস্থ এই বৈতরণীতে স্নান করিলে যমপুরস্থ সেই বৈতরণী নদী পার হইবার আর কোন ভয় থাকে না। ব্রহ্মপুরাণোক্ত বৈতরণী নদী স্নানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন,—

"আস্তে বৈতরণী নাম সর্ব্বপাপহরা নদী।
তস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

ব্রহ্মপুরাণ।

খরবাহিণী বৈতরণীতে-স্নানের সময় গয়ার ফল্গুনদীর কথা মনে পড়িল। এই নদীটী ঠিক যেন ফল্গুনদীর মত, স্থানে স্থানে বালির চড়া ও মধ্যে মধ্যে বেশ ভরা জল। স্রোতও ফল্গুর মত, আয়তন

কালীঘাটের আদিগঙ্গার অপেক্ষা কিছু বড়। জানু পর্য্যন্ত জল সুতরাং হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। যে স্থান বড় গভীর তথায় নাভি পর্য্যন্ত জল। এই পূত সলিলে সংকল্প করিয়া স্নান করিলাম। স্নান করিয়া দগ্ধ-কলেবর শীতল হইল। রজত প্রস্তরবৎ সুন্দর সৈকত মধ্যে প্রবাহিতা বৈতরণীর গতিবিধি দেখিয়া, প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া, বৈতরণীকে প্রণাম করিলাম। পাণ্ডাঠাকুর মন্ত্র বলাইলেন।

বৈতরণী প্রণাম মন্ত্র।

গোনাসিকা সমুদ্ভূতে! ধাতু যজ্ঞে সমাগতে।
পাপং মে হর কল্যাণি! বৈতরণি! নমোঽস্তু তে॥
বৈতরণি! মহাভাগে! গোবিন্দশঙ্কর প্রিয়ে।
স্নানে পাপং হর দেবি! বৈতরণি! নমোঽস্তু তে॥
দুর্ভোজন-দুরালাপ-দুঃপ্রতিগ্রহ-সম্ভবম্।
পাপং মে হর কল্যাণ! বৈতরণি! নমোঽস্তু তে॥

বৈতরণী বিষ্ণুপাদ সম্ভূতা এবং ভাগীরথীর মত পুণ্যা বলিয়া খ্যাত। ইহার তীরে শবদাহ হইয়া থাকে। স্নানান্তে বাসায় আসিয়া বস্ত্রান্তর পরিগ্রহ করিয়া সকলে বরাহদেব দর্শনে গমন করিলাম। বৈতরণীর তীরের উপরেই এই বরাহদেবের মন্দির। মন্দিরটী ভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরের মত আকৃতি কিন্তু তদপেক্ষা অনেক ছোট, মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত চত্বরে সকলে গোদান করিয়া থাকে। মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ক্রান্তিদেবী, কাশী বিশ্বনাথ, বৈকুণ্ঠ আদি কতকগুলি দেব দেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ও ধর্ম্মবট নামে একটী বটবৃক্ষ আছে। এই মন্দিরের পার্শ্বদেশ হইতে বৈতরণীর তীর পর্য্যন্ত বাঁধাঘাট বিদ্যমান আছে। এই ঘাটকে দশাশ্বমেধ ঘাট কহে।

বরাহদেব।

বেদ অপহৃত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়া বেদোদ্ধার করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত যাজপুরের অপর নাম যজ্ঞপুর; সম্ভবত যজ্ঞপুর কথার অপভ্রংশ যাজপুর। এক্ষণে যাহাকে হরমুকুন্দপুর কহে, সেই স্থানে যজ্ঞ হইয়াছিল। এই মহাযজ্ঞে সমস্ত দেব দেবী আহূত হইয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ অপূর্ব্ব বরাহ মূর্ত্তিতে যজ্ঞকুণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হইয়া বেদ উদ্ধার করিলেন। তৎপরে বিরজাদেবীও সঙ্গে সঙ্গে এই কুণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হইলেন। বৈতরণীর তীরে বরাহ-দেবের মন্দির বিদ্যমান; এবং এই স্থান হইতে ২৷৷০ মাইল দূরে বিরজাদেবীর মন্দির। বরাহদেবকে দর্শন ও প্রণাম করিলে বিষ্ণুত্ব লাভ হয়; যথা—

আস্তে স্বয়ম্ভুস্তত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিঃ স্বয়ম্।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য তং ভক্ত্যা নরো বিষ্ণুত্বমাপ্নুয়াৎ॥

ব্রহ্মপুরাণ।

সুন্দর মন্দিরাভ্যন্তরে বরাহদেব কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে বিপুল উরুকর চরণোজ্জল সুন্দর বপুধারণ করিয়া নানালঙ্কার শোভিত রত্নহার পরিহিত হইয়া রত্নবেদীর উপর দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন। মালাকরগণ চতুর্দ্দিকে পুষ্প বিক্রয় করিতেছে। আমরা সকলে এক এক ছড়া মালা ক্রয় করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলাম। সেই ভগবান অচ্যুত বরাহদেবের চরণরজ মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া ধন্য হইলাম।

বরাহদেবের মন্দির প্রতাপ রুদ্র কর্ত্তৃক ১৫০৪-১৫৩২ খৃঃ মধ্যে নির্ম্মিত হয়। সংস্কার অভাবে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হইল।

মন্দিরগাত্রে কতকগুলি দেব দেবীর মূর্ত্তি ও কতকগুলি অশ্লীল মূর্ত্তি দেখিলাম। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশ ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে জগন্মোহন মণ্ডপ। এই মণ্ডপের চতুর্দ্দিক প্রস্তর দিয়া বাঁধান। এই প্রশস্ত চত্বরে বরাহদেবের সম্মুখে বসিয়া যাত্রীগণ গো দান করিয়া থাকে। জীবদ্দশায় বৈতরণী তীরে বরাহদেবকে সাক্ষী করিয়া তৎসম্মুখে গো দান করিলে অন্তিমকালে যমদ্বারস্থ তপ্তা বৈতরণী গো-পুচ্ছ ধরিয়া অনায়াসে পার হওয়া যায়।

সে দিবস আর অধিক বেলা না থাকাতে আমরা তৎপরদিবস প্রাতে এই চত্বরে বসিয়া গো দান করিয়াছিলাম। পাণ্ডারা একটী গাভী আনিয়া তাহার মূল্য ১৫।২০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে ৫৲ টাকা ধার্য্য করিয়া মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বিদেশস্থ যাত্রীগণের পক্ষে প্রকৃত গোদান অসম্ভব; কারণ মন্দির প্রাঙ্গণে কয়েকটী গাভী বর্ত্তমান থাকে, পাণ্ডারা যাত্রীর নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ লইয়া পুনঃ পুনঃ সেই গাভীগুলিই উৎসর্গ করাইয়া থাকে। গোর পুচ্ছ ধরিয়া মন্ত্র বলা শেষ হইলে যমদ্বারে প্রার্থনা করিতে হয়।

প্রার্থনা মন্ত্র।

যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চগাম্॥

বৈতরণীর একতীরে বরাহদেবের মন্দির অন্যতীরে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলীর উপর অষ্টমাতৃকার মন্দির। ইহা যেন বিভৎস-রূপী যমপুরী, কারণ এখানে আছেন;—১ খড়্গামুণ্ডধারিণী ভীষণা চামুণ্ডা শ্মশানকালী, ২ বিভৎস বদন যম, ৩ যমের স্ত্রী, ৪ যমের মা, ৫ যমের মাসী, ৬ যমের পিসী, ৭ যমের খুড়ী, ৮ যমের জ্যেঠাই। এই মূর্ত্তিগুলি দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। নীল প্রস্তরে খোদিত উচ্চে মনুষ্যের মত লম্বা ও চতুর্হস্ত বিশিষ্ট।

অষ্টমাতৃকার মন্দিরের পশ্চাৎভাগে অনতিদূরে জগন্নাথদেবের মন্দির। মন্দিরপ্রাঙ্গণ ২৫০ ফিট দীর্ঘ এবং প্রস্থে ১৫০ ফিট হইবে। লেটারাইট প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা মন্দিরের চতুর্দ্দিক আবদ্ধ। সম্মুখে নীলাকাশে চিত্রিত উচ্চ চূড়া গরুড়স্তম্ভ। স্তম্ভোপরি আকাশমার্গে সমাসীন বদ্ধাঞ্জলি গরুড় মূর্ত্তি। মন্দিরটী অতিপ্রাচীন বলিয়া অনুভব হইল। ইহার পার্শ্বে কতকগুলি বাসা বাটী আছে, সেই স্থানেই আমরা বাসা করিয়াছিলাম। দর্শনাদি করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রন্ধনাদি করিয়া বিশ্রাম করিলাম। বেলা ৪ টার সময় বাসা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সকলে পদব্রজে বিরজাদেবীর মন্দির দেখিতে গমন করি। পাণ্ডা ঠাকুর সঙ্গে চলিলেন।

প্রথমে আমরা একটী বিস্তৃত সুন্দর রাস্তা দেখিলাম। সেই রাস্তা পার হইয়া অন্যপথে চলিলাম। ইহার দুই ধারে বিপণীশ্রেণী নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত। তৎপরে বাজার, বাজারে তরিতরকারী ও নানাবিধ মনোহারী দোকানে পূর্ণ। এই স্থানে কতকগুলি দ্বিতল ও একতল ইষ্টকের বাটী দেখিলাম। এই স্থানই যাজপুর সহর। যাজপুর একাদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় রাজধানী ছিল। ডাক্‌বাঙ্গলার কাছেই নবাব আবুনসিবের মসজিদ্। ইহার পার্শ্বে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাটী। তাঁহার বাটীর চারিদিক প্রাচীরবেষ্টিত। এই প্রাচীরগাত্রে নীল প্রস্তর-নির্ম্মিত শচী চামুণ্ডা ও বরাহিণীদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে পুলিস আদালত প্রভৃতি কোম্পানির কাছারি ও অফিস আছে। তৎপরে সহর ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ আমরা পল্লীর মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে কোন স্থানে সুন্দর উদ্যান, কোন স্থান ঝোপজঙ্গল, কোথাও বা মাঠ তাহাতে সশীষধান্য বৃক্ষগুলি বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া চাষীর প্রাণ শীতল করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা এক সেতুর উপর উপনীত হইলাম। নিম্নে বৈতরণীর খাল।

কপাট দ্বারা জল আটক করিয়াছে। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য কোম্পানি বাহাদুর এই খাল খনন করিয়া দিয়াছেন। এই সেতু হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে বিখ্যাত বিরজাদেবীর মন্দির।

বিরজাদেবী ও নাভীগয়া।

এই মন্দিরে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়া দেখি যে চতুর্দ্দিকের প্রাঙ্গণভূমি প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহা দীর্ঘে ও প্রস্থে ৪০০ ফিট। গৃহ বা প্রধান মন্দিরে অষ্টভুজা অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিতা কৃষ্ণপ্রস্তরের বিরজাদেবীর মূর্ত্তি। কৃষ্ণবর্ণের রত্নবেদীর উপর পুষ্পমাল্যে পরিশোভিতা, নানালঙ্কার ভূষিতা মার ভীষণামূর্ত্তি দেখিয়া পাপীর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী ভক্তগণের ইচ্ছামত কোথাও চতুর্ভূজা কোথাও ষড়ভুজা কোথাও অষ্টভূজা কোথাও বা দশভূজা হন। ভক্তিভরে মাকে দর্শন করিতেছি এমন সময় পার্শ্বের একজন পুষ্পবিক্রেতা পুষ্পমাল্য লইয়া আসিবামাত্র আমার সঙ্গিগণ সেই পুষ্পমাল্যগুলি সমস্ত ক্রয় করিয়া মার গলায় দিলেন। আমি আর মালা দিতে পারিলাম না বলিয়া আমার মনে বড় দুঃখ হইল। ভক্তাধীনা মা যেন মুহূর্ত্তমধ্যে আমার মনোবেদনা বুঝিলেন। তৎক্ষণাৎ দেখি অন্য একজন মালাকার সুন্দর রক্তপদ্মের মালা একছড়া বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিল আমি তৎক্ষণাৎ ৴০এক আনা দিয়া সেই মালাছড়া ক্রয় করিয়া মার গলায় দিয়া ধন্য হইলাম, মনে শান্তি পাইলাম। সেই রক্তপদ্মের মালা মার কণ্ঠে যে কি শোভা পাইতে লাগিল, তাহা ভক্ত ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। মা যেন গলায় মালা পরিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন।

মার মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ১০০ ফিট দীর্ঘ ও ৭০ ফিট প্রস্থ চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানে শোভিত একটী পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণী অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড বা বিরজা কুণ্ড। এই পুষ্করিণীর জল নীলবর্ণ। আমরা এই জল স্পর্শ করিয়া মস্তকে দিলাম। অনন্তর

উপরে উঠিয়া মার সম্মুখস্থ জগন্মোহনে হোমকুণ্ড দেখিলাম। তথায় প্রত্যহ ভক্তগণ হোম করিয়া থাকে। তাহার বহির্ভাগে প্রস্তর নির্ম্মিত চত্বরে বলিদানের যূপকাষ্ঠ দেখিলাম। এই স্থানে প্রত্যহ পশুবলি হইয়া থাকে। এই স্থানের ব্রাহ্মণগণ শক্তির উপাসক, তজ্জন্য ইহারা পশুবলি দিয়া থাকেন এবং মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। মহাষ্টমীর দিন এই স্থানে অসংখ্য ছাগ বলি হইয়া থাকে।

বিরজাদেবীর মন্দিরের উত্তর ভাগে একটী গৃহের মধ্যে ৫ ফিট ব্যবধান বাঁধান কূপের ভিতর পিণ্ডদ্রব্য রহিয়াছে দেখিলাম। ইহাকে নাভীগয়া বলে। প্রত্যহ এই স্থানে পিণ্ডের দ্রব্য সামগ্রী ও পুষ্প পত্রাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া পচিয়া পচিয়া এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। আমার সঙ্গীগণ যাঁহারা পিতৃমাতৃহীন তাঁহারা তৎপর দিবস প্রাতে এই স্থানে আসিয়া পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে গয়াসুরের দেহ এতদূর বিস্তৃত যে তাঁহার মস্তক গয়াতে, নাভি এই বিরজাক্ষেত্রে এবং পদদ্বয় পীঠাপুরে পতিত হইয়াছিল। এইজন্য ইহাকে নাভিগয়া বলে এবং গোদাবরীর অন্তর্গত পীঠাপুরকে পাদগয়া বলে। গয়াতে যেমন পিণ্ডদান করিতে হয় তদ্রূপ এই দুই স্থানেও পিণ্ডদান করিতে হয়। যথা:—

গয়ায়াং বিরজেচৈব মাহেন্দ্রে জাহ্নবী তটে।
অত্র পিণ্ড প্রদো যাতু ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥

এই কারণে যাজপুরে যাঁহারা আসেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এই নাভিকুণ্ডে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। মার মন্দিরের অনতিদূরে রাজপথ হইতে গালর ভিতর গ্রেনাইট প্রস্তরের চত্বরের উপর একখণ্ড ক্লোরাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ ধ্বজস্তম্ভ দণ্ডায়মান। এই স্তম্ভের উচ্চ চূড়ায় গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। দুর্বৃত্ত কালাপাহাড় এই স্থানের দেবদেবী নষ্ট করিবার সময় স্তম্ভটীর কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই,

কিন্তু উপরের গরুড়ের মূর্ত্তিটী নষ্ট করে। পুরাবিদগণ স্থির করেন যে ইহা দশম্ শতাব্দীতে কেশরী রাজগণ কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। পাণ্ডারা এই স্থানে স্তম্ভগাত্রে মস্তক স্পর্শ করাইয়া দুই এক পয়সা আদায় করে। একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত এই প্রকাণ্ড স্তম্ভ যে কিরূপে নদনদী পার হইয়া এই স্থানে আনীত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আনন্দে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়।

তৎপরে আমরা এইস্থান হইতে ত্রিলোচন শিব ও অষ্টাদশহস্ত কালী দেখিতে যাইলাম। বিরজামন্দিরের সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে যাইয়া উক্ত স্থানে পৌঁছিলাম। মন্দির দুইটীই ছোট। তথায় পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়াছিল সুতরাং সেই স্থানে মার আরত্রিক দেখিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

বিরজাতাপিণীতে যাজপুরকে শকটাকৃতিবৎ ত্রিকোণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এবং এই ত্রিকোণে ৩টী শিবলিঙ্গ থাকিয়া যেন সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। মঞ্জুলিতে স্থানেশ্বর, উত্তরবাহিনী তটে সিদ্ধেশ্বর ও দক্ষিণে বিরজাদেবীর নিকট অগ্নীশ্বর। নগরের মধ্যস্থলে অখণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির আছে। কথিত আছে ইন্দ্র এই স্থানে তপস্যা করিয়া গৌতম শাপজনিত সহস্র যোনিত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

পুরীতে যেমন ১৮ নালা আছে এখানেও তদ্রূপ ১১ নালা আছে। পূর্ব্বহিন্দুগণের ইহা একটী অক্ষয়কীর্ত্তি। যাজপুরের অগ্নিকোণে আড়াই মাইল দূরে নয়পদাগ্রামে যযাতিকেশরী রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ইহা বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ।

এই বিরজাক্ষেত্র অতীব পুণ্যপ্রদ তীর্থ, কারণ ইহা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম তীর্থস্থান। ভগবান্ বিষ্ণুর সুদর্শন কর্ত্তিত—সতীদেবীর নাভিদেশ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। যথা তন্ত্রচূড়ামণি ৫১ পটল—

"উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে"

পুনশ্চ স্তবমালায় "বিরজা উড্রদেশেতু।" আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে বিরজাসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা,—

এক সময় ভগবান্ নারায়ণ গোলকে শ্রীমতী বিরজাদেবীর সহিত নির্জ্জনে বিবিধপ্রকার রতিক্রীড়া করেন।* শ্রীমতী রাধিকা এই ঘটনা অবগত হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সেই স্থানে আগমন করেন। ক্রোধান্বিতা রাধিকার আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হরির অন্তর্ধান হইল; এবং বিরজাদেবী ভয়ে নদীরূপা হইয়া গোলক বেষ্টন করিয়া রহিলেন। সম্ভবতঃ বিরজা নদীই এই বৈতরণী। মানবগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিরজানদীতে স্নান তর্পণ ও পিণ্ডদান করিলে এবং ব্রহ্মাপ্রতিষ্ঠিত বিরজামূর্ত্তি দর্শন করিলে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া থাকে এবং অন্তিমকালে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। সুতরাং ভক্ত মাত্রেরই এই স্থানে আগমন করা কর্ত্তব্য।

এই বিরজাক্ষেত্রে আমরা দিবসত্রয় অতিবাহিত করিয়া, পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণ করিয়া, পুনশ্চ বৈতরণী পার হইয়া যাজপুররোড ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হই। ষ্টেশনে যাইয়া দেখি অসংখ্য উড়িয়া ষ্টেশনের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। গাড়ীর স্থানাভাবে যাত্রীদিগকে টিকট দেওয়া হয় নাই। আমাদের টিকিট ছিল তজ্জন্য এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া ধানমণ্ডলে মহাবিনায়ক ক্ষেত্রে গণেশদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলাম।

---

* "তাঞ্চ রূপবতীং দৃষ্ট্বা প্রেমোদ্রেকাং জগৎপতিঃ।
চকারালিঙ্গনং তূর্ণং চুচুম্ব চ মুহুর্মুহুঃ।
নানাপ্রকার শৃঙ্গার বিপরিতাদিকং প্রভুঃ॥

মহাবিনায়ক ক্ষেত্র।

রাত্রি দুইটার সময় আমরা ধানমণ্ডল ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সুতরাং সকাল পর্য্যন্ত আমরা ষ্টেশনে থাকিয়া একখানি গরুরগাড়ী ভাড়া করিলাম। গণেশদেবের মন্দির ষ্টেশন:হইতে ৪ মাইল মাত্র। এই চারি মাইল পথ গমন করিতে করিতে দেখিলাম, তথায় প্রভূত ধান্য জন্মাইয়া ধানমণ্ডল নামের স্বার্থকতা করিতেছে। মহাবিনায়ক পর্ব্বতনামে সেই স্থানে একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের অর্দ্ধোচ্চ স্থানে গণেশজীর মন্দির অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিক ভাস্করখোদিত সুন্দর প্রাচীর বেষ্টিত। মন্দিরটী উড়িষ্যাদেশের মন্দিরের মত দেখিতে সুন্দর, কিন্তু বহুকালের প্রাচীন বলিয়া অনেকস্থান ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কথিত আছে ইহা গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মন্দিরের ছাদটী নষ্ট হইয়া যাওয়ায় দর্পণাধিপ রাজা বৈদ্যনাথ পুনরায় ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মহাবিনায়ক পর্ব্বতটী অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এই পর্ব্বতের অপর নাম বারুণীবান্তা। ইহারই বায়ুকোণে উক্ত মন্দির শোভা পাইতেছে। সমতল ভূমি হইতে মন্দিরটী দ্বাদশ হস্ত উচ্চ। উপরে উঠিবার নিমিত্ত তাহার ২২টী ধাপ আছে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ১০০ ফিট দূরে ও ৩০ ফিট উপরে একটী ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে জল আসিয়া প্রাঙ্গণস্থিত কুণ্ডে পতিত হইতেছে। সেই জলে ঠাকুরের অভিষেক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়। মন্দিরের মধ্যস্থলে ভূমির উপর চারিফিট ব্যাসের স্তুপাকৃতি একখণ্ড প্রস্তরের চতুর্দ্দিকে গণেশ, শিব, দুর্গা, সূর্য্য ও বিষ্ণু এই পঞ্চদেবতার মূর্ত্তি একাধারে উৎকীর্ণ হইয়াছে। পঞ্চ-দেবতার বিষয় পর পৃষ্ঠায় দেখুন।

মন্দিরের উত্তরদিকে ২টী কুণ্ড আছে। পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের অতিরিক্ত জল ২য় কুণ্ডে আসিয়া পতিত হয়। প্রথম কুণ্ডটী তপঃকুণ্ড, ইহাতে স্নান করিলে সকল পাপ নাশ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টী তলকুণ্ড অর্থাৎ নিম্ন কুণ্ড। এই স্থানে একটী জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। এখানকার

বৈষ্ণব-মহান্ত কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত। মহাবিনায়ক মন্দিরে প্রতি সোমবারে বহুলোক সমাগত হইয়া খেচরান্ন ও মিষ্টান্ন ভোগ দিয়া থাকে। যদিও পুরী বা ভুবনেশ্বরের মত এখানে অধিক যাত্রী হয় না, তথাপি এখানকার অধিবাসীদের উক্ত দেবতার প্রতি এরূপ ভক্তি যে রোগ হইলে তাহারা এখানে ঐকান্তিক মনে হত্যা দিয়া ঔষধ পাইয়া থাকে। এই ঔষধ প্রাপ্তিই ইহাদের ভক্তিবৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই স্থানে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি, ধনু সংক্রান্ত, মকর সংক্রান্তি ও শিবরাত্রিতে মহোৎসব হইয়া থাকে। শৈবগণের যেরূপ শিবচতুর্দ্দশী এখানকার গাণপত্যদিগের তদ্রূপ গণেশচতুর্থী। ইহা ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ চতুর্থীতে সম্পন্ন হয়। গজাননের অভিষেক দর্শন ও স্তোত্র পাঠ শ্রবণযোগ্য। যখন পুরোহিতগণ সমস্বরে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও স্তোত্র পাঠ করেন, তখন পাষণ্ডের হৃদয়েও পবিত্র ভক্তিভাবের উদয় হইয়া থাকে। আরত্রিকের সময় শ্বেত ও রক্তচন্দন দ্বারা (৺) ওঁকার মূর্ত্তি দেবগাত্রে অঙ্কিত করিয়া ও পুষ্পমাল্যে নয়নাভিরাম দিব্যসাজে সাজাইয়া পাণ্ডাঠাকুর দর্শকের মন আকৃষ্ট করেন। দেবতার বার্ষিক আয় ১৫০০ টাকা সাধু সন্ন্যাসীদিগকে প্রসাদ বিতরণ হইয়া থাকে।

ধানমণ্ডলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। উত্তর ও পশ্চিমদিকের উর্ব্বরা ভূখণ্ডে নারিকেল, আম্র, কাঁঠাল, প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বৃক্ষ এবং নানাজাতীয় প্রস্ফুটিত বনফুলে-সজ্জিত হইয়া প্রকৃতি দেবী যেন হাস্য করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক পর্ব্বতসমাচ্ছন্ন। তজ্জন্য অনেকে বলেন যে এখানকার জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুকের ভয় আছে। বিশেষ কুণ্ডদ্বয় নিকটে বলিয়া অনেক হিংস্রক জন্তু জলপানার্থ এই স্থানে আসিয়া থাকে। ইহারা কখনও প্রাঙ্গনস্থ জীবের প্রতি হিংসা করে না; কিন্তু এখানে বানরের দৌরাত্ম্যে প্রাণ বাঁচান ভার।* ইহারা সর্ব্বদা খাদ্যের জন্য যাত্রীদের উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলে।

পঞ্চদেবতা কেন হইল ?

ভগবান সম্বন্ধে ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ যতদূর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার শেষ মীমাংসা এই যে, ভগবান এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই "একমেবাদ্বিতীয়ং"। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই বিষ্ণু। জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস ব্যতীরেকে অপর কোন উপায়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না। তিনি নিত্য, শুদ্ধ ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; তিনি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম। সর্ব্বশক্তিমান তেজোময় বিরাটবপু ভগবানকে সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে অক্ষম। সাধারণের সুবিধার জন্য তাঁহার রূপ কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র; এবং সেই রূপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামকরণ হইয়াছে। উপাসক সেই নাম জপ করিয়া ও সেই কল্পিত মূর্ত্তি আরাধনা করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। কেহ বা তাঁহাকে পুরুষ মূর্ত্তিতে আরাধনা করেন, কেহ বা তাঁহাকে স্ত্রীমূর্ত্তিতে আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনা প্রণালীর সুবিধার জন্য এবং জ্ঞান ভক্তি ও বিশ্বাসের জন্য নানাবিধ তন্ত্র পুরাণ উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হইয়াছে। এবং তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া হৃদয়ে ভক্তি ও আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য ভারতের নানাস্থানে নানা তীর্থে নানা মূর্ত্তির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভগবান এক হইলেও উপাসনা প্রণালীর সুবিধার জন্য তাঁহার পঞ্চমূর্ত্তি হইয়াছে।

পঞ্চবিধ উপাসনা প্রণালী কেন হইল? তাহার উত্তর এই যে, যখন দেখা যাইতেছে যে জগতে সকলই পাঁচ। প্রথম পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম) লইয়া এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। ২য় জীবের শরীরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণের সমষ্টি লইয়া জীবদেহ গঠিত হইয়াছে। এইরূপ জীবের শরীর মধ্যেও পঞ্চ ইন্দ্রিয় [চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক,] হস্ত পদের

অঙ্গুলি তাহাও পঞ্চ, অধিক কি শিশু ভূমিষ্ট হইয়া যে স্তন পান করে তাহার ছিদ্রও পাঁচটী। প্রত্যেক পার্থিব পদার্থের পঞ্চবিধ গুণ যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। এইরূপ জগতে যখন সকলই পঞ্চ, তখন উপাসনা প্রণালীই বা পাঁচ হইবে না কেন? কালত্রয়দর্শী আর্য্যঋষিগণ এই সকল কারণে স্থির করেন যে ভগবানের আরাধনার পদ্ধতিও পঞ্চবিধ হউক। তজ্জন্যই পঞ্চ দেবতা, তজ্জন্যই পঞ্চবিধ উপাসনা প্রণালী।

এক্ষণে যাঁহার যে ভাবে উপাসনায় অভিরুচি তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে আরধনা করিতে পারেন। তাই বলিয়া ভগবান পাঁচটী নহেন তিনি সেই এক পরম ব্রহ্ম, তাঁহার রূপ বা নাম কল্পনা মাত্র।* শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ—নিরঞ্জন পরম ব্রহ্ম, তিনি সকল জীবের অন্তরে গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। এইরূপ মূর্ত্তি কি সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? তজ্জন্য ভক্তের রুচি অনুসারে ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি করিয়াছেন। যে কোন দেবতাকে যে কোন মূর্ত্তিতে যে ভাবেই ভজনা করনা কেন, কেবল তাঁহাকেই আরাধনা করা হইতেছে জানিবে। ভেদ জ্ঞান করিতে নাই। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১।৪ অঃ গীতা।

অর্থঃ—যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে পার্থ, যে হেতু মনুষ্যগণ বিভিন্ন দেবতার পূজা করিলেও তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে আমারই ভজনমার্গের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

* "শিবোমমাত্মা মম শক্তিরাদ্যা, জ্ঞানং গণেশং মম চক্ষুরর্কো; বিভেদ ভাবাময়ী যে ভজন্তি মমাঙ্গহীনং কলয়ন্তি মন্দাঃ॥" তন্ত্র।

অপিচ—যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃশ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥
২১।৭অ গীতা

অর্থ ঃ—যে যে ভক্ত দেবতারূপ মদীয় যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয় আমি সেই সেই ভক্তের (সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়ক) তাদৃশই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি।

পূজাপদ্ধতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক দেবতার স্তবেই বলা হইতেছে যে তুমিই সব, তুমিই জগতে সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় কারণ, তুমিই প্রকৃতি, তুমিই পুরুষ, তোমাপেক্ষা আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই ইত্যাদিরূপে যে স্তব করা হয় তাহার অর্থ কি? একটু বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সেই একজনকেই আরাধনা করা হইতেছে। কারণ গণেশকে যখন বলা হইতেছে—

"অনেকমেকং গজমেকদন্তং চৈতন্যরূপং জগদাদিবীজম্।
ব্রহ্মেতি যংব্রহ্মবিদো বদন্তি তম্ শম্ভুসুতং সততং ভজামি ॥"

এস্থলে হে গণেশ তুমিই চৈতন্যরূপ ও জগতের আদি, তুমিই মূল, তুমিই বড়, তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন দেবতা নাই ইত্যাদি স্তবে গণেশকে যখন বাড়ান হইতেছে, তখন শিব কি বিষ্ণু বা দুর্গা কি তদপেক্ষা নিম্নস্থানীয় দেবতা তাহা নহে। এইরূপ শিবের বেলায়ও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। আবার বিষ্ণুস্তবে তাঁহাকেই সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করা হইয়াছে। শক্তিকেও—

"ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারকর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে"

ইত্যাদিরূপে স্তব করিয়া তাঁহাকেও বাড়ান হইতেছে; তখন বুঝিতে হইবে তিনিই সব কর্ম্মানুসারে তাঁহার নাম ও রূপ স্বতন্ত্র

হইয়াছে মাত্র। ভ্রমান্ধ মানবগণ তাঁহাকে বিভিন্নজ্ঞানে ছোট বড় মনে করেন। এই ধামমণ্ডল মহাক্ষেত্রে সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব এই পঞ্চবিধ উপাসকের ভেদজ্ঞান দূর করিবার নিমিত্তই একখানি প্রস্তরফলকে গণেশ, সূর্য্য, শিব, দুর্গা ও বিষ্ণু এই পঞ্চমূর্ত্তির একত্রীকরণ করা হইয়াছে। প্রস্তরফলক যেন বলিতেছে—

নারায়ণে গণে রুদ্রেহম্বিকায়াং ভাস্করে তথা।
ভেদাভেদো নকর্ত্তব্যো পঞ্চদেব সমুদ্ভবে ॥
গণেশ খণ্ড ব্রঃ বৈঃ পুঃ।

যিনি নারায়ণ তিনিই গণেশ তিনিই রুদ্র তিনিই অম্বিকা তিনিই সূর্য্যদেব। ইঁহাদের পরস্পর ভেদাভেদ জ্ঞান করা উচিত নহে।

ধান মণ্ডলে আমরা ১ দিবস থাকিয়া পাণ্ডার নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ষ্টেশনে গাড়ী আসিলে দেখিলাম সকল কামরাই যাত্রীতে পরিপূর্ণ, কোনস্থানে বসিবার স্থান নাই। Inter classএর টিকিট থাকিলেও ভিড় দেখিয়া তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিলাম, তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে গার্ডসাহেবকে বলাতে তিনি আমাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বসিবার হুকুম দিলেন। কিন্তু এ সুখ আমাদিগকে বেশীক্ষণ ভোগ করিতে হইল না। কয়েক ঘণ্টার পরই গাড়ী ভুবনেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিল; কাজেই বাধ্য হইয়া ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে নামিলাম।

ভুবনেশ্বরের মন্দির।　　　(পৃঃ ২৩)

ভুবনেশ্বর।

এখানে নামিয়া দেখি ষ্টেশনটী গোশকটে ও উড়িয়া পাণ্ডায় পরিপূর্ণ। তখন সন্ধ্যা উপস্থিত সুতরাং প্রত্যেকের হস্তে একটী করিয়া লণ্ঠন জ্বলিতেছে। বিস্তর পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিরজা ক্ষেত্রের মত এখানেও সকলে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগিল মহাশয়ের নাম কি? বাড়ী কোথায়? বাগবাজারের মদন বাবুকে চিনেন? ঝামাপুকুরের হরিবাবু আমার যাত্রী ইত্যাদি রবে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কেহ বলিতে লাগিল আমার নাম দামোদর পাণ্ডা, কেহ বলিল আমার নাম সাড়ে-পাঁচ-ভাই রাম চরণ পাণ্ডা, কেহ বলিল আমার নাম সাড়ে-তিন-ভাই পরমেশ্বর পূজারি পাণ্ডা, ইত্যাদি রকম কলরবে আমাদের ঘেরিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। একে অজানিত স্থান, পরিচিত লোকও তথায় নাই এবং একজন পাণ্ডাও চাই সুতরাং অনেক বিবেচনা করিয়া একটী পাণ্ডা ঠিক করিলাম। এই পাণ্ডা ভুবনেশ্বর দেবের প্রত্যহ সেবা করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারা দেবদর্শন সুন্দররূপ হইবে, বিবেচনা করিয়া, সাড়ে-তিন-ভাই পরমেশ্বর পূজারি পাণ্ডাকে আমাদের পাণ্ডা ঠিক করিলাম। পাঠকের কৌতুহলের জন্য বলিয়া রাখি সাড়ে অর্থ অবিবাহিত। বিবাহ হইলেই যেন পুরুষ পূর্ণ-কলেবর হয়, যেহেতু স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গী। যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য পাণ্ডাগণ প্রতিদিন ট্রেণের সময় ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে দিন যাহার ভাগ্যে যে যাত্রী জুটে সেইদিন তাহার তাহাই লভ্য। কেহ বা ভগ্ন-মনোরথে ফিরিয়া আসেন, কেহ বা হাস্যবদনে শীকার ধরিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যাহা হউক পরমেশ্বর পূজারি পাণ্ডা তৎক্ষণাৎ আমাদের জন্য একখানি গোশকট ।০ আনা দিয়া ভাড়া করিয়া দিলেন। আমরা সকলে

সেই শৃঙ্গধারী জুড়িতে আরাম করিয়া বসিলাম। বিস্তর খড় পাতিয়া দিয়া তাহার উপর একখানি থলিয়া পাতিয়া দিল। উপরে দরমার ছাউনি করায় যেন একখানি ঘরের মত হইয়াছে! কষ্টেস্থষ্টে তাহার ভিতর কোন রকমে সকলে প্রবিষ্ট হইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর লণ্ঠন হস্তে অগ্রসর হইলে তৎপশ্চাৎ গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। শকটচালক গরুর লেজ মলিয়া হেট হেট শব্দে হাঁকাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উড়িয়া ভাষায় রাগিণীও ভাঁজিতে লাগিল। আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, গাড়োয়ানজী এখান হইতে মন্দির কতদূর? গাড়োয়ানজী বলিল "পক্কা দো মাইল"। এই দুই মাইল রাস্তা গাড়ী চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর আসিয়া নালার মত একটী ছোট নদী দেখিলাম। এই নদীর উপর দিয়া গরু দুইটী নির্ভয়ে আমাদের গাড়ী টানিয়া লইয়া গেল। হঠাৎ গাড়ী নিম্নগামী হওয়ায় গাড়ীর ভিতর হইতে একজন মধুরস্বরে বলিয়া উঠিল, "এই রে শালা এইবার ডোবালে!" আমি বলিলাম ভয় নাই এই দেখ গাড়ী আবার উঠিল।

এদেশে চারিদিকেই বালি, মৃত্তিকার অংশ সামান্য; সুতরাং জলে কাদা হইয়া গাড়ীর চাকা বসিয়া যায় না। বালির উপর দিয়া কেমন সোঁ সোঁ রবে চাকা চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাণ্ডাঠাকুর বিন্দু-সরোবরের নিকট একটী একতালা বাটীরসম্মুখে আমাদের গাড়ী থামাইয়া সেই বাটীতে যাইতে বলিলেন। আমরা সকলে সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাটীর মধ্যস্থলে একটী বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন ও চতুর্দ্দিকে একতালা ৬.৭ খানি ঘর। ঘরগুলি ইটের দেওয়াল ও খড়ের চাল। এখানে পাকা ছাদওয়ালা বাটী অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। পাণ্ডা ঠাকুর আমাদের জন্য এক কলসী জল আনাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনাদের আহারাদির কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে? এতদুত্তরে বলিলাম অগ্রে দেবদর্শন করি তৎপরে দেবতার প্রসাদ পাইতো উত্তম, নচেৎ

দোকানের লুচি বন্দোবস্ত হইবে। ইহা শুনিয়া পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন দেবদর্শন কল্য প্রাতে হইবে। কারণ এখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। দরজা বোধ হয় এতক্ষণ বন্ধ হইয়া থাকিবে। যদি খোলা থাকে তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, নচেৎ ফিরিয়া আসিতে হইবে। তবে ভোগ এখনও পাইবেন। হুকুম হইলে আমি ভোগ আনিয়া দেই। দোকানে লুচি পাইবেন না, কারণ ইহা আপনাদের কলিকাতার মত স্থান নহে যে লুচি পাইবেন। পূর্ব্বে দোকান আদৌ ছিল না—এখন রেল হওয়ায় দুই একজন পশ্চিমবাসী দোকান করিয়াছে মাত্র। ফরমাস দিলে তৈয়ার করিয়া দেয়, কিন্তু এত রাত্রে বোধ হয় লুচি করিয়া দিবে না। বিশেষ আমাদের নিয়ম আছে যে যাত্রী আসিলে প্রথম দিন আমরা তাহাদিগকে নিজব্যয়ে খাওয়াইয়া থাকি, সুতরাং সন্ধ্যার সময় ভুবনেশ্বর দেবের যে ভোগ হইয়াছিল তাহাই আপনাদের সেবার জন্য লইয়া আসি। সেই প্রসাদ খাইবার সকলের ইচ্ছা হইল, তখন পাণ্ডাজী প্রসাদ আনিতে চলিলেন, আমরাও মুখ হাত ধুইয়া সুস্থ হইয়া সায়ংকার্য্য সমাধা করিয়া সেইস্থান হইতেই ভগবান ভুবনেশ্বর দেবকে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে একটী চাঙ্গারিতে ভোগের পাত্র বসাইয়া একটি উড়িয়া মোট লইয়া উপস্থিত হইল। পাণ্ডা ঠাকুর সকলকে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং বলিলেন এখানে শ্রীক্ষেত্রের মত জাতি বিচার নাই, সকলেই পরস্পর মুখে প্রসাদ দিতে পারেন এবং আপনাদের প্রদত্ত প্রসাদ আমরাও খাইয়া থাকি। এখানে ভেদ জ্ঞান নাই। শ্রীক্ষেত্রের মত লম্বা হাড়ীর ভিতর হইতে খিচুড়ি প্রসাদ সকলের পাত্রে প্রদত্ত হইল। প্রসাদে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত দেওয়া ছিল কিন্তু হরিদ্রা দেওয়া ছিলনা ; সুতরাং দেখিতে যেন সাদা পোলাও। খাইতেও অতি উপাদেয়। যেন মুখে এখনও লাগিয়া রহিয়াছে। শ্রীক্ষেত্রের প্রসাদও

খাইয়াছিলাম কিন্তু ভুবনেশ্বর দেবের প্রসাদ অতি উত্তম। খিচুড়ির সঙ্গে কোন প্রকার ভাজা ছিল না, তবে একটা ব্যঞ্জন এবং অড়হর দাউল ছিল। ব্যঞ্জনে আলু ছিল না, কারণ আলু উৎকলবাসীর পক্ষে অপবিত্র, দেব-সেবায় ইহা নিষিদ্ধ। যাহা হউক ক্ষুধার সময়ে পরম আহ্লাদে এই উপাদেয় প্রসাদ খাইয়া সকলের ক্ষুধানিবৃত্তি হইল। জঠরানল নির্ব্বাপিত করিয়া সকলে মুখ ধুইয়া তাম্বুলাদি সেবন করিয়া অগুকার মত শয়ন করিলাম।

বিন্দুসরোবর।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বাসার সম্মুখস্থ বিন্দু সরোবরে স্নানার্থ গমন করিলাম। এই সরোবর প্রকাণ্ড। এক সময় চতুর্দ্দিকে প্রস্তরমণ্ডিত বাঁধা ঘাট ছিল। এক্ষণে ইহার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা ৮৭০ ফিট দীর্ঘ এবং ৪৭০ ফিট প্রস্থ এবং ১৬ ফিট গভীর। ইহার উত্তরদিকের নাম গোদাবরী, দক্ষিণদিকের নাম ত্রিশূর, পূর্ব্বদিকের নাম মণিকর্ণিকা ও পশ্চিমদিকের নাম বিশ্রাম বলিয়া কথিত। ইহা ভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে অনেকগুলি আম্র বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতীরস্থ মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর অনন্তবাসুদেবের মন্দির স্থাপিত। অনন্ত, বলরামমূর্ত্তি এবং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি, সুতরাং মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণ বলরামের সুন্দর মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। ভুবনেশ্বর দেবের মন্দির অপেক্ষা ইহার আকার ক্ষুদ্র হইলেও মন্দিরের অবস্থা অনেকাংশে উত্তম আছে। এই মন্দির ভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনন্তবাসুদেবের প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ভোগ ও পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিন্দু সরোবরের মধ্যস্থলে ১১০ ফিট দীর্ঘ ও ১০০ ফিট প্রস্থ একটি ছোট দ্বীপ আছে এবং এই দ্বীপের ঈশান কোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দির

আছে। এই মন্দিরের সম্মুখস্থ চত্বরে একটী সুন্দর কুয়া আছে। উক্ত বাসুদেবের ভোগমূর্ত্তি উৎসবের সময় এই কুয়ার নিকট আনীত হয় তখন ইহার মুখ খোলা হয়, অন্য সময়ে ইহা বন্ধ থাকে। বিন্দুসরোবরের মধ্যেও কয়েকটী কুয়া আছে তাহা হইতে সর্ব্বদা নূতন জল উদ্ভূত হইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সর্ব্বদা নূতন জল উত্থিত হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বাকৃতি সবুজবর্ণ পানা মিশ্রিত হইয়া জলের বর্ণ সবুজ হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাতে কীটাণুযুক্ত থাকা সম্ভব। দূর হইতে বিন্দুসরোবর দেখিতে যেন হরিৎ বর্ণের একটী প্রকাণ্ড হ্রদ।

যাহা হউক এই বিন্দুসরোবর অতি পুণ্যতীর্থ। ভারতে যেমন চারি ধাম (উত্তরে বদ্রীনারায়ণ, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব্বে পূরীর জগন্নাথ ও পশ্চিমে দ্বারকানাথ) আছে, তেমনি চারি সরোবরও বিদ্যমান আছে। উত্তরে মানসসরোবর; দক্ষিণে পম্পা-সরোবর, পূর্ব্বে বিন্দু-সরোবর ও পশ্চিমে (কচ্ছদেশে) নারায়ণ-সরোবর। সুতরাং এই পবিত্র সরোবরে স্নান, তর্পন ও পিণ্ড দান করিতে হয়। ইহা পবিত্র তীর্থ বলিয়া নানাবিধ পুরাণে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

তত্র বিন্দু সরস্তার্থং তার্থ বিন্দুভিঃ পূরিতম্।
তস্য মজ্জন মাত্রেন সর্ব্ব তীর্থাম্বু গাহনম্॥

অপিচ—তীর্থং বিন্দুসরো নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমাঃ।
দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৃণ্ সন্তর্পয়েত্ততঃ॥
তিলোদকেন বিধিনা নাম গোত্র বিধানবিৎ।
স্নাত্বৈব বিধিবত্তত্র গোঽশ্বমেধ ফলং লভেৎ॥
পিণ্ডং যে সংপ্রযচ্ছন্তি পিতৃভ্যঃ সরসস্তটে।
পিতৃনামক্ষয়াং তৃপ্তিং তে কুর্ব্বন্তি ন সংশয়ঃ॥ ব্রহ্মপুঃ—

অস্যার্থ :—বিন্দু বিন্দু করিয়া অন্য তীর্থের বারি দ্বারা বিন্দুসরোবর পরিপূর্ণ; সুতরাং ইহাতে অবগাহন করিলে সমস্ত তীর্থ স্নানের ফল

লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে যে বিন্দু সরোবর নামে সরোবর আছে তথায় বিধিপূর্ব্বক স্নান করিলে গো ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে এবং দেব, ঋষি, মনুষ্য ও পিতৃদিগের উদ্দেশে বিধিপূর্ব্বক নামগোত্রসহ তিলের দ্বারা তর্পণ করিবে; এবং এই সরোবর তটে পিতৃপুরুষের নামে যে পিণ্ড দান করে সে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে ইহাতে আর সংশয় নাই।

তজ্জন্য এই পুণ্যতীর্থে যাত্রীগণের সংকল্প পূর্ব্বক স্নান, তর্পণ ও পিণ্ড প্রদান করিবার জন্য বিস্তর পাণ্ডা দণ্ডায়মান থাকে। আমরা যদিচ ইহার তীরে পিণ্ড প্রদান করি নাই, তত্রাচ স্নান ও তর্পণের জন্য একজন পাণ্ডা ঠিক করিলাম, তিনি মন্ত্র বলাইতে লাগিলেন।

স্নান মন্ত্র।

বিন্দং বিন্দুং সমাহৃত্য নির্ম্মিতস্তং পিণাকিনা
বৃজিনং হর মে সর্ব্বং বিন্দুসাগর তে নমঃ।

পদ্মপুরাণ।

ঘাটে পাণ্ডাদের দক্ষিণাও অতি সামান্য, দুই এক পয়সা দিলেই সন্তুষ্ট। বিন্দুসরোবর ভিন্ন এখানে আরও ৭টী সরোবর আছে; সেগুলিও এক একটী তীর্থ; সুতরাং এখানে অষ্টতীর্থ বিরাজমান। ১ম বিন্দু-সরোবর, ২য় পাপনাশিনী, ৩য় গঙ্গাযমুনা, ৪র্থ কোটীতীর্থ, ৫ম ব্রহ্মকুণ্ড, ৬ষ্ঠ মেঘকুণ্ড, ৭ম অলাবুকুণ্ড এবং ৮ম রামকুণ্ড।

যাহা হউক যথারীতি এই পবিত্র বিন্দুসরোবরে স্নানাদি করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমরা বস্ত্রান্তর গ্রহণ করিয়া পাণ্ডার সহিত দক্ষিণাভিমুখে ভুবনেশ্বর দেব দর্শনে চলিলাম।

ভূবনেশ্বর মন্দির।

বিন্দুসরোবর হইতে দক্ষিণ দিকে অতি অল্পক্ষণ আসিয়া ভুবনেশ্বর দেবের বৃহৎ মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখীন হইলাম। ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের নাম একাম্রকানন এবং দেবতার নাম একাম্রনাথ বা ত্রিভুবনেশ্বর। এক্ষণে লোকে কেবল ভুবনেশ্বর বলিয়া থাকে এবং দেবতার নামেই এই ক্ষেত্রের নাম ভুবনেশ্বর হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের চতুর্দ্দিকে আম্রকানন। মন্দিরের উত্তর দিকে বড়দন্দ নামক প্রশস্ত রাজপথ, দক্ষিণদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও কতকগুলি ভগ্নমন্দির ও ভগ্ন অট্টালিকার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে দেবী পাদহরা সরোবর।

যাহা হউক আমরা ভুবনেশ্বর দেবের মন্দির সম্মুখীন হইয়া দেখিলাম মন্দিরটী সংস্কার অভাবে অতিজীর্ণ ও অনেক স্থান খণ্ডিত ও স্খলিত-গাত্র হইয়া রহিয়াছে। ভিতরে যখন প্রবেশ করিয়াছিলাম তখন তথায় একটী দানবাক্স ছিল, যাত্রীরা সকলেই তাহাতে অর্দ্ধ আনা হিসাবে কর দিতেছে। সেই সংগৃহীত অর্থে মন্দির সংস্কৃত হইবে। ভুবনেশ্বর মন্দিরটী অতি প্রকাণ্ড, সমস্ত মেরামত করিতে অন্যূন লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইবে। মূল মন্দিরপ্রাঙ্গন পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। ইহা দীর্ঘে ৫২০ ফিট ও প্রস্থে ৪৬৫ ফিট। ইহার চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় ৭॥০ ফিট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা সুন্দররূপে পরিবেষ্টিত। মন্দিরের সিংহদ্বার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। প্রথমে সিংহদ্বারে আমরা প্রবিষ্ট হইয়া একটু নিম্নে নামিয়া তৎপরে আবার উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে মূল মন্দিরকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম এই প্রশস্ত বাঁধান চত্বর বা প্রাঙ্গণ ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৬৫ ফিট ও উত্তর দক্ষিণে ৫০ ফিট, ২য় ভোগমণ্ডপ, ৩য় নাটমন্দির, ৪র্থ মোহন ও মূলস্থান।

চত্বরে উপস্থিত হইয়া দেখি, সম্মুখে অরুণস্তম্ভ ইহার বামদিকে গণেশদেবের একটী ছোট মন্দির। ইহার বামপার্শ্ব দিয়া প্রথমে দক্ষিণ ও তৎপরে পশ্চিমমুখী হইয়া মূল মন্দিরে যাইতে হয়। নচেৎ ভোগমণ্ডপ ও নাটমন্দিরের ভিতর দিয়াও যাওয়া যায়।

ভোগমণ্ডপ—ইহা দীর্ঘপ্রস্থে ৫৬ ফিট। (৭৯২-৮১১ খৃঃ) অব্দে কমল কেশরী কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। সাধারণ জমি হইতে ইহা ৩ ফিট উচ্চ। এই স্থানে ভুবনেশ্বর দেবের প্রতিদিন তিন বার করিয়া ভোগ দেওয়া হয়। এই মণ্ডপের আকৃতি যেন চতুর্ভুজ পিরামিড্।

নাটমন্দির—ইহা দীর্ঘে ও প্রস্থে ৫২ ফিট। শালিনী কেশরীর পাটরাণী কর্তৃক (১০৯৯-১১০৪ খৃঃ) অব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। এইস্থানে কখন কখন দেব সম্মুখে নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। ইহার পোতা থামাল তিন ফুট উচ্চ এবং আকৃতিতে ভোগমণ্ডপের ছাদের ন্যায় চতুর্ভুজ পিরামিড।

মোহন ও মূলস্থান—ইহা যযাতি কেশরীর সময়ে আরম্ভ হইয়া ললাটেন্দু কেশরীর সময় সম্পূর্ণ হয়। মোহনগৃহ উত্তর দক্ষিণে ৪৫ ফিট এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ৬৫ ফিট কিন্তু মূলস্থান যথায় ভুবনেশ্বর বিরাজ করিতেছেন তাহা ৫৬ ফুট দীর্ঘপ্রস্থ জমির উপর স্থাপিত। এই স্থানের উপর মূলমন্দির। ইহার শিখরদেশ ১৬০ ফিট উচ্চ হইবে। বহির্ভাগে মন্দিরগাত্রে অসংখ্য দেবদানব ও মানবের লীলা খোদিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কুরুচিপূর্ণ তান্ত্রিক বীভৎস ভাবের প্রতিকৃতি দেখিলাম। উত্তরদিকের দেওয়ালে ভগবতীর মূর্ত্তি, দক্ষিণে গণেশের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি এবং পশ্চিমে কার্ত্তিকের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। মন্দিরের সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলিন্দে কৃষ্ণ প্রস্তরের এক একটী বিগ্রহ রহিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে ৮ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট এক খণ্ড উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের সুন্দর ও প্রকাণ্ড লিঙ্গমূর্ত্তি, সমতলভূমি হইতে ৮ ইঞ্চি

ঊর্দ্ধে বিরাজমান। বেদীপীঠ কৃষ্ণ ক্লোরাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। গৌরী-পট্টের পার্শ্বদেশে চতুর্দ্দিকে দশটী ছোট ছোট গোলাকার জোড় (joint) আছে। পাণ্ডারা সেইগুলি দশ অবতারের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া থাকেন। গৌরীপট্টের উপরের লিঙ্গভাগ অসমান একখণ্ড শিলা তাহার একভাগ অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ ও অন্যভাগ ঈষৎ শুক্লবর্ণ, তজ্জন্য এই লিঙ্গকে হর-পার্ব্বতী বলিয়া পাণ্ডারা আখ্যা প্রদান করে।

জগন্নাথের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ভুবনেশ্বর, কেশরীবংশীয় যযাতি নৃপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত। তিনি যবনদিগকে বিতাড়িত করিয়া এই স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। যযাতিকেশরী তাঁহার জীবনের শেষভাগে ৫৮৮ খৃঃ ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহার প্রপৌত্র ললাটেন্দু কেশরী ৬৫৭ খৃঃ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করেন। এতদ্বিষয়ে একাম্র পুরাণে একটী শ্লোক আছে।

"গজাষ্টেষুমিতে (৫৮৮) জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥"

খৃঃ ৬২৩ হইতে ৬৭৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ললাটেন্দু কেশরী ভুবনেশ্বরে রাজত্ব করেন। এবং তাঁহার বংশধরেরা ৯৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করিয়া ৯৪০ খৃঃ অব্দে নৃপতি কেশরী কটক নগরে তাঁহার রাজ সিংহাসন স্থানান্তরিত করেন। তদবধি কটক সমৃদ্ধিশালী নগরী হইল এবং ভুবনেশ্বর ক্রমে অরণ্যে পরিণত হইতে লাগিল। শেষে কেশরী নৃপতিগণের বংশধরের অনুগ্রহে অরণ্য পরিষ্কার করিয়া মন্দিরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ১১০৪ সালে নাটমন্দির, ভোগমন্দির প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া দেন। প্রথমে কেবল বিমান ও চাঁদনিযুক্ত মন্দির ছিল। মন্দিরের প্রত্যেক ইঞ্চি স্থান এরূপ সুন্দর ভাস্করখোদিত যে ভারতে অন্য কোন মন্দিরে এরূপ শিল্প-কৌশল নাই। এক সময় ভারতবর্ষ যে শিল্পকার্য্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এক ভুবনেশ্বরই

তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এবং অদ্যাব'ধ অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ১২টী সিংহমূর্ত্তির উপর এক ডুম স্থাপিত, এই বৃহৎ ডুমের উপর চূড়া তদুপরি ভুবনেশ্বর দেবের ত্রিশূল সংস্থাপিত। এক্ষণে ত্রিশূলটীর ভগ্নাবস্থা।

মন্দিরাভ্যন্তরে ভুবনেশ্বর দেবের সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিলে মনে ভগবৎ প্রেম আপনা আপনি উপস্থিত হয়। ইহা দ্বাদশ লিঙ্গের অন্যতম একলিঙ্গ। সকলেই ইচ্ছামত সেই দেব দেব ভুবনেশ্বর মহাদেবকে পুষ্প-বিল্বদলে পূজা করিতেছে। হর হর বম্ বম্ রবে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে জয় ভুবনেশ্বর দেবের জয় বলিয়া শরীর রোমাঞ্চ করিয়া দিতেছে। আমরা পাণ্ডার সহিত তৎসন্নিহিত হইয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া মনে মহা শান্তি পাইলাম।

"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভম্" ইত্যাদি মন্ত্রে তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া যথারীতি প্রণাম করনান্তর মন্দির প্রদক্ষিণার্থ বাহিরে আসিলাম। আমাদের শাস্ত্রে যে মন্দির প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা আছে তাহার অর্থ আর কিছুই নয় কেবল মন্দিরের অবয়ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। মন্দির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া পাছে একবারে তৃপ্তি সাধন না হয়, তজ্জন্য তিনবার, পাঁচবার কিম্বা সাতবার প্রদক্ষিণের নিয়ম আছে। কিন্তু এই নিয়ম ভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরের নিকট খাটে না, কারণ ইহা এমনি শিল্পনৈপুণ্য-বিশিষ্ট যে শতবার প্রদক্ষিণেও নয়নপিপাসা নিবৃত্তি হয় না। মন্দিরগাত্রের প্রত্যেক ইঞ্চিস্থানও সুন্দর ভাস্করকার্য্যে উদ্ভাসিত। এইরূপ ইঞ্চি ইঞ্চি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের খোদিত মূর্ত্তির দ্বারা মন্দিরটী ১৬০ ফুট পর্য্যন্ত চিত্রিত।

বহুশতাব্দী অতীত হইল আর সে কেশরী বংশ নাই কিন্তু তাহাদের এই অদ্ভুত ও অক্ষয় কীর্ত্তি আজ ভারতবাসীর নিকট ঘোষণা করিতেছে।

উহা প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য বিদ্যার ও সুনিপুণ গরিমার পরিচয় প্রদান করিতেছে। গগনস্পর্শাকাঙ্ক্ষী কারুকার্য্যখোদিত ভুবনবিদিত ভুবনেশ্বর-মন্দির জীর্ণাবস্থায় যেন বৃহৎ প্রাঙ্গণ মধ্যে বিমর্ষ ভাবে স্খলিত অঙ্গে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। আহা যযাতি কেশরীর সময়ে নূতন মন্দিরের না জানি কি শোভাই ছিল!

আমাদের দেশের এমনই দুরদৃষ্ট যে হতভাগ্য ধনাঢ্যগণ বিলাসিনীগণের চরণপ্রান্তে আত্মবিক্রয় করিয়া অকাতরে ধনরাশি উৎসর্গ করিতেছেন; যদি তাঁহারা এই মন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ইহার জীর্ণসংস্কারের প্রতি লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে ধ্বংশের হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে একটী অতুলনীয় অতীত শিল্প-গৌরব অক্ষুন্নভাবে রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু এমন মহাত্মা আমাদের দেশে কয়জন আছেন? ধনমদে অন্ধ ধনবানদের কি ধর্ম্মে মতি আছে, তাহা হইলে আজ এই ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কি এই দশা ঘটিত?

ভুবনেশ্বরের জীর্ণ মন্দিরের দুর্দ্দশা দেখিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপে তৈলপ্রদানের ন্যায় বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুর (উডবরণ সাহেব) ভুবনেশ্বর দেবের মন্দির সংস্কারার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে এককালীন কিছু টাকা দান করেন এবং বাকী টাকার জন্য যাত্রীদের উপর অর্দ্ধ আনা হিসাবে কর নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। উক্ত কর আদায় জন্য একটী তালাবদ্ধ বাক্স মন্দিরের প্রবেশকালীন দ্বারপার্শ্বে স্থাপিত ও একটী বিজ্ঞাপন লিখিত আছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে মন্দির সংস্কারের জন্য সকলকে অর্দ্ধ আনা দিতে হইবে। মূলমন্দিরে প্রবেশ কালীন দক্ষিণ দিকের দ্বারদেশের পার্শ্বে উক্ত বাক্সটী স্থাপিত।

এই দরজা পার্শ্বে তিন চারি ধাপ উপরে উঠিয়া গণেশজীর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিলাম। দুরাত্মা কালাপাহাড় ইহাঁর গাত্রের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ভুবনেশ্বর-মন্দিরের এমন সুন্দর গঠন ও ভাস্করখোদিত

শিল্পনৈপুণ্যের চরমোৎকর্ষ, কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তর ভাগ এমনি অন্ধকার যে নিজেকে নিজে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘৃতের ক্ষীণ দীপালোক সাহায্যে যাত্রীগণ দেবতা দর্শন করিয়া থাকেন। অধিকন্তু মন্দিরাভ্যন্তরে চর্ম্মচর্চ্চিকার (চামচিকার) দুর্গন্ধে তিষ্ঠান ভার। দেবতার পূজারও বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, যাঁহার যাহা ইচ্ছা দিতে পারেন ও ইচ্ছামত স্বহস্তে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া পূজা করিতে পারেন। লিঙ্গ মূর্ত্তির কোনরূপ আভরণ হইতে পারে না। কেবলমাত্র তাঁহাকে একটী সুবর্ণ উপবীত দ্বারা পরিশোভিত দেখিলাম। যদিও ভগবানের অন্য কোন অলঙ্কার নাই তথাপি তাঁহার উৎসব ও নিত্য পূজার ব্যবস্থা মহা সমারোহ ব্যাপার।

মূলমন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে ভগবতীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের আকার ছোট হইলেও ইহা দেখিতে অতি উত্তম এবং ইহার গঠনকার্য্যে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। মন্দিরটী দীর্ঘে ১৬০ ফিট, প্রস্থে ৫০ ফিট ও উর্দ্ধে ৫৪ ফিট। ইহার গর্ভগৃহ ভিতরে ৩৫ ফিট দীর্ঘ এবং প্রস্থ ৩০ ফিট। দেবী-কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের গঠিত সুন্দর মূর্ত্তি। ইহাঁর নিত্য পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। ইঁহার উত্তর দিকে একটী সুবৃহৎ কূপ আছে। এই কূপোদকে দেবদেবীর ভোগান্ন রন্ধন হইয়া থাকে। মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির ও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। ভুবনেশ্বর ও ভগবতীর মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যে যে সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত, তন্মধ্যে নীল প্রস্তরের দ্বিভুজা সাবিত্রী, ষষ্ঠীদেবী ও লক্ষ্মীদেবী মহিষ-বাহনোপরি চতুর্ভুজ ভল্লুকবদন যমরাজ, নরসিংহমূর্ত্তি এবং দারুময় পতিতপাবন মূর্ত্তিই প্রধান। এতদ্ভিন্ন বিস্তর ছোট বড় নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকল গুলির নিয়মিত পূজাত হয় না, অধিকন্তু মন্দিরে কখনও সম্মার্জ্জনী ক্রিয়াও হয় না। কেবল এক একজন পাণ্ডা

পয়সার লোভে বসিয়া চিৎকার করিতেছে—"বাবু এদিকে নীল সরস্বতী, এদিকে লক্ষ্মী, এখানে পয়সা দিন।" ••

নিত্যপূজার ক্রম।

১। অতি প্রত্যুষে ভুবনেশ্বর দেবের নিদ্রাভঙ্গহেতু দুন্দুভি বাদ্য হইয়া থাকে, সেই সময়ে দর্পণের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ আরত্রিক করিয়া থাকেন।

২। ৬টার সময় মুখ প্রক্ষালন এবং দন্তধাবন জন্য দন্তকাষ্ঠ প্রদান।

৩। ৭টার সময় স্নানাভিষেক, পঞ্চামৃত ও পূত সলিলে স্নান করান হয়।

৪। বস্ত্র পরিধান।

৫। ৮ টার সময় বাল্যভোগ, এই সময় লাজ, নবনীত ও মিষ্টান্ন ভোগ প্রদত্ত হয়।

৬। ১০টার সময় সকাল ভোগ, ইহাতে পিষ্টক খেচরান্ন ও মিষ্টান্ন প্রদত্ত হয়।

৭। ১১টার সময় ভোগমণ্ডপে পক্কান্ন ভোগ প্রদত্ত হয়। এই সময় মূলমন্দিরেও মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে।

৮। ১২টার সময় মধ্যাহ্ন ভোগ, এই ভোগই প্রধান ভোগ, ইহাতে অন্ন, ব্যঞ্জন, মালপো, পায়স, সর ও সরবৎ প্রভৃতি প্রদত্ত হয়। ভোগাবসানে কর্পূরের আরত্রিক হইয়া থাকে। তৎপরে দরজা বন্ধ হইয়া ৪ ঘণ্টা কাল দ্বার আবদ্ধ থাকে।

৯। এই ৪ ঘণ্টাকাল ভুবনেশ্বর দেব বিশ্রাম করেন। তৎপরে ৪ টার সময় দুন্দুভিধ্বনি হয়। সেই সময় দ্বার খোলা হয় এবং পুনশ্চ আরতি হইয়া থাকে।

১০। আরতির পর জিলাপী ভোগ হইয়া থাকে।

১১। ৫টার সময় প্রাতঃকালের ন্যায় পুনরায় জলাভিষেক হইয়া শৃঙ্গার বেশ ও ধূপ দীপাদি প্রদত্ত হয়। শৃঙ্গার বেশের সময় বস্ত্র চন্দন, বিল্বদল, তুলসী, পুষ্পমাল্য এবং নানাবিধ আভরণে ভুবনেশ্বর দেবের দিব্যলিঙ্গ ভূষিত করা হয়। এই সময় দেবমূর্ত্তি দর্শনে পাষণ্ডেরও মনে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

১২। সন্ধ্যার সময় সান্ধ্যভোগ হইয়া থাকে। ইহাতে পকড়ান্ন (দধি ও নেবুর সহিত পান্তা ভাত), অলাবুর অম্ল, নারিকেল, ঘৃত, গুড় গজা ও মতিচুর প্রদত্ত হয়। তৎপরে তাম্বুল নিবেদন করিয়া দিয়া আরত্রিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১৩। সন্ধ্যার পর রাত্রে পুনর্ব্বার আরতি হইয়া বড় শৃঙ্গার বেশ হইয়া থাকে। এই সময়ে হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র ও নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যাদি অর্পিত হয়। তদনন্তর ভাজা পিষ্টক, মোহন ভোগ ও পকড়ান্ন নিবেদন করা হয়।

১৪। ইহার ১ ঘণ্টা পরে পুনশ্চ নিজগৃহে পকড়ান্ন ও দধি দ্বারা গোপন ভোগ হইয়া থাকে।

১৫। রাত্রি ৯ টার সময় পুষ্পাঞ্জলি হইয়া থাকে। গৃহ মধ্যস্থিত বেদীপীঠোপরি পঞ্চপাত্রে মিষ্টান্ন ও কদলীদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া সজ্জিত করা হয়।

১৬। তৎপরে পুনশ্চ কর্পূরালোকে আরত্রিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১৭। এইবার দেবতার শয়ন। এই সময় গৃহমধ্যে শয্যা ও উপাধান সহ সজ্জীকৃত খট্টাঙ্গ এবং পুষ্পমাল্য, তাম্বুল ও জল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া প্রধান অর্চ্চক দেবতাকে সম্বোধন করিয়া কহেন "হে দেবদেব, আপনার জন্য দেবী অপেক্ষা করিতেছেন।" এই বলিয়া প্রণাম করিয়া দ্বার বন্ধ করেন। সমস্ত রাত্রি আর দ্বার খোলা হয় না।

মাসিক উৎসব।

১। প্রথমাষ্টমী যাত্রা—ইহা অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ভুবনেশ্বরের ধাতুময় ভোগমূর্ত্তি চন্দ্রশেখরকে পাপনাশিনী নামক ক্ষুদ্র সরোবরে রথারোহণে আনয়ন করিয়া যথারীতি জলাভিষেক দ্বারা অর্চ্চনা করা হয়। এই পাপনাশিনী নদী মূলমন্দিরের ৩০০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত।

২। প্রাবরণ ষষ্ঠীযাত্রা—ইহা উক্ত মাসে শুক্লষষ্ঠীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ দিবস ভগবানকে প্রথম শীত বস্ত্র ধারণ করান হয়।

৩। পুষ্যাভিষেক যাত্রা—ইহা পৌষ মাসের পূর্ণিমাতে হয়; এতদুপলক্ষে পূর্ব্ব দিবস চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে বিন্দুসরোবর হইতে ১০৮ কলসী জল আনিয়া দেবতার অধিবাস করা হয়। তৎপর দিবস পঞ্চামৃত দ্বারা ভবানী ও শঙ্করের অভিষেক করিয়া নববস্ত্র পরিধান করান হয়। তদনন্তর অষ্টাক্ষরী মন্ত্রে তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৪। মকর সংক্রান্তি বা ঘৃতকম্বলযাত্রা—ইহা উক্ত মাসের মকর সংক্রান্তি দিবসে হইয়া থাকে। ইহাতেও পূর্ব্ব দিবসে অধিবাস করিয়া পরদিন সংক্রমণ কালে পঞ্চামৃতের অভিষেক ও ১০৮ কলসী জলে স্নান করান হয়। তৎপরে নূতন শীতবস্ত্র পরিধান, পূজা ও নবান্ন ভোজন করান হইয়া থাকে।

৫। মাঘসপ্তমী যাত্রা—ইহা মাঘ মাসের শুক্ল সপ্তমীতে হইয়া থাকে। সেই দিবস ভুবনেশ্বরের ভোগমূর্ত্তি চন্দ্রশেখরকে শিবিকারোহনে মহাসমারোহে ভাস্করেশ্বর মন্দিরে আনয়ন করা হয়। তদনন্তর তথায় তাঁহাদের অর্চ্চনা ও তিলপিষ্টকের ভোগ প্রদান করা হয়। অপরাহ্ণে ভোগমূর্ত্তি প্রত্যাবৃত্ত হন।

৬। শিবরাত্রি যাত্রা—ইহা ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস লক্ষ লক্ষ বিল্বপত্র ভুবনেশ্বর দেবের মস্তকে অর্পিত হয়। এই সময় যাত্রীদের মহাভীড় হইয়া থাকে, এই উৎসবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রসিদ্ধ।

৭। অশোকাষ্টমী যাত্রা—ইহা চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস ভুবনেশ্বরের ভোগমূর্ত্তি চন্দ্রশেখরকে সুন্দর রথে আরোহন করাইয়া অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে বায়ুকোণস্থিত রামেশ্বরের মন্দিরে আনয়ন করা হয়। তথায় ইন্দ্রদ্যুম্নের পাটরাণী গুণ্ডিচার ভবনে ৫দিন থাকেন। ইহা ঠিক পূরীর রথযাত্রা সদৃশ। রথটীর পরিমাণ দীর্ঘে প্রস্থে ১৬ হস্ত ও উচ্চে ২১ হস্ত। রথের ৪টী ঘোটক ও ৪টী চাকা আছে, ধ্বজায় ত্রিশূল ও বৃষ অঙ্কিত।

৮। দমনকভঞ্জিকা যাত্রা—এই যাত্রা চৈত্র মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে সম্পন্ন হয়। ঐ দিবস চন্দ্রশেখর অনন্ত বাসুদেবের ভোগমূর্ত্তির সহিত বিন্দুসরোবরের পূর্ব্ব দিকস্থ তীর্থেশ্বরে গমন করিয়া দমনকের মালা পরিধান করেন।

৯। চন্দন যাত্রা—এই যাত্রা বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া ২২ দিন পর্য্যন্ত থাকে। ভোগমূর্ত্তি চন্দ্রশেখরকে অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে চন্দন শৃঙ্গারে বিভূষিত করিয়া প্রত্যহ রজনীতে বিন্দুসরোবরে আনয়ন করিয়া জলক্রীড়ার উৎসব করা হয়। সরোবরের ক্ষুদ্র দ্বীপে যবাদির মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে।

১০। পরশুরামাষ্টমী যাত্রা—ইহা আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমীতে হইয়া থাকে। এই দিবস চন্দ্রশেখরকে বিমানে আরোহণ করাইয়া পরশু-রামেশ্বরের মন্দিরে আনয়ন করা হয়। তথায় পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা তাঁহার শৃঙ্গার বেশ হইয়া থাকে। সেই সময় বার বিলাসিনীগণ নৃত্য গীত করিয়া থাকে।

১১। শয়নচতুর্দ্দশী যাত্রা—ইহা আষাঢ় মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস শিবতুর্গার স্বর্ণময়ী অন্য উৎসব মূর্ত্তিকে ৪ মাসের জন্য শয়ন করান হয়। ইহা ঠিক বৈষ্ণবগণের শয়ন একাদশীর ন্যায়।

১২। পবিত্রা-রোপণ যাত্রা—ইহা শ্রাবণ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস উৎসব মূর্ত্তির জলাভিষেকের পর নববস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করান হয়। এতদুপলক্ষে ঐ দেশীয় প্রত্যেক ব্রাহ্মণে প্রাতঃস্নান করিয়া নববস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন।

১৩। কৃতান্ত দ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার যাত্রা ইহা কার্ত্তিক মাসে শুক্ল দ্বিতীয়ার দিবসেই হইয়া থাকে। ঐ দিবস চন্দ্রশেখর শিবিকা-রোহণে যমেশ্বরের মন্দিরে গমন করেন। তথায় তাঁহার পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে এবং উৎসব উপলক্ষে তাহার সমক্ষে বারবিলাসিনীগণ নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

১৪। উত্থান চতুর্দ্দশী—ইহা কার্ত্তিক মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীর দিন হইয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণমূর্ত্তির এই দীর্ঘকালের পর শয়ন হইতে উত্থান হইয়া থাকে। সেই সময়ে দুন্দুভি ধ্বনি ও আরতি হয়। তদনন্তর জলাভিষেকান্তে নববস্ত্র পরিধান ও ভোগাদি নিবেদন করা হয়।

আমাদের দেশে যেমন বৈশাখ হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়, উহাদের তেমনি অগ্রহায়ণ হইতে প্রথম মাস আরম্ভ হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বর দেবের প্রায় প্রত্যেক মাসে একবার কখনও মাসে দুইবার উৎসব হইয়া থাকে। কেবল জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাসে কোন উৎসব দেখিতে পাওয়া যায় না—তবে উপযাত্রায় এই তিন মাসেও উৎসব হইয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লষষ্ঠীতে শীতল ষষ্ঠী উৎসব হইয়া থাকে, ঐ দিবস চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি কেদারেশ্বরে যাইয়া গৌরী দেবীকে বিবাহ করেন।

ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর দিবস শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ভুবনেশ্বরেরও উৎসব হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত এই ষোড়শ দিন মন্দিরে নৃত্যগীত ও পূজা হইয়া থাকে। ইহা ঠিক বঙ্গীয় দুর্গোৎসবের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন বিজয়া দশমীর দিন ও কোজাগরী পূর্ণিমার দিন মহা মহোৎসব হইয়া থাকে।

রান্নাবাটী।

ভুবনেশ্বরের পাকশালা বা রান্নাবাটী দেখিবার জিনিস, নিত্য ভোগের জন্য এবং যাত্রীদের ভোগের নিমিত্ত ইহা দুই অংশে বিভক্ত। মন্দিরের ভিতর, দক্ষিণদিকের একটী বাটীতে চতুর্দ্দিকস্থ ঘরের ভিতর বিস্তর লম্বা লম্বা উনুন জ্বলিতেছে। কোথাও অন্ন, কোথাও পায়স, কোথাও বা ব্যঞ্জন ইত্যাদি রন্ধন হইতেছে। ভারবাহীগণ রন্ধনান্তে মুখ ও নাসিকা বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া ভোগপাত্র সকল ভারে করিয়া যথাস্থনে রাখিয়া আসিতেছে। যে যে সময়ে ঠাকুরের ভোগ হয়, ভোগান্তে সেই সেই সময়ে সেই সকল ভোগান্ন বিক্রয় হইয়া থাকে। পুরীর ন্যায় এখানেও তাহা সকলেই ক্রয় করিয়া মহাপ্রসাদ জ্ঞানে সেবা করিয়া থাকেন। ইহা কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না কিম্বা কেহ ঘৃণা করে না একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

আমরা ভুবনেশ্বর দর্শনান্তে যথাক্রমে একটী গর্ভগৃহে দোল গোবিন্দ এবং রুক্মিণী, অন্যগৃহে চন্দ্রশেখর, পার্ব্বতী ও বাসুদেব তৎপরে পঞ্চবক্ত্র, অন্যস্থানে রঘুনাথ ও চন্দ্র সূর্য্য মূর্ত্তি সন্দর্শন করি। এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে সূর্য্য ও তৎপরে চন্দ্রের মূর্ত্তির পূজা হয়, তৎপরে অন্যান্য মূর্ত্তিগুলির পূজা হইয়া থাকে। প্রত্যেক স্থানেই পূজারী পাণ্ডা বসিয়া আছে, যাত্রী দেখিলেই দর্শনী আদায় করিতেছে। নাটমন্দিরের উত্তরদিকে তৃতীয় দরজার ধারে ভুবনেশ্বর দেবের বাহন

বৃষভমূর্ত্তি শয়নাবস্থায় রহিয়াছে। এই বৃষভ দেবতার বাহন ও দ্বারপাল বলিয়া প্রত্যেক যাত্রীই পূজা করিয়া থাকে। বৃষভটী উচ্চে পাঁচ ফিট হইবে এবং ধূসরবর্ণের স্যাণ্ডষ্টোনে বহুশিল্পনৈপুণ্যে নির্ম্মিত। ইহার পার্শ্বে তিনফুট অবয়ব বিশিষ্ট লক্ষ্মী নারায়ণ মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, ইনি নীলবর্ণ শীলাখণ্ড হইতে খোদিত। ভাস্কর ইহাদের গাত্রে এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিয়াছিল যে ক্ষুদ্র অলঙ্কার এমন কি ক্ষুদ্র হস্তের ক্ষুদ্র অঙ্গুরী পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা যায়। এখন অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দেবীপাদহরা।

ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমরা দেবীপাদহরা সরোবর দেখিতে গেলাম। একটী ক্ষুদ্র বালিচর মধ্যে স্যাণ্ডষ্টোনে বাঁধান সোপান বিশিষ্ট চতুষ্কোণ সহস্র লিঙ্গ সরোবর বা দেবী পাদহরা বিরাজিত। ইহার চতুর্দ্দিক ৬।ফট উচ্চের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে ১০৮টী শিবলিঙ্গ রহিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় অবস্থার পরিবর্ত্তনে ইহাঁদের আর নিত্য পূজা হয় না। পার্ব্বতী গোয়ালিনীরূপে কাম-বিমোহিত কীর্ত্তি ও বাস নামক অসুরদ্বয়কে এই স্থানে নিধন করিয়াছিলেন। দেবীর পদভরে এই স্থানে একটী সরোবর হয়, সেই জন্য এই সরোবরের নাম দেবীপাদহরা। এই সরোবরের ১ মাইল দূরে কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এখানে কপিলেশ্বর শিব ও কালী আছেন। উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত রোগীগণ এখানে হত্যা দিয়া থাকে। এই স্থানকে কপিলাসপুর বলে। এখানেও ৭।৮ শত লোকের বসতি আছে।

ভুবনেশ্বরের পৌরাণিক বিবরণ।

পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরের নাম "একাম্রকানন" ছিল। একাম্রচন্দ্রিকা, একাম্রপুরাণ এবং শিবপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে কাশী বহুজনাকীর্ণ হওয়াতে বিশ্বনাথ দেবর্ষি নারদকে কহিয়াছিলেন,

বৎস নারদ! আমি আর এ কাশীধামে থাকিব না। ইহা জনাকীর্ণ ও তপোবিঘ্নকর হইয়া উঠিয়াছে এবং জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকেরা উপদ্রব করিতেছে। ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ পাইল; যজ্ঞাদিতে হবির্ভাগও লোপ হইল সুতরাং আমাকে কাশীসদৃশ একটী সুন্দর স্থানের নাম বল, আমি তথায় যাইব। ইহা শুনিয়া নারদ আনন্দসহকারে বলিলেন প্রভো!

লবণস্যোদধেস্তীরে নীলশৈল নগোত্তমঃ।
তদুত্তরেচ বিখ্যাতং ক্ষেত্রমেকাম্রকং প্রভো॥
তত্র শ্রীবাসুদেবাখ্যো রমানাথো জগদ্‌গুরুঃ।
অনন্তেন সহ শ্রীমানেকাকী বিজনে বনে॥
তৎস্থানং পরমং গুহ্যম্ ন জানাতি প্রজাপতিঃ।
ভবানপি ন জানাতি দেবতানাঞ্চ কা কথা॥
একাম্রং পরমং গুহ্যম্ জগন্নাথস্য চক্রিণঃ।
ক্রোড়স্থিতাব্ধিকন্যাপি নৈব জানাতি শঙ্করঃ॥

হে প্রভো—লবণ সমুদ্রতীরে নীল নামে একটী উত্তম নগর আছে—তাহার উত্তরে বিখ্যাত একাম্রকানন অবস্থিত। সেই বিজনবনে জগদ্‌গুরু রমানাথ "শ্রীবাসুদেব" নাম ধারণ করিয়া অনন্তদেবের সহিত বাস করিতেছেন। সেই স্থান পরম গুহ্য, এমন কি প্রজাপতি ব্রহ্মা—জানেন না,—আপনিও জানেন না,—দেবতাদের ত কথাই নাই। হে শঙ্কর! চক্রী জগন্নাথের ক্রোড়স্থিত হইয়া লক্ষ্মীদেবীও একাম্রকাননের পরম গুহ্যবিষয় জানিতে পারেন নাই। জগন্নাথদেবের কৃপায় আমি এই গুহ্য স্থানের বিষয় অবগত আছি এবং অদ্য আপনাকে এই গুহ্য স্থানের বিষয় অবগত করাইলাম। একথা আর কেহই জানে না। নারদের মুখে এই নব কথা শুনিয়া ভগবান শঙ্কর শৈলসুতা দুর্গার সহিত একাম্রকাননে অনন্ত বাসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া

ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। হে পদ্মনাভসুলোচন, আপনাকে নমস্কার! হে নীলজীমূতবপু, আপনাকে নমস্কার। হে একাম্রনিবাস পীতাম্বর, আপনি জগতের আদিকারণ, হে বিভো! লীলাময়, একবার নয়ন উন্মিলন করিয়া আমাকে অবলোকন করুন, আমি আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি, আপনার এই পরম রমণীয় স্থানে আমাকে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করুন।

মহাদেব এইরূপ স্তব করিলে বিষ্ণু নয়ন উন্মিলন করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে শম্ভো তুমি পার্ব্বতীর সঙ্গে এইস্থানে অবস্থান কর। কিন্তু একটী সত্য করিতে হইবে যে তুমি আর কাশীতে ফিরিতে পারিবে না। মহাদেব বলিলেন আমি কিরূপে একবারে কাশীধাম পরিত্যাগ করিব। তথায় আমার জন্য পুণ্যতোয়া জাহ্নবী এবং পাপনাশিনী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। ঐ স্থান আমার ও পার্ব্বতীর বড়ই প্রীতিপ্রদ, কেবল বহু জনাকীর্ণ হওয়ায় আমি কাশীধাম পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান বিষ্ণু কহিলেন হে শঙ্কর, এখানে আমার সম্মুখে পাষাণ ও গুল্মাচ্ছাদিত পাপ-নাশিনী মণিকর্ণিকা আছে এবং এখানে অগ্নিকোণে আমার পদনিঃসৃতা গঙ্গা যমুনা প্রবাহিত হইতেছে একথা নারদও জানে না এবং এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীর্থ আছে তাহা ক্রমশঃ অবগত হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া শঙ্কর শপথ পূর্ব্বক এই একাম্রকাননে বাস করিবার অঙ্গীকার করিলেন।

তখন বাসুদেবের অনুজ্ঞায় শঙ্কর তাঁহার দক্ষিণ দিকে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই লিঙ্গের মূলদেশ স্ফটিকসঙ্কাশ, মধ্যভাগ মহানীল ও ঊর্দ্ধভাগ মাণিক্যাভ হইল। এই লিঙ্গমূর্ত্তি ত্রিভুবনেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। পার্ব্বতী শঙ্করের মুখে এই একাম্রনাথের বিবরণ শুনিয়া তাথায় আসিয়া তাঁহার পূজা করিলেন।

এক দিবস পার্ব্বতী পুষ্পচয়নার্থে বনান্তরে যাইয়া দেখিলেন যে একটী

হ্রদ হইতে সহস্র সহস্র গাভী উত্থিত হইয়া নিকটস্থ গোসহস্রেশ্বর লিঙ্গোপরি দুগ্ধ প্রদান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন পার্ব্বতী গোয়ালিনী বেশে ঐ সকল গাভীকে তাড়াইয়া ত্রিভুবনেশ্বরের নিকটে আনয়ন করিলেন। তাহাদের ক্ষীরদ্বারা ভগবানের সেবা হইল! তদবধি তিনি প্রতিদিন ঐ গাভী সকলের দুগ্ধের দ্বারা ত্রিভুবনেশ্বরের অভিষেকাদি করিতে লাগিলেন। একদিন গোয়ালিনী বেশধারিণী পার্ব্বতীর রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া কীর্ত্তি ও বাস নামে দমনকাসুরের পুত্রদ্বয় আসিয়া তাঁহাকে কামনা করিল। তাহাদের কথা শুনিয়া দুর্গা তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইয়া শঙ্করকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর ত্রিপুরারি গোপবেশে তথায় আসিয়া অসুরদ্বয়কে বধ করিবার জন্য ভগবতীকে আদেশ করিলেন। তখন তিনি তাঁহার ভুবনমোহিনী শ্রী ধারণ করিয়া পুনরায় পুষ্পচয়ন করিতে যাত্রা করিলেন। অসুরদ্বয় তাঁহার বিশ্ববিমোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়া কহিল, সুন্দরি! তুমি আমাদের ভজনা করিয়া প্রাণদান কর। এই কথা শুনিয়া দেবী বলিলেন তোমাদের দুইজনের স্কন্ধে ও মস্তকে পদ দিয়া দণ্ডায়মান হইলে তোমরা যদি আমাকে তুলিতে সমর্থ হও তাহা হইলে তোমাদের মনোরথ পূর্ণ করিব। কীর্ত্তি ও বাস এই কথা শুনিয়া পরম আহ্লাদে তথায় অগ্রসর হইয়া মস্তক নত করিলে দেবী পদদ্বারা তাহাদের দুজনকেই চাপিয়া তথায় প্রোথিত করিলেন। তাঁহার পদভরে ঐ স্থান একটী সরোবরে পরিণত হইল, ইহার নামই দেবীপাদহরা সরোবর। [ইহার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।] তদবধি ভুবেনেশ্বর লিঙ্গের মন্দিরপার্শ্বে দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। ইহাদের স্নান ও পানের জন্য ভগবান্ ত্রিভুবনেশ্বর ত্রিশূলাগ্রদ্বারা সেই স্থানে এই পবিত্র বিন্দুসরোবর করিয়া দিলেন। তথায় সমস্ত তীর্থের পবিত্র বারি বিন্দু বিন্দু রূপে আসিয়া মিশ্রিত হওয়ায় ইহার নাম বিন্দুসরোবর হইল।

খণ্ডগিরির মন্দির। (৪৫ পৃঃ।)

Printed by K. V. Seyne & Bros.

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দেখিতে যাইবার জন্য সেই রাত্রেই ২ খানি গাড়ী ১৲ টাকা দিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া রাখিলাম। পরদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই রওনা হইলাম। ভুবনেশ্বর হইতে এই শৈলদ্বয়ের দূরত্ব দুই ক্রোশ। এখানে পৌঁছিতে আমাদের প্রায় ১॥০ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। পথে একটী ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া যাইতে হয়। এই নদীর নাম গন্ধবতা, ইহা অতি ক্ষুদ্র নদী সুতরাং আমাদের গো-শকট ইহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদের গো-শকট এই পর্ব্বতপুঞ্জের পাদমূলে উপস্থিত হইল। আমরা যান হইতে অবরোহন করিয়া বটবৃক্ষমূলে গো-শকট রাখিলাম। একজন শকট-চালক গাড়ীর কাছে রহিল আর একজন আমাদের এই সুন্দর শৈল দেখাইতে সমভিব্যাহারে চলিল। আমরা সেই শকটচালকের সহিত শৈলে উঠিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রথমে একটু উচ্চ ভূমিতে উঠিয়াই দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি ঘর দেখিলাম। সেই গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া দেখিলাম, সন্ন্যাসীগণের বহুকালের অসংখ্য চরণপাদুকা এই গৃহে সুন্দরভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। একজন সাধু তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি পুষ্পদ্বারা সাজাইয়া সেই সকল কাষ্ঠপাদুকার শোভা বর্দ্ধন করিয়া রাখিয়াছেন। দর্শনার্থী যাত্রীগণ দুই এক পয়সা এই সাধুকে দান করিতেছে। আমরা এই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতটী ক্ষুদ্র বলিয়াই হউক অথবা খণ্ডজাতির আবাসস্থান বলিয়াই হউক কিম্বা দুই খণ্ডে বিভক্ত বলিয়াই হউক ইহার নাম খণ্ডগিরি হইয়াছে। একটীর নাম উদয়গিরি অন্যটীর নাম অস্তগিরি। এই উদয়গিরি ও অস্তগিরির মধ্যস্থল দিয়া একটী রাস্তা বরাবর কটকাভিমুখে গিয়াছে। অস্তগিরির উচ্চতা ১২৪ ফিট মাত্র। ইহার অন্যতম নাম স্বর্ণকূটাদ্রি।

আমরা প্রথমে উদয়গিরিতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। কতিপয় সোপান অতিক্রম করিয়া দেহলী প্রাপ্ত হইলাম। গৃহ অলিন্দ স্তম্ভ প্রভৃতি সমস্তই পর্ব্বত গাত্রে খোদিত। প্রত্যেক গৃহ বা গুহা দর্শন করিয়া আর একটু উচ্চে উঠিলাম। তথা হইতে একটু পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া উপর হইতে নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। মনে হইল আমাদের ভ্রমণ এইবার সার্থক হইল। কি দেখিলাম! পর্ব্বত খুদিয়া প্রকাণ্ড চতুঃশাল দ্বিতল বাটী। নিম্নে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, উপরে দ্বাদশটী গৃহের সম্মুখে বিস্তৃত বারাণ্ডা। কোন স্থানে যোড় নাই। কেবল একখানি প্রস্তর কাটিয়া এরূপ একটী আশ্চর্য্য বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা এই অপূর্ব্ব দ্বিতল গৃহকে রাণীহংসপুরী বলিয়া থাকে। তিনদিকে অলিন্দসহ এই ভাস্করকার্য্য বিশিষ্ট খোদিত দ্বাদশ প্রকোষ্ঠ ও অন্যদিকে বৃক্ষাদি শোভিত পর্ব্বতগাত্র। মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিয়া যে নয়ন-সুখ হইয়াছিল তাহা পরিমিত কিন্তু এ দর্শনে সুখের সীমা নাই। ওড্রদেশে আগমন এইবার যথার্থই সার্থক বোধ হইল। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যাঁহারা ভুবনেশ্বরে আসিয়া খণ্ডগিরি না দেখেন তাঁহাদের ভ্রমণ বৃথা মাত্র।

আমরা পর্ব্বতের প্রকোষ্ঠ মধ্যে গিয়া খিলানের উপর এবং দেওয়াল গাত্রে বিবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিলাম। কোনস্থানে সশস্ত্র প্রহরী, কোথাওবা জীবজন্তুর ভীষণ মূর্ত্তি, কোথাও বা নগ্নরনারী ইত্যাদি মূর্ত্তি সকল প্রায় ভগ্নাবস্থায় দেখিলাম। এইরূপ চিত্রাদিবিশিষ্ট কতক-গুলি গৃহ দেখিয়া শেষে হস্তী গুহায় উপনীত হইলাম। এইস্থানে নানা লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই সকল লিপি দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে পর্ব্বত বক্ষে এই অদ্ভুত স্থাপত্যের বয়ঃক্রম অন্যূন ২০০০ বৎসর হইবে। বৌদ্ধগণের এই সকল কীর্ত্তি বলিয়া

অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পর্ব্বতশিখরে একটী জৈন মন্দিরও দেখিলাম। মন্দিরের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

তৎপরে আমরা অস্তগিরি দেখিতে গেলাম। সম্মুখের রাস্তা পার হইয়া এই ক্ষুদ্র গিরির শিখরদেশে আরোহণ করিলাম। উদয়গিরির মত এইটী তত প্রীতিপ্রদ ও দর্শনযোগ্য নহে। এখানে ঐরূপ কতকগুলি গুহা আছে বটে কিন্তু উদয়গিরির মত প্রশস্ত ও সুদৃশ্য নহে। অনেকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় খোদিত রহিয়াছে। এস্থানে একটি সাধু দেখিলাম, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানযোগে পরমার্থচিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কতকগুলি বঙ্গদেশীয় নরনারী বসিয়া রহিয়াছেন দেখিলাম। সম্মুখে কতকগুলি পয়সা পড়িয়া রহিয়াছে। সাধু কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না। শুনিলাম সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সমাগত ভক্তগণের সঙ্গে কিয়ৎক্ষণমাত্র কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। তাঁহাকে আমরা প্রণাম করিয়া পর্ব্বতের অন্যদিকে গমন করিলাম। পর্ব্বতোপরি নানাজাতীয় আরণ্যবৃক্ষে পরিশোভিত এই অপূর্ব্ব স্থানের সুশীতল ছায়ায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলাম। প্রকৃতির নানাবিধ বিহঙ্গের মধুর কূজন শ্রবণে শ্রবণবিবর পরিতৃপ্ত করিলাম। সেইস্থানে আমাদিগের সমভিব্যাহারী শকট-চালক বলিল—এইস্থানে এই যে পর্ব্বতখণ্ড উচ্চ উচ্চ হইয়া খাড়া রহিয়াছে দেখিতেছেন, উহা দেবসভা। ইন্দ্রাদিদেবগণ এইস্থানে বসিয়া মন্ত্রণা করেন। ঐ এক এক খানি প্রস্তরফলক এক এক জনের আসন। তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও বিশ্বাসের আধিক্য দর্শন করিয়া, আকাশগঙ্গা, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দর্শন করিবার নিমিত্ত শিখরদেশ হইতে একটু নিম্নে অবরোহণ করিলাম। বৃষ্টিবারিতে এই সকল কুণ্ড পূর্ণ হয় বলিয়া, বোধ হয় ইহার নাম আকাশগঙ্গা হইয়াছে। পর্ব্বতোপরি এই তিনটী কুণ্ড বৃষ্টির জলে যদিও পূর্ণ হয় তথাপি শ্যাম কুণ্ডের জল অতি স্বচ্ছ ও সুধা সদৃশ সুমিষ্ট।

স্থানীয় লোকেরা এই সকল গুহাকে গুম্ফা কহে। ব্যাঘ্র বদন বিশিষ্ট একটী গুহাকে ব্যাঘ্র গুম্ফা কহে, এই রূপ হস্তী গুম্ফা, অনন্ত গুম্ফা, রাণী গুম্ফা ইত্যাদি। ভুবনেশ্বরে যাত্রীদের আর একটী দ্রষ্টব্য স্থান আছে। ইহা ক্ষুর্দ্দার অন্তর্গত ধৌলিপর্ব্বত। এই পর্ব্বত গাত্রে শ্রীধর্ম্মাশোকের উপদেশ সকল ধর্ম্ম সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল তথাপি জগৎবাসীর নিকট তাঁহার উদার চরিত্রের ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সেই সকল উপদেশ পালি ভাষায় লিখিত। কিরূপ সুন্দর উপদেশ তাহার কয়েকটী, নিম্নে বঙ্গ ভাষায় বিবৃত করিলাম।

১। নিজের উদর পূর্ত্তির জন্য অথবা যজ্ঞার্থে পশু পক্ষী বধ করিওনা।

২। পথিকের জন্য পথ পার্শ্বে বৃক্ষ রোপন ও কূপ খনন মহা ধর্ম্ম।

৩। সাধারণের সুবিধার জন্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিবে এবং ঔষধ সেবার সুবন্দোবস্ত করিবে।

৪। ধর্ম্মোপদেশ দানই শ্রেষ্ঠদান।

৫। অবিশ্বাসীকে সদুপদেশ দান করিবে।

ইত্যাদি বিস্তর উপদেশ পালি ভাষায় লিখিত আছে।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দর্শন করিয়া বাসায় আসিয়া ভুবনেশ্বরের পাণ্ডার নিকট সুফল লইয়া ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যথা সময় পুরীর গাড়ী আসিলে আমরা সেই গাড়ীতে উঠিয়া পুরী পৌছিলাম।

শ্রীক্ষেত্রের মন্দির।   (৪৯ পৃঃ।)

Printed by K. V. Seyne & Bros.

শ্রীক্ষেত্র।

সমুদ্রতীরে এই পুরী অবস্থিত। ইহার অপর নাম শ্রীক্ষেত্র বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ষ্টেশন হইতে শ্রীক্ষেত্রের মন্দির এক মাইল ব্যবধান। আমরা ষ্টেসনের বাহিরে আসিবা মাত্রই অসংখ্য পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। মৃগরাজের মৃগানুসরণবৎ তাহারা একটা মস্ত শীকার ধরিল। আমরাও তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আমাদের কৌলিক পাণ্ডার নামোল্লেখ করাতে তাহারা একটু অপসৃত হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে আমাদের পাণ্ডার লোক আসিয়া অন্য পাণ্ডাগণের সহিত বচসা করিয়া রণজয়ী হইল। সুতরাং ঐ সকল দুর্দ্দান্ত দস্যুদের নিকট হইতে মুক্তি লাভ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমাদের পাণ্ডার লোক সেই জন-কোলাহল ভেদ করিয়া ||৴০ দিয়া একখানি গো শকট ভাড়া করিল। আমাদের দলের প্রায় সকলে গাড়ীতে আরোহণ করিল। কেবল আমরা তিনজন প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীর সেবন করিতে করিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

সকলের মনে আনন্দ, এইবার মহাপ্রভু জগন্নাথদেব দর্শন করিব। সেই ষ্টেশন হইতেই জগন্নাথদেবের ধ্বজ-পতাকা শোভিত অভ্রভেদী মন্দির চূড়াচ্ছবি দর্শন করিয়া আনন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জগন্নাথ দেবের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিলাম। এবং চলিতে চলিতে রাস্তায় যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই মন্দির স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হওয়াতে উত্যক্ত জীবন শান্তিলাভ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ মন্দিরের আরও নিম্নভাগ দেখা যাইতে লাগিল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত যাত্রী কেহ পদব্রজে কেহ বা গোশকটে নিজ নিজ পাণ্ডা লইয়া মহাকলরব করিতে করিতে আসিতে লাগিল। আনন্দ সঞ্চালিত উন্মত্ত পদবিক্ষেপে আমরা

তিনজনে নানা গল্প গুজব করিতে করিতে চতুর্দ্দিকের জনস্রোত ভেদ করিয়া প্রধান রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এই রাস্তাটী অতিশয় প্রশস্ত, ইহা বরাবর শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে ইহার নাম পিলগ্রীম রোড। এই রাস্তাতেই ভগবানের রথযাত্রার সময় বিপুল জনবাহিনীর তরঙ্গ উঠিতে থাকে। সেই রাস্তা দিয়া বরাবর আসিয়া আমরা একেবারেই শ্রীমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তাহারই সম্মুখের গলির ভিতর আমাদের পাণ্ডা ঠাকুরের বাড়ী। আমাদের সমভিব্যাহারী পাণ্ডার লোকটী অতি যত্নের সহিত সকলকে গাড়ী হইতে নামাইয়া একটী মনোরম দ্বিতল বাটীর ভিতরে বাসা ঠিক করিয়া দিয়া পাণ্ডাকে খবর দিতে চলিয়া গেল। আমরা দ্রব্যসম্ভার গুছাইয়া বাসায় ঠিক হইয়া বসিলাম, এমন সময় সেই লোক পাণ্ডাঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিলাম।

তদুত্তরে তিনি বলিলেন আমার নাম দামোদর শিঙ্গাড়ী। উড়িষ্যা-বাসীদের মধ্যে যে সুন্দর সুপুরুষ আছে তাহা বোধ হয় কাহারও ধারণা নাই। কিন্তু আমাদের সম্মুখে সমাসীন এই দিব্যকান্তি পুরুষ রত্নকে দেখিয়া সে ভাব দূর হইল! এবং তাঁহার প্রতি মনে মনে একটা ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিল। ভগবানের শৃঙ্গার বেশ করেন বলিয়াই ইঁহার শিঙ্গাড়ী (শৃঙ্গারী) পদবী। উড়িষ্যার রাজা কর্ত্তৃক তিনি দেব কার্য্যে নিযুক্ত। ঘনকুঞ্চিত কেশ কলাপ পশ্চাদ্দেশে প্রলম্বিত, পরিধানে সুন্দর জরীযুক্ত শুভ্র স্বদেশী সূক্ষ্ম বস্ত্র। গাত্রে জরীপাড়যুক্ত রক্তবর্ণ শাল। বড়ই মিষ্ট-ভাষী ও সদালাপী। নানা কথার পর তিনি আমাদের স্নানের ব্যবস্থাদি করিয়া একজন পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

সেই বাটীতে একটী কূপ ছিল, পরিচারক "রামা" বহু পরিশ্রমে কপিকলে বিলম্বিত বাল্‌তির সাহায্যে গভীর নিম্ন প্রদেশ হইতে জল

উত্তোলন করিয়া সকলকে স্নান করাইয়া দিল। কূপোদকে শরীর স্নিগ্ধ হইল। তৎপরে পাণ্ডা আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শন করাইবার নিমিত্ত সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলেন।

শ্রীমন্দির।

পাণ্ডার সহিত মন্দিরে আসিয়াই দেখি যে রাস্তার উপর এবং মন্দিরের ঠিক সম্মুখে লৌহরেলিং শোভিত একটী প্রস্তর স্তম্ভ। ইহার নাম অরুণ স্তম্ভ। এক খানি প্রস্তর ফলকে এরূপ উচ্চ স্তম্ভ যে ইহা একটী দর্শনীয় ও আশ্চর্য্যের বস্তু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা উচ্চে ৩৫ ফিট। ইহা কণারক হইতে আনীত। এইস্থানের পাণ্ডা যাত্রিগণের মস্তক ঠেকাইয়া ২।১ পয়সা প্রণামী আদায় করিতেছে। আমরাও একটী করিয়া পয়সা দিলাম। তৎপরে মন্দিরের ভিতর প্রবেশের জন্য সিংহদ্বারসমীপে উপনীত হইলাম। বেত্রহস্তে দুই জন দ্বাররক্ষক অতি ব্যস্ততার সহিত চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে এবং এক এক বার বেত্রের চট্‌পট্‌ শব্দে যাত্রীদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছে।

যে ভূখণ্ডের উপর শ্রীমন্দির নির্ম্মিত, তাহাকে নীলাচল বলে। ইহা ২২ ফিট উচ্চ তজ্জন্য মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলে ২২টী সোপান অতিক্রম না করিলে আর মন্দির-প্রাঙ্গণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই নীলাচল (মন্দির-প্রাঙ্গণ) দীর্ঘে পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬৬৫ ফিট এবং প্রস্থে উত্তর দক্ষিণে ৬৪৪ ফিট এবং ইহার চতুর্দ্দিক লেটারাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত "মেঘনাদ" নামক ২৪ ফিট উচ্চ প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ৪টী প্রবেশ-দ্বার আছে। ১ম পূর্ব্বদিকের প্রধান দরজা সিংহদ্বার নামে খ্যাত। ২য় দরজা উত্তর দিকে হস্তীদ্বার, ৩য় পশ্চিম দিকে খাঞ্জাদ্বার এবং ৪র্থ দক্ষিণে অশ্বদ্বার।

পূর্ব্বদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী সিংহ থাকায় সিংহদ্বার নাম হইয়াছে। যাত্রীদিগকে এই দ্বার দিয়াই প্রবেশ করিতে হয়, কারণ ইহা বড় রাস্তার উপরে স্থিত। ইহারই দক্ষিণ পার্শ্বে গবর্ণমেণ্ট-ডাকঘর (Lion's Gate P. O.)। সিংহদ্বারের ছাদ "পিরামিড" আকারে নির্ম্মিত। ইহার দরজা কৃষ্ণক্লোরাইট প্রস্তরের এবং কপাট শালকাষ্ঠের। দ্বারদেশে জয় বিজয়ের মূর্ত্তি বর্ত্তমান। তৎপরে ভিতরে প্রবেশ মাত্র সম্মুখস্থ দেওয়ালে একটী অঙ্কিত জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখিলাম, আর একটু অগ্রসর হইয়া বামভাগে "শ্রীকাশী-বিশ্বনাথ" ও শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি এবং দক্ষিণ দিকে স্নানমঞ্চ দেখিলাম। তদনন্তর ২২টী প্রস্তর সোপান অতিক্রম করিয়া ভিতর প্রাঙ্গণের প্রাকারে উপস্থিত হইলাম। এই প্রাঙ্গণ পূর্ব্বপশ্চিমে ৪০০ ফিট ও প্রস্থে উত্তর দক্ষিণে ২৭৮ ফিট। এই স্থান হইতে আনন্দ বাজার আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর দিকে ২য় দরজা হস্তীদ্বার। পূর্ব্বে এই দরজার সম্মুখে ২টি ৫ ফিট উচ্চ হস্তীমূর্ত্তি ছিল বলিয়া হস্তীদ্বার নাম হইয়াছে। এক্ষণে এই হস্তীমুর্ত্তিদ্বয় ভিতরের প্রাঙ্গণের সম্মুখে রাখা হইয়াছে। দক্ষিণদিকে দুইটী অশ্বমূর্ত্তি থাকায় দক্ষিণ দরজাকে অশ্বদ্বার কহে। পশ্চিম দ্বারে কোন মূর্ত্তি না থাকায় ইহাকে খাঞ্জাদ্বার কহে। যে দ্বার দিয়াই প্রবেশ কর না কেন এই ভিতরের প্রাঙ্গণে আসিতে হইবে। এই প্রাঙ্গণের প্রবেশপথে দুই পার্শ্বে আনন্দলাড়ু ও শুষ্ক মহাপ্রসাদের বিপণীশ্রেণী শোভা পাইতেছে।

আনন্দবাজার।

ইহার পার্শ্বদেশস্থভূমিই আনন্দ বাজারের বিস্তৃত স্থান। এইস্থানে নিত্যসেবার মহাপ্রসাদ ভোগ মন্দির হইতে আনীত হইয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। বহিঃপ্রাঙ্গণ ও অন্তরপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া নীলাচলের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের গগনভেদী উচ্চ মন্দিরের শোভা দেখিয়া বিস্মিত ও

স্তম্ভিত হইলাম। মনপ্রাণ-হরণকারী এই অপূর্ব্ব শ্রীমন্দির দেখিয়া মনে যে কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দোদ্বেগ উত্থিত হইল তাহা দর্শক ব্যতীত অন্যের উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নাই। এই শ্রীমন্দির চারি অংশে বিভক্ত—১ম ভোগমণ্ডপ তৎপরে নাটমন্দির, তৎপরে মোহন, সর্ব্বশেষে গর্ভস্থান বা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মূলস্থান। এই ৪খণ্ড লইয়া জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির। ইহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত।

১ম ভোগমণ্ডপ, পূর্ব্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৫৮ ফিট ও প্রস্থে ৫৬ ফিট। ইহার বহির্ভাগে অতি সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য আছে। ইহার দরজায় অতি সুন্দর নবগ্রহের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার ছাদ বহির্দৃষ্টে চতুষ্কোণ পিরামিডের ন্যায় ইহার পূর্ব্ব দক্ষিণ ও উত্তর দিকের দরজা সদা সর্ব্বক্ষণ বন্ধ থাকে। কারণ এই স্থানে ভোগ উৎসর্গ করা হইয়া থাকে। ইহাতে দেবতার অন্নভোগ রক্ষিত হয় বলিয়া অন্তঃ প্রবেশ নিষিদ্ধ। অন্নস্থালী বাহকগণ মুখে বসনাবৃত করিয়া প্রচ্ছন্নপথে রন্ধনশালা হইতে পশ্চিম দ্বার দিয়া এই স্থানে ক্রমাগত ভোগ আনয়ন করিতেছে। ইহার সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিম ভাগে নাট মন্দির। ইহা দীর্ঘে ও প্রস্থে ৮০ফিট এই স্থানে (ভোগ মন্দিরের দ্বারদেশের নিকট) গরুড় স্তম্ভ। এইস্থান হইতে জগন্নাথ দেবকে স্পষ্ট দর্শন করা যায় বলিয়া মহাপ্রভু চৈতন্য দেব এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দেওয়ালে হস্ত রাখিয়া ভক্তিভরে প্রত্যহ দেব দর্শন করিতেন। অদ্যাপি দেওয়ালে তাঁহার পঞ্চ অঙ্গুলীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। গরুড় স্তম্ভে সকলে ঘৃতের প্রদীপ দান করিয়া থাকে। স্তম্ভোপরি গরুড় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া যেন হৃদয়ের গুরুভার অপনয়ন করিতেছে।

এই স্থানের ভোগ মণ্ডপের পশ্চিম বহির্গাত্রে শেষ নাগোপরি নারায়ণের অঙ্কিত মূর্ত্তি দেখিলাম। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কারুকার্য্য দৃষ্টি গোচর হইল না। নাটমন্দিরের ভিতর প্রবেশের জন্য

উত্তরে ও দক্ষিণে দুই দিকে দুইটী প্রবেশ দ্বার আছে। শ্রীমন্দিরের ভিতর চর্ম্মনির্ম্মিত ঢাক ঢোল প্রভৃতি কোন প্রকার দ্রব্য লইয়া যাইবার হুকুম নাই। এমন কি মনিব্যাগ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে নিষিদ্ধ। এই শ্রীক্ষেত্রে পূর্ব্বে বহুবার আসিয়াছি, কখন কোন বাদ্য যন্ত্র ঢোলক কি খোল আনিতে দেখি নাই ; কিন্তু এই বার দেখিলাম একদল বৈষ্ণব খোল করতালের সঙ্গে মধুর কীর্ত্তন করিতেছে। এই নাটমন্দিরে নর্ত্তকীগণ ভগবানের সম্মুখে নৃত্য গীতাদি করিয়া থাকে। ইহার পর মোহন, ইহাও দীর্ঘে প্রস্থে ৮০ ফিট, ইহার ছাদ ১২০ফিট উচ্চ। এই স্থানে সময়ে সময়ে এত লোকের আধিক্য হয় যে সেই ভিড় ঠেলিয়া দেব দর্শন দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তজ্জন্য ইহার শেষ ভাগে একটী লম্বা কাষ্ঠের ব্যবধান আছে। ছড়িদার বা প্রহরীরা বেত্র হস্তে এই স্থানে দৃঢ়তার সহিত পাহারা দিতেছে। এক এক থাক করিয়া ক্রমে ক্রমে এই স্থান হইতে লোক ছাড়িয়া থাকে। তজ্জন্য এই স্থানে কাষ্ঠ ব্যবধানের বন্দোবস্ত। বেশী যাত্রীর ভিড় হইলে এই স্থান হইতেই অনেককে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়।

ইহার পশ্চিমে গর্ভস্থান বা মূল মন্দির, ইহাও দীর্ঘ প্রস্থে ৮০ ফিট ; এবং মন্দিরের চূড়া উচ্চতায় ১৯২ ফিট। তজ্জন্য বহুদূর হইতে ইহার অভ্রভেদী উচ্চ চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পাণ্ডা জগন্নাথ দেবের অর্চ্চক, সুতরাং যতই ভীড় হউক না-কেন, আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে কোন দিনই ক্লেশ বা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। এই মোহনের দক্ষিণ দ্বার দেশ দিয়া পাণ্ডা ঠাকুর আমাদের একবারে মূল মন্দিরের ভিতর লইয়া গেলেন। এইস্থান হইতে জগন্নাথ দেবের মূল স্থানে নামিবার দ্বারদেশ ও সোপানাবলী পর্য্যন্ত বড়ই অন্ধকার। পাণ্ডাগণ এই স্থানে অতি যত্নের সহিত হস্ত ধরিয়া উচু নিচু ইত্যাদি রবে সাবধান পূর্ব্বক রত্ন বেদীর নিকট লইয়া যায়। আমাদেরও পাণ্ডা সকলকার হস্ত

জগন্নাথের মূল মন্দির।

(৮৪ পৃঃ)
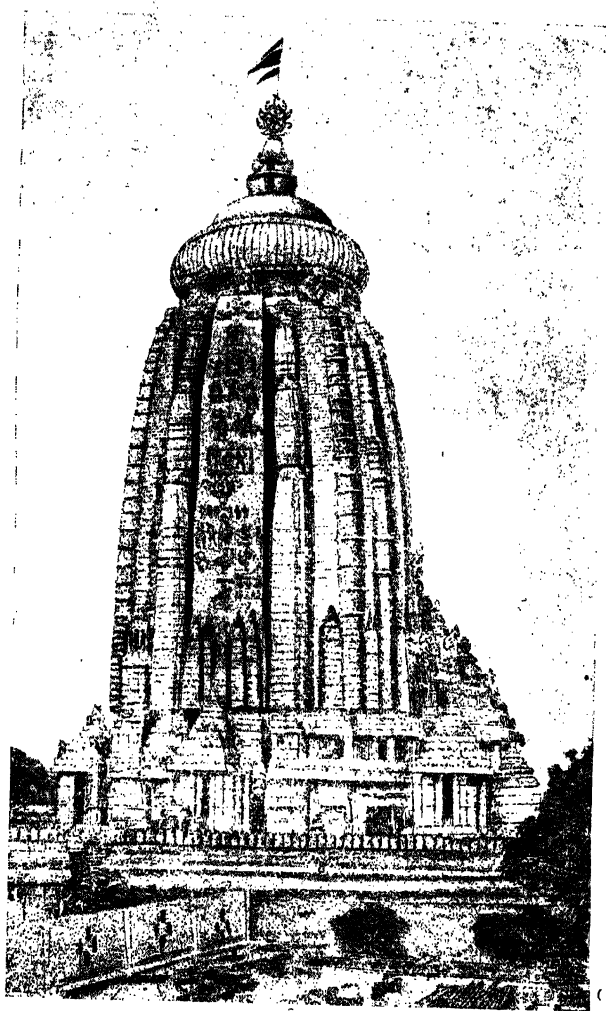
ধরিয়া ধরিয়া মূল স্থানে আনয়ন করিয়া মহাপ্রভু দর্শন করাইলেন। তৎপরে রত্নবেদী স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করাইয়া জগন্নাথ দেবের সম্মুখে আনিয়া বলিলেন,"বাবু, ভাল করিয়া জগন্নাথ মহাপরভু দরশন করুন।"

রত্নবেদীর উপর শালগ্রাম শিলোপরি জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলদেব নানাবিধ বনফুলে সজ্জীকৃত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। জগন্নাথের পার্শ্ব দেশে লম্বাকৃতি সুদর্শন চক্র শোভা পাইতেছে। সকলেরই ললাটদেশ উজ্জ্বল মাণিক্যে পরিশোভিত। নির্ণিমেষ লোচনে প্রাণ ভরিয়া এই মূর্ত্তি চতুষ্টয় দেখিতে দেখিতে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া কেবল মাত্র আনন্দ অশ্রুর প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। মুখে কোন কথাই বলিতে পারিলাম না, কেবল দর্শন, প্রাণ ভরিয়া দর্শন, সে দর্শনের কাছে স্তব স্তুতি লাগে না। আমার কোন বাসনাই নাই যে স্তব স্তুতির দ্বারা কামনার অনল প্রজ্জ্বলিত করিব। আমি কীটানুকীট, জানি না কিপুণ্য ফলে আজ এই জগজ্জন মনপ্রাণ নয়নাভিরাম দেব দেব জগন্নাথদেব দর্শন করিলাম। আমি পাষণ্ড বর্ব্বর, তাঁহার স্তব স্তুতি কি করিব, নয়ন ভরিয়া সেই নয়ন মণি দেখিয়া, কেবল বদ্ধকরপুটে অশ্রুপ্লাবিত গণ্ডে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া প্রাণের আবেগে এই বলিলাম "হে ব্রহ্মাণ্ডপতে! তুমি জগতের নাথ কেবল এক মাত্র নিবেদন যেন শ্রীচরণে মতি থাকে; এবং এই পুরীধামে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আপনাকে দর্শন করিতে পাই এবং অন্তে যেন ঐ শ্রীচরণে স্থান পাই।" নয়ন ভরিয়া বলভদ্র ও সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া বলিলাম হে করুণানিধি? করুণা করিয়া যে আমাকে এই বৈকুণ্ঠ পুরীতে আনয়ন করাইয়া সংসারের জ্বালাময় হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিলেন ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? ভগবান আমার অনেকটা আশা মিটাইয়াছেন, তাঁহার কৃপায় অদ্যাবধি প্রায় ৮।১০ বার এই পুরী ধামে আসিয়া দগ্ধ হৃদয় শীতল করিয়া যাইতেছি।

রত্নদেবী।

রত্নবেদী দীর্ঘে ১৬ ফিট ও উর্দ্ধে ৪ ফিট, ইহা কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রবাদ যে লক্ষশালগ্রাম শিলার উপর এই রত্নবেদী নির্ম্মিত। মূর্ত্তিগুলি একসারে পূর্ব্ব মুখে বসান আছে। প্রথমে উত্তর দিকে সুদর্শন তৎপরে জগন্নাথ, তৎপরে সুভদ্রা, তৎপরে সর্ব্ব শেষে দক্ষিণ দিকে বলরাম রহিয়াছেন। ইহাদের নিকট কতকগুলি ভোগ মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি ১৬ ইঞ্চি উচ্চ, ইঁনি সুবর্ণ নির্ম্মিত। ভূদেবীর মূর্ত্তি রৌপ্যনির্ম্মিত। এবং অপর কতক গুলি মূর্ত্তি পিত্তলের। স্নান যাত্রা ও রথোৎসব ব্যতীরেকে জগন্নাথের মূল মূর্ত্তির কোন উৎসব হয় না। তজ্জন্য তাঁহার প্রতিনিধি উৎসব মূর্ত্তির দ্বারা অন্য উৎসবাদি হইয়া থাকে। জগন্নাথ দেবের উৎসব মূর্ত্তির নাম মদন মোহন ও সুভদ্রার উৎসবমূর্ত্তি লক্ষ্মী দেবী। সুভদ্রা বলিলে শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নীকে বুঝায়, কিন্তু জানিনা কি কারণে ইঁনি জগন্নাথের বনিতা হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে অনন্তদেব বলরাম রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মী দেবী, বলদেবের রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া, রোহিনী গর্ভে বলভদ্রার আকৃতি ধারণ করিয়া ভগ্নীরূপে অবতীর্ণা হন। লৌকিক ব্যবহার হেতু ইঁনি ভগ্নীস্থানীয়া, কিন্তু ইঁনি শক্তি স্বরূপিনী লক্ষ্মীদেবী। ইঁনি নীল মাধবের ক্ষণকাল বিরহ সহ্য করিতে পারেন না।

জগন্নাথ সাধরণতঃ যেরূপ আমরা কলিকাতায় দর্শন করিয়া থাকি; ইনিও ঠিক সেইমত কৃষ্ণবর্ণ, ও গোলাকৃতি চক্ষু যুগল। হস্তে অঙ্গুলি নাই, চরণ আদৌ নাই; বস্ত্রের আধিক্যে উদর প্রকাণ্ড দেখায়। বলরামও ঐরূপ, তবে ইনি শ্বেত বর্ণ এবং সুভদ্রা দেবীর হস্তপদ কিছুই নাই। কেবল ইনি মুখখানি বাহির করিয়া দুই ভ্রাতার মধ্যে শোভা পাইতেছেন। উচ্চে বলদেব ৮৫ যব, জগন্নাথ ৮৪ যব, সুভদ্রা ৫৪ যব এবং সুদর্শন মূর্ত্তি ৮৪ যব, ইহার ব্যাস ২১ যব। প্রবাদ, সমুদ্রের ভয়ে

সুভদ্রার উদরে হস্তপদ প্রবেশ করিয়াছে। দেব সমীপে দিবারাত্র দুইদিকে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। নচেৎ এ অন্ধকারে কেহ কিছুই দেখিতে পাইত না। পাণ্ডাঠাকুর আমাদিগকে রত্ন বেদী প্রদক্ষিণ করাইবার জন্য হস্ত ধরিয়া রত্ন বেদীর পার্শ্বের অন্ধকারময় গলির ভিতরে আনয়ন করিয়া বারত্রয় প্রদক্ষিণ করাইয়া রত্ন বেদীতে মস্তক স্পর্শ করাইলেন ; প্রাণ ভরিয়া মনের আনন্দে সেই রত্ন বেদী স্পর্শ করিয়া আমরা সকলেই সেই রত্ন বেদীর উপর ষোলআনা করিয়া প্রণামী দিলাম। রত্ন বেদীর উপর যাহা কিছু ভেট দেওয়া হয় তাহা মন্দিরে জমা হইয়া থাকে। ইহাতে পাণ্ডার কোন অধিকার নাই।

কেশরী বংশের পর গঙ্গাবংশীয়েরা কিয়ৎকালে রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহারা অপুত্রক হওয়ায় অনিয়ঙ্ক ভীমদেব নামক এক জন ০৯৩ শকে উৎকলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। ৬০টী দেবমন্দির ১৫২টী বাঁধাঘাট ৪০টী বাপী ১০টি সেতু ও এককোটী পুষ্করণী খনন করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিয়া যান। ইনিই শেষে অনঙ্গ ভীম নামে অভিহিত হন।

এই অনঙ্গ ভীমই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া যান। কিন্তু পাণ্ডারা ইন্দ্রদ্যুম্নের দোহাই দিয়া অলীক প্রবাদের অবতারণা করিয়া যাত্রীদের মনে সেই বীজ বপন করিয়া দেয়। এইজন্য দশ হাজার যাত্রীদের মধ্যে বোধ হয় একজনও এ কথা জানেন না যে, অনঙ্গ ভীমই এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। রত্ন বেদীর পশ্চাতে নিম্নলিখিত অনুশাসনটী লিখিত আছে।

শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপ নক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥

রন্ধ্র = ৯, শুভ্রাংশু = ১, রূপ = ১, নক্ষত্রনায়ক = ১. অঙ্কস্য বামা গতি ইতি বচনাৎ ১১১৯ শকাব্দে অনঙ্গ ভীম কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়।

কেহ কেহ বলেন যে ইনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দিরের উপর সংস্কার মাত্র করেন। তাঁহাতে তাঁহার দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। এক্ষণে সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা বড় সুকঠিন।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বিগ্রহ আছেন তাহার মধ্যে পশ্চিম দিকের দুইকোণে প্রধান দুই দেবী আছেন, ১ম বিমলা ২য় লক্ষ্মী দেবী। দক্ষিণদিকে বটবৃক্ষ তলে শ্রীবটেশ্বর দেবই প্রধান দর্শনীয়। বহির্ভাগে মন্দির গাত্রেও ছোট ছোট সোপান অতিক্রম করিয়া উচ্চে উঠিলে বামন অবতার, কল্কিঅবতার ও নৃসিংহদেব প্রভৃতি দর্শন হইয়া থাকে। এই স্থানে এক একজন পাণ্ডা আছে, তাহারা দর্শনী লইয়া দর্শন করায়। মন্দিরের উর্দ্ধতন অংশে ষড়্ভূজ মূর্ত্তি ও অন্যান্য অনেক দেব মূর্ত্তি দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুই একটী করিয়া উলঙ্গ ও অশ্লীল স্ত্রীপুরুষের প্রতিকৃতি দেখিয়া ঘৃণার উদ্রেক হয়। মন্দিরের সম্মুখীন হইলেই এই সকল অশ্লীল মূর্ত্তি দেখিয়া মস্তক অবনত করিতে হয়। মন্দির গাত্রে নরসিংহদেব প্রভৃতি যে সকল প্রস্তরময় বিগ্রহ আছেন কালাপাহাড় তাহার অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া দিয়াছে কিন্তু এই সকল নগ্ন প্রতিমূর্ত্তির কিছুই নষ্ট করে নাই। কালাপাহাড় বিগ্রহ চূর্ণ না করিয়া যদি এই নগ্ন পুত্তলিকাগুলি ভগ্ন করিত তাহা হইলে পিতাপুত্রে মন্দিরে যাইয়া লজ্জা বোধ করিত না। ইংরাজ-বাহাদুর সর্ব্ব বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন কিন্তু এমন পুরী সহরে এরূপ অশ্লীল ব্যাপার যে ভগ্ন করিবার আদেশ দেন নাই ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মধ্যে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। সেগুলির তালিকা যথাক্রমে সন্নিবেশিত করিলাম।

পূর্ব্বদিকে—১ম চৈতন্য, ২য় রাধাশ্যাম, ৩য় যানাদির ভাণ্ডার গৃহ, ৪র্থ প্রাচীন রন্ধনশালা ; ৫ম রাধাকৃষ্ণ, ৬ষ্ঠ বদরি নারায়ণ।

উত্তরদিকে—১ম কৃষ্ণ, ২য় পটলেশ্বর, ৩য় জগন্নাথ, ৪র্থ সূর্য্য, ৫ম সূর্য্য নারায়ণ, ৬ষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ।

পশ্চিমদিকে—১ম লক্ষ্মী, ২য় সরস্বতী, ৩য় মাখন চোরা, ৪র্থ গোপীনাথ, ৫ম বড় গণেশ, ৬ষ্ঠ রথ যাত্রার বস্ত্রাদির ভাণ্ডার, ৭ম রাধাকৃষ্ণ।

দক্ষিণদিকে—১ম রোহিণী কুণ্ড, ২য় বিমলা, ৩য় ভূষণ্ডিকাক, ৪র্থ গণেশ, ৫ম চন্দন গৃহ, ৬ষ্ঠ নৃসিংহ, ৭ম মুক্তিমণ্ডপ, ৮ম ক্ষেত্রপাল, ৯ম সূর্য্য, ১০ম বটেশ্বর, ১১ মার্কণ্ডেয়, ১২ মঙ্গলা, ১৩ বটকৃষ্ণ।

দক্ষিণ দ্বারে প্রবেশ করিয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তদ্দক্ষিণে গৌর নিতাইয়ের মন্দির তাহার পার্শ্বে রন্ধন শালায় যাইবার পথ। এই মন্দির যে অতি অল্প দিনের তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ চৈতন্য দেবের মূর্ত্তি যখন এই মন্দিরে শোভা পাইতেছেন তখন ইহা অতি অল্পদিনের। চৈতন্য দেব যখন স্বয়ং এই শ্রীমন্দিরে আসিয়া দেব দর্শন করিয়াছিলেন তখন যে এই মন্দির তাঁহার সময়ের অনেক পরে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মন্দিরের উত্তরদিকে ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতর চৈতন্য দেবের চরণ চিহ্ন রক্ষিত হইয়াছে।

আমরা দেবদর্শন করিয়া দক্ষিণদিকের দরজা দিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পাণ্ডার সহিত সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া দেখি সম্মুখে মুক্তি মণ্ডপ, এই স্থানে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। কতকগুলি উড়িয়া সেই স্থানে বসিয়া আছে, তাহারা আমাদের ডাকিয়া বলিতে লাগিল বাবু এই স্থানে আসিয়া কিছু ধর্ম্ম কথা শোন, আমরা বলিলাম কি শুনাইবে বাপু? তাহারা বলিল "রামায়ণ মহাভারত যা আপন ইচ্ছা"। উড়িষ্যাবাসীর বদনে কড়মড় করিয়া আর রামায়ণ শুনিবার বাসনা হইল না, সুতরাং শাস্ত্রব্যাখ্যা আর শ্রবণ করা হইল না। মুক্তি মণ্ডপের পোতাণ ৩৮ ফিট দীর্ঘ প্রস্থ জমির উপর স্থিত। ১৪৪৬শকে ইহা প্রতাপ রুদ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

ইহার পশ্চিমে নৃসিংহ দেবের মন্দির। তৎপশ্চিমে চন্দনগৃহ, এই স্থানে চন্দন ঘর্ষিত ও অনুলেপন প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার পশ্চিমে গণেশ মূর্ত্তি, বায়ুকোণে ভুষণ্ডিকাক, এই কাকই ব্রহ্মা সন্নিধানে রোহিণীকুণ্ডে অবগাহনানন্তর নীলমাধবদর্শনে চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন। এক্ষণে রোহিণী কুণ্ড বুজাইয়া প্রস্তরের দ্বারা লম্বাকৃতি চৌবাচ্চারমত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া একটী প্রস্তরের কাক কুণ্ডোপরি রাখা হইয়াছে।

বিমলা।

ইহার পর বিমলার মন্দির দর্শন করিলাম। এই মন্দির জগন্নাথ দেবের সমসাময়িক বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারও নাট মন্দির, ভোগ-মন্দির ও মোহন আছে। কেহ কেহ বলেন ইনি ৫১ পীঠের এক পীঠ এবং জগন্নাথ ভৈরব; যথা—"বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ"। মন্দিরের ভিতর দেবীদর্শনের পথ অতি অপ্রশস্ত ও অন্ধকারময়। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের মূর্ত্তি। নাটমন্দিরে দেবীর জন্য মালা বিক্রয় হইতেছে। আমরা সেই মালা ক্রয় করিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিলাম। মহাষ্টমীর দিনে জগন্নাথ দেব শয়ন করিলে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় একটী ছাগ বলি হইয়া থাকে। বিমলা দেবীর ভোগ বলরামের ভোগের সহিত প্রস্তুত হয়। ইঁহার স্বতন্ত্র রন্ধন গৃহ নাই।

লক্ষ্মীদেবী।

বায়ুকোণে যে লক্ষ্মীর মন্দির আছে তাহা আকারে ছোট হইলেও গঠন অতি সুন্দর, ইহারও নাট মন্দির, ভোগ মন্দির ও মোহন আছে। লক্ষ্মী দেবীর পৃথক্ রন্ধন গৃহ আছে। অন্যান্য বিগ্রহগণের ভোগ এই লক্ষ্মী দেবীর রন্ধনশালা হইতে প্রেরিত হয়।

অন্যান্য দেব দেবী।

অগ্নিকোণে শ্রীবদরী নারায়ণ মূর্ত্তি, তাহার পশ্চিমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি এই দুই মূর্ত্তির মধ্যস্থলে পুরাতন পাকশালার দরজা। ইহার পশ্চিমে বটকৃষ্ণ মূর্ত্তি। তাহার ঈশান কোণে মঙ্গলাদেবী। ইনি বটবৃক্ষ মূলে অবস্থিতা। দেবের মঙ্গল সাধন জন্য ইনি অবস্থিতা আছেন, ইহার ঈশান কোণে শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর লিঙ্গ। ইহার দক্ষিণে অক্ষয় বটবৃক্ষ মূলে শ্রীবটেশ্বর। এই স্থানে পাণ্ডা ঠাকুর আমাদিগকে বট বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ৩ বার প্রদক্ষিণ করাইলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া সেদিনকার মত মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

মহাপ্রসাদ।

শ্রীমন্দির হইতে বাসায় আসিয়া আমরা বসিয়া আছি এমন সময় পাণ্ডাঠাকুর, মৃণ্ময়স্থালী বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত লম্বাকৃতি হাঁড়ীতে করিয়া মহাপ্রসাদ ও ব্যঞ্জনাদি আনিলেন। আমরা মহানন্দে এই দেবদুর্লভ মহাপ্রসাদ খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিলাম। জগন্নাথের ভোগ অপেক্ষা বলরামের ভোগ অতি সুমিষ্ট ও উপাদেয়। তাহার মূল্যও কিঞ্চিৎ অধিক।

রন্ধনশালা।

শ্রীমন্দিরের ভিতর রন্ধনশালায় ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৃত্তাকার মহানসের উপর লম্বাকৃতি মৃণ্ময়স্থালী, এক শ্রেণীর পশ্চাৎ আর এক শ্রেণী, তদুপরি আর এক শ্রেণী স্থাপিত হইয়া রন্ধন হইয়া থাকে তথা হইতে ভারবাহীগণ বসনাবৃত বদনে ভোগমণ্ডপে আনয়ন করে। মুখ খোলা থাকিলে পাছে কাহার সহিত কথা কহিতে গিয়া ভোগদ্রব্য নষ্ট হয় তজ্জন্য সকলকার মুখ বসনাবৃত। অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগমণ্ডপে এবং

খেচরান্ন ও মিষ্টান্নাদি মূলমন্দিরে নীত হইয়া উৎসর্গ করা হয়। তৎপরে এই ভোগ মহাপ্রসাদে পরিণত হইলে আনন্দবাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। বলভদ্রের ভোগ উত্তম তণ্ডুলের এবং জগন্নাথ ও সুভদ্রার ভোগ সাধারণ তণ্ডুলের হইয়া থাকে। যথায় ভোগ রন্ধন হয় তথায় যাত্রীদের প্রবেশ নিষেধ। আনন্দবাজারে মহাপ্রাসাদ সকলে মুখে দিয়া উচ্ছিষ্ট করিতেছে আবার সেই উচ্ছিষ্ট মাহা প্রসাদ বিক্রয় হইতেছে। ইহাতে কাহারও মনে দ্বিধা নাই, কারণ মহাপ্রাসাদ কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। যেহেতু উৎকল খণ্ডে মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে লিখিত আছে, যথা—

চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূর দেশতঃ।
যথা তথোপযুক্তং তৎসর্ব্ব পাপাপনোদনং॥
নৈবেদ্যান্নং জগদ্ভর্ত্তু গাঙ্গং বারি সমংদ্বয়ং।
দৃষ্টিস্পর্শন চিন্তার্ভিভক্ষণাদঘনাশনং॥

মহাপ্রসাদ পর্য্যুসিত শুষ্ক বা দূর হইতে আনীত হইলেও সর্ব্বপাপ নষ্ট করে। গঙ্গাজল চণ্ডাল স্পর্শে যেমন অপবিত্র হয় না, তদ্রূপ মহাপ্রসাদ নিকৃষ্ট জাতির স্পর্শে অপবিত্র হয় না। মহাপ্রসাদ দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান বা ভক্ষণ মাত্রেই পাপ নাশ হইয়া থাকে।

এই মহাপ্রসাদ খাইবার সময় আর জাতি ভেদ থাকে না। তখন অনেকে পরস্পর পরস্পরের মুখে মহানন্দে এই মহাপ্রসাদ দিয়া সত্য প্রতিজ্ঞানুসারে মহাপ্রসাদ পাতাইয়া থাকেন। তখন আর ব্রাহ্মণ শূদ্র ইত্যাদি জাতি ভেদ থাকে না। মহাপ্রসাদ পাতাইয়া একটা নিকট সম্বন্ধ করিয়া লয়। একার্য্যে স্ত্রীলোকেরাই বিশেষ পটু, পুরুষের মধ্যে অতি বিরল।

মহাপ্রসাদ ২ প্রকার—কাঁচা ও শুষ্ক। প্রত্যহ আহারের জন্য কাঁচা প্রসাদই ব্যবহৃত। এবং যাত্রীগণ যে মহাপ্রসাদ গৃহে লইয়া যান তাহা

ঠিক চাউলের ন্যায় শুষ্ক। পূর্ব্ব দিবসের পান্তা মহাপ্রসাদকে পকড়ান্ন বা পাঁকাল-প্রসাদ বলে। আনন্দ বাজারে মহাপ্রসাদের সঙ্গে আরও নানাবিধ সুমিষ্ট খাজা গজা নিম্‌কি নানা রকমের নাড়ু কটকটি ইত্যাদি মহাপ্রসাদ বলিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। সেগুলিও দেবতার ভোগের পর এইস্থানে আসিয়া বিক্রীত হয়। শ্রীক্ষেত্র হইতে বাটী আসিবার কালীন এই সমস্ত মহাপ্রসাদ ক্রয় করিয়া আত্মীয় স্বজনের বাটীতে প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকে। ঝিনুক, মালা, তিলকমাটী কর্পূরের মালা, থালা বাটী ঘটী চুাড় ইত্যাদি ক্রয় করিয়া আমরাও আত্মীয়গণকে উপহার দিবার জন্য আনিয়াছিলাম।

আট্‌কে বন্ধন।

যখন যাত্রীরা পদব্রজে এই শ্রীক্ষেত্রে আসিতেন তখন পাণ্ডারা জোর করিয়া যাত্রীদিগকে আট্‌কে বাঁধিতে বাধ্য করিত। কিন্তু এখন রেল হওয়ায় আর কেহ বড় একটা আট্‌কে বাঁধেন না। কারণ তখন পাণ্ডাদের অধীনে থাকিতে হইত। তাহারা যেরূপ ভাবে যাত্রীদিগকে পরিচালিত করিত তাহারা পাণ্ডাহস্তস্থিত ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় তদ্রূপেই চলিতে বাধ্য হইত। অধুনা রেল পথের সুবিধা হওয়ায় সকলেই স্বাধীন, পাণ্ডার অধীনে আর কেহ থাকেন না। তবে যাহার ভক্তি আছে এবং অর্থ আছে তিনি যদি মানস করিয়া আট্‌কে বাঁধেন তাহা হইলে তাঁহার পাণ্ডার হস্তে অর্থ না দিয়া যথারীতি লেখাপড়া করা কর্ত্তব্য। নচেৎ দেবতার ভোগের জন্য দেয় অর্থের পরিবর্ত্তে পাণ্ডাঠাকুরের পেটপূজা হইয়া থাকে। আটকের জন্য কিরূপ লেখাপড়া করা কর্ত্তব্য তাহা জ্ঞাত হওয়া উচিৎ। প্রথমে দাতা পাণ্ডা সাক্ষী ও পঞ্চায়েৎ উপস্থিত থাকিয়া বৈকুণ্ঠধামের উপর বসিয়া তালপত্রে আটিকার লেখাপড়া হইয়া থাকে। যিনি যত টাকা দান করিবেন

সেই টাকার সুদ হইতে ভগবানের ভোগ প্রদত্ত হইবে। টাকার পরিমাণে ভোগের তারতম্য হইয়া থাকে।

১৩২৲ টাকা দান করিলে প্রতিদিন ডাল ভাত ও তৈল পাকের ভোগ হয়।

৩৬০৲	,,	,,	সাদা খেচরান্ন	,,	,,
৪৩৪৲	,,	,,	বাদাম পেস্তার খেচরান্ন	,,	,,
৫৫০৲	,,	,,	পুরী ও ক্ষীরভোগ	,,	,,
৭৫০৲	,,	,,	মালপুয়াভোগ	,,	,,
১৫৫০৲	,,	,,	মোহনভোগ	,,	,,
৫৬০০৲	,,	,,	৫৬ প্রকার খাদ্যের ভোগ	,,	,,

এই সপ্তপ্রকার আটিকা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার আটিকা বাঁধিবার নিয়ম নাই। ২০৲ ২৫৲ ৫০৲ ১০০৲ টাকার যে আটকে বাঁধা হয় তাহা আর কিছুই নহে, কেবল অজ্ঞ যাত্রীর নিকট হইতে দেবতার নাম করিয়া পাণ্ডারা ঠকাইয়া লয় মাত্র। একার্য্য প্রায় স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে এবং কে কত টাকার আটকে বাঁধিল তাহা লইয়া রমণী মহলে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া গৌরবের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, তাহাদের টাকা প্রকৃত স্থানেই পৌঁছায় নাই। যখন আটিকা বৈকুণ্ঠধামে পঞ্চায়েৎ ও সাক্ষীগণের সম্মুখে তালপত্রে লিখিত হয় তখন আটকে বন্ধন করিয়া ৪ পুরুষের নাম ধাম লেখা হয়। স্ত্রীলোক হইলে তাহার স্বামীর, শ্বশুরের ও নিজের নাম লিখিত হয়। পুরুষ হইলে তাহার পিতার নাম পিতামহের নাম ইত্যাদি ৪ পুরুষের নাম লেখা হইয়া থাকে।

যাহাদের নিকট ঐ আটিকার টাকা জমা থাকে তাহারা শতকরা ১৪৲ টাকা ও লেখাই ১৲ লইয়া থাকেন। শতকরা ঐরূপ ১৫৲ খরচ পড়ে। প্রতিদিন পাণ্ডা ঐ টাকার সুদ হইতে জগন্নাথ দেবকে ভোগ

প্রদান করিয়া তাহা লইয়া থাকে। পাণ্ডার ইহাই লভ্য। (উপরোক্ত টাকা ভিন্ন অল্প টাকার আটিকা কেবল প্রতারণাপূর্ণ জানিবে। কলিকাতার যাত্রীগণ আটিকার সমস্ত টাকা না দিতে পারিলে পাণ্ডারা ধারের টাকা বলিয়া বাটীতে আসিয়াও তাগাদা করিয়া থাকে; এবং ঐ টাকাতে কলিকাতার খরচ চালাইয়া থাকে)।

নিত্য পূজা বিধি ও দৈনিক ভোগ।

১। জাগরণ—এই সময় দুন্দুভি ধ্বান ও মঙ্গল আরতি হইয়া শৃঙ্গার বেশ হয়।

২। দন্তকাষ্ঠ প্রদান।

৩। বস্ত্র পরিধান—এই সময় দেবমূর্ত্তিত্রয়কে একবারে উলঙ্গ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করান হয়।

৪। বালভোগ—ইহাতে লাজ নারিকেল নবনীত ও দধি প্রদত্ত হয়।

৫। সকাল ভোগ—বেলা দশটার সময় হয়। ইহাতে খেচরান্ন ও পিষ্টক প্রদত্ত হয়।

৬। দ্বিপ্রহর ভোগ—ইহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হয়। ইহাই প্রধান ভোগ, এই সময় আরতি হইয়া বেলা ৪টা পর্য্যন্ত দ্বার রুদ্ধ থাকে।

৭। নিদ্রাভঙ্গ—৪টার সময় দুন্দুভিধ্বনি সহকারে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আরতি করা হয়। এই সময় জিলাপি ভোগ হইয়া থাকে।

৮। সন্ধ্যা ভোগ—এই সময় মতিচুর, গজা, দধি, পকান্ন ও নানাবিধ দ্রব্য প্রদত্ত হয়, এই সময় আরতি হইয়া থাকে।

৯। বড় শৃঙ্গার ভোগ—এই সময় প্রথমে শৃঙ্গার বেশ হইয়া তৎপরে বহুবিধ দ্রব্য ভোগের জন্ম প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই সময় রাজবাটী

হইতে প্রস্তুত অতি উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোগ আসিয়া থাকে। তাহার নাম "গোপালবল্লভ", ইহা আনন্দ বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাজসরকারেই জমা থাকে।

পুরীর রাজবাটীর "গোপাল-বল্লভ" ভোগ ভিন্ন সমস্ত ভোগই শ্রীমন্দিরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পুরীতে প্রায় কেহই রন্ধন করে না, সমস্ত এই মহাপ্রসাদেই সংকুলান হয়। সুতরাং প্রত্যহ কত ভোগ রন্ধন হইয়া থাকে তাহা একবার অনুমান করুন। যখন লক্ষ্মীঠাকুরাণী রন্ধনশালায় গমনপূর্ব্বক সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তখন পুরীতে কেনই বা কেহ অভুক্ত থাকিবে? প্রায় সমস্ত অধিবাসী ও যাত্রীগণ এই ভোগ খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। ভোগের সময় প্রত্যেক বার এক ঘণ্টা সময় মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকে, সেই সময় নাটমন্দিরে নৃত্যগীতাদি হয়।

আমাদের পাণ্ডা প্রধান অর্চ্চক ও শৃঙ্গার বেশকারী, সুতরাং একদিন তিনি আমাদিগকে ভোর ৪ টার সময় শৃঙ্গার বেশ দেখাইতে লইয়া গেলেন। মন্দিরের দরজার তালা শীল-মোহর করিয়া রুদ্ধ থাকে। তিনি সেই তালা খুলিয়া আমাদিগকে লইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কতক গুলি পাণ্ডা ভিন্ন সঙ্গে আর কাহাকেও যাইতে দিলেন না। সিংহ-দ্বার অবরুদ্ধ হইল। আমরা কয়েক জন মহাপ্রভুর মূল মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—৪।৫ জন পাণ্ডা মিলিয়া জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা-দেবীর সমস্ত গাত্রাভরণ খুলিতে লাগিলেন; গাত্রের কাপড় খুলিয়া সেইগুলি বংশ-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড লম্বাকৃতি ডালাতে রক্ষিত হইল। ক্রমে ঠাকুরগুলিকে একবারে উলঙ্গ করিয়া গাত্রমার্জ্জনি দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জনা করা হইল—পরে লম্বাকৃতি অন্য ডালাতে রক্ষিত পরিধেয় বস্ত্র সকল লইয়া দেবতাত্রয়কে পরিধান করান হইল। প্রত্যেক ঠাকুরের বস্ত্রপূর্ণ এক একটী স্বতন্ত্র ডালা আছে। ডালাতে যে কাপড়গুলি রাখা হইল, রাজ

বাটীতে সেই কাপড়গুলি লইয়া গিয়া জলে কাচিয়া শুষ্ক করা হয়। তৎপরে সেই শুষ্ক বস্ত্রগুলি শ্রীমন্দিরে লইয়া গিয়া শৃঙ্গার বেশ করিবার সময় পরিধান করান হয়। যখন দেবতাত্রয়ের উলঙ্গমূর্ত্তি দেখিলাম, তখন দেখি যে ঠাকুরের উপরিভাগ কেমন রঞ্জিত ভিতরে শুদ্ধ দারু-অংশ রঙ বিহীন শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছে এবং জগন্নাথদেবের উদরে ক্রমাগত কাপড় জড়াইয়া জড়াইয়া স্ফীত করা হয়। একটী ডালাতে এত কাপড় থাকে যে অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া বস্ত্র উত্তোলন করিয়াও বস্ত্রের শেষ হইল না। জগন্নাথের ললাটদেশ, উজ্জ্বল বহু মূল্য হীরক খণ্ডে শোভিত। বলরাম ও সুভদ্রার অপেক্ষাকৃত ছোট হীরক দ্বারা ললাটদেশ রঞ্জিত। জগন্নাথের চক্ষু দুইটী গোলাকৃতি এবং হস্তের মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান, তাহাতে অঙ্গুলি নাই; তবে কোন উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণের হস্ত পরান হয়। চরণ আদৌ নাই। কেবল গোলাকৃতি দারুময় পরিধি মাত্র। অহোরাত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত।

পাণ্ডাগণ সকলে মিলিয়া সেই মূর্ত্তিত্রয়কে নানাবর্ণের বস্ত্র দ্বারা পরিশোভিত করিয়া নানাবিধ পুষ্প মাল্যে অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পাদন করিল। তৎপরে আরত্রিক ক্রিয়াদ্বারা তাঁহাদের জাগরণ ও শৃঙ্গারবেশ করান হইল। এই সময় জগন্নাথের পিটুলী ভোগ ও তাম্বুল নিবেদন করা হইল। পাণ্ডাঠাকুর আমাদের একটু একটু করিয়া প্রসাদ বণ্টন করিলেন ও এক খিলি করিয়া নিবেদিত তাম্বুল প্রদান করিলেন। প্রাপ্তি মাত্রই সকলে মহাপ্রসাদ জ্ঞানে বদনে দিলাম, কিন্তু সে প্রসাদ কাহারও ভাল লাগিল না, কারণ কেবল মাত্র চাউলবাটা তাহাতে লবণ বা মিষ্টতার কোন আস্বাদন নাই এবং পানে চূন কি খদির আদৌ নাই; কেবল সুপারিযুক্ত তাম্বুল মাত্র। সুতরাং তাহাও ভাল লাগিল না।

শৃঙ্গার বেশধারী দিব্যকান্তি মূর্ত্তিত্রয়কে প্রণাম করিয়া আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাহিরে আসিলাম। তখনও দেখি প্রভাত হয় নাই।

বাসায় আসিয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখি ৫টা। তখনও বেশ রাত্রি রহিয়াছে, সুতরাং সকলে পুনশ্চ শয্যা লইলাম। তৎপরে প্রভাত হইল, স্নানার্থে সকলে সমুদ্র অবগাহন নিমিত্ত বাসা হইতে বহির্গত হইলাম।

উৎসব।

জগন্নাথ দেবের বারমাসে ২১টী উৎসব হইয়া থাকে। যে সকল উৎসবে জগন্নাথদেব স্বয়ং গমন করিতে না পারেন, তথায় তাঁহার মদনমোহন নামক উৎসব মূর্ত্তির দ্বারা উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১। ঘরলাগী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় অরুণষষ্ঠী দিবসে হইয়া থাকে। ঐ দিবস দেবতাকে শীতবস্ত্র পরিধান করান হয়।

২। অভিষেক—পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উত্তম শৃঙ্গারবেশ হইয়া থাকে।

৩। মকরোৎসব—মকর সংক্রান্তিতে নূতন দ্রব্যের ভোগ দেওয়া হয়।

৪। গুণ্ডিচা—মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে ভোগমূর্ত্তি মদনমোহন গুণ্ডিচায় গমন পূর্ব্বক কয়েক দিবস উৎসব করিয়া থাকেন।

৫। মাঘীপূর্ণিমা—ঐ দিবস ভোগমূর্ত্তি মদনমোহনকে সমুদ্রজলে স্নান করান হয় এবং সকলে মিলিয়া ঐ দিবস তর্পণ করিয়া থাকে।

৬। দোলযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে পূর্ব্বে জগন্নাথদেবেরই দোলযাত্রা হইত এক্ষণে উৎসব মূর্ত্তি মদনমোহনের হইয়া থাকে। কারণ ১৫৬০ খৃঃ অব্দে গৌড়ের রাজা গোবিন্দ দেবের সময় দোলমঞ্চের কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া জগন্নাথদেব পতিত হওয়ায় তাঁহার হস্ত ভগ্ন হইয়াছিল। তজ্জন্য জগন্নাথের ভোগমূর্ত্তি মদনমোহনেরই দোলযাত্রায় উৎসব হইয়া থাকে।

৭। শ্রীরাম নবমী—ইহা চৈত্র মাসের শুক্ল নবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম দিবসে হইয়া থাকে। ভোগ মূর্ত্তিকে রামবেশে সাজাইয়া উৎসব করা হয়।

৮। দমনকভঞ্জিকা—ইহা চৈত্র মাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে নরেন্দ্র-সরোবরের পশ্চিম দিকের জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যানে উৎসব-মূর্ত্তিকে লইয়া গিয়া তাঁহার মস্তক দমনক বৃক্ষপত্রের মালা দিয়া ষোড়শ উপচারে পূজা করা হয়।

৯। চন্দন যাত্রা—অক্ষয়তৃতীয়ার দিবস হইতে ২২ দিন পর্য্যন্ত উৎসবমূর্ত্তি মদনমোহনকে নরেন্দ্র-সরোবরে আনয়ন পূর্ব্বক চন্দনে লিপ্ত করান হয়। তৎপরে একটী ক্ষুদ্র নৌকাতে করিয়া সরোবরের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করান হয়। এই কারণেই নরেন্দ্র-সরোবরের নাম চন্দন-পুষ্করিণী। ইহা দীর্ঘে ৮৭৩ ফিট ও প্রস্থে ৭২২ ফিট এবং চতুর্দ্দিকে স্যাণ্ড ষ্টোনে বাঁধান। ইহার মধ্যে দুইটী ছোট ছোট মন্দির আছে। সেই মন্দিরেই উৎসব মূর্ত্তিকে আনয়ন করিয়া তাঁহার পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে।

১০। প্রতিষ্ঠোৎসব—বৈশাখ মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথিতে পিতামহ ব্রহ্মা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আরাধ্য দেবতা জগন্নাথকে প্রতিষ্ঠা করেন, তজ্জন্য ঐ দিবসে অদ্যাবধি এই উৎসব হইয়া থাকে।

১১। রুক্মিনীহরণ একাদশী—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল একাদশীতে ভোগমূর্ত্তি মদনমোহন গুণ্ডিচা উদ্যানে যাইয়া রুক্মিনী হরণ পূর্ব্বক দেবালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন, পরে রাত্রিতে অক্ষয়বটমূলে তাঁহাকে বিবাহ করেন।

১২। স্নানযাত্রা—মন্দিরস্থ ঈশান কোণে স্নানবেদীর উপর মূর্ত্তিত্রয়কে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে আনয়ন পূর্ব্বক রোহিনী কুণ্ডের জল দ্বারা স্নান করান হয়। তৎকালে লক্ষ্মীদেবী চাহনী মণ্ডপ হইতে স্নান দর্শন করিয়া থাকেন। স্নানের পর শৃঙ্গারবেশ হইয়া বিশেষরূপে পূজা হইয়া থাকে। তৎপরে মোহনের পার্শ্ববর্ত্তী অন্দর নামক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এক পক্ষ অবস্থিতি করেন। এই সময় দেবতার জ্বর হইয়াছে

বলিয়া তাঁহাকে পাচনের ভোগ দেওয়া হয়। সুতরাং পাকশালা ও দরজা এক পক্ষ বন্ধ থাকে। কোন যাত্রী এই সময়ে দেবদর্শন করিতে পান না। স্নান কালে শ্রীঅঙ্গের সমস্ত রঙ উঠিয়া গেলে বিশ্বাবসুর সন্ততিগণ এই পক্ষকালের মধ্যে কলেবরে চিত্রকার্য্য করিয়া পক্ষান্তের দিনে দেবের নেত্র চিত্রিত করিয়া থাকেন। এবং ঐ দিবস নববেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া মহা মহোৎসব হইয়া থাকে।

১৩। রথযাত্রা—আষাঢ় মাসের শুক্ল দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে প্রতি বৎসর তিন খানি নূতন রথ প্রস্তুত হয়, রথের আকার গৃহের ন্যায়, রেসমী পর্দ্দা ও পুষ্প দ্বারা সজ্জীকৃত। ভিন্নপ্রদেশ হইতে নানা প্রকার যাত্রী আগমন করিয়া থাকে। সিংহ-দ্বারের সম্মুখে সুসজ্জিত রথগুলি রক্ষিত হয়। কতকগুলি উড়িষ্যার আদিম শূদ্র অধিবাসী (দৈত্যপতিগণ) রেশমের দড়ি দিয়া জগন্নাথ ও বলরামকে বন্ধন করিয়া রথে উত্তোলন করে। পাণ্ডাগণ সেই সময় মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে। সুভদ্রা ও চক্রমূর্ত্তি, পাণ্ডাগণ ক্রোড়ে করিয়া রথে উত্তোলন করে। তিন দেবতার তিন খানি স্বতন্ত্র রথ। জগন্নাথ দেবের রথ ৪৮ ফিট উচ্চ এবং দীর্ঘে, প্রস্থে ৩৫ ফিট, ১৬ খানি ৭ ফিট ব্যাসের লৌহচক্র। ইহার শীর্ষদেশে চক্র ও গরুড়পক্ষীর মূর্ত্তি থাকে। এই নিমিত্ত ইহার নাম চক্রধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ। বলরামের রথ উচ্চে ৪৫ ফিট এবং দীর্ঘে ও প্রস্থে ৩৪ ফিট। ইহাতে ৬॥ ফিট ব্যাসের ১৪ খানি চাকা আছে। ইহার শীর্ষদেশে তালবৃক্ষ আছে বলিয়া তালধ্বজ নাম হইয়াছে। সুভদ্রার রথ উচ্চে ৪২ ফিট এবং দীর্ঘ প্রস্থে ৩২ ফিট। ইহাতে ৬ ফিট ব্যাসের ১২ খানি চক্র আছে। ইহার শীর্ষদেশে পদ্ম আছে বলিয়া পদ্মধ্বজ নাম হইয়াছে।

শ্রীমূর্ত্তিত্রয় এইরূপে পরস্পর রথে স্থাপিত হইলে তাহাদিগের বহুমূল্য পরিচ্ছদে রাজশৃঙ্গার বেশ করিয়া দেওয়া হয়। সেই সময় সুবর্ণের

শ্রীক্ষেত্রের রথ। (৭০ পৃঃ।)
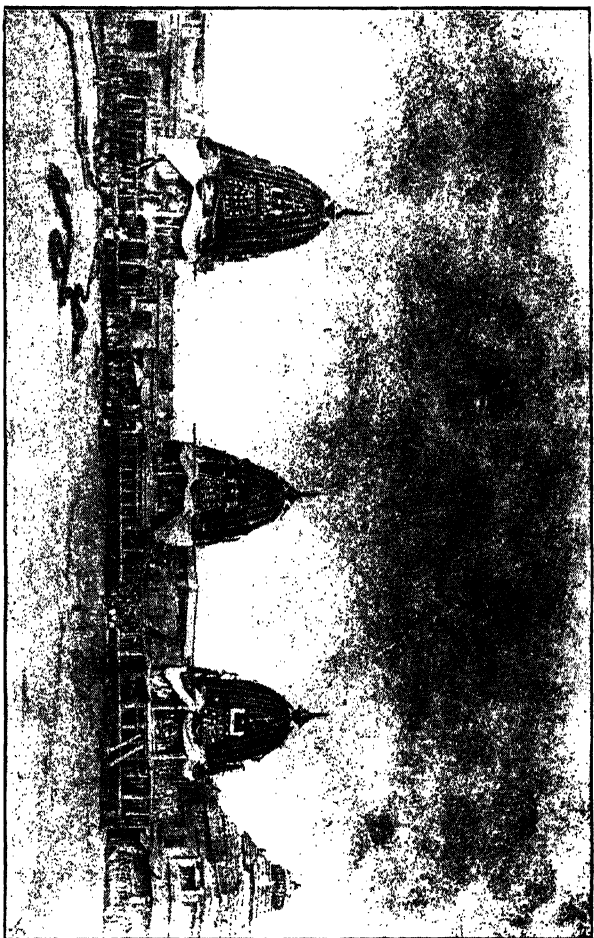
Printed by K. V. Seyne & Bros.

হস্তপদাদি সংযোজিত করিয়া ভগবানের মোহনমূর্ত্তি করা হয়। ইহার পর খুরদার রাজা হস্তী, অশ্ব, পাল্কি প্রভৃতি দ্বারা অমাত্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া মহা সমারোহে পূর্ব্ব প্রথানুসারে তথায় আগমন করেন। খুরদার রাজাই এক্ষণে পুরীর রাজা। ইনি যান হইতে অবতরণ করিয়া নগ্নপদে মুক্তাখচিত সংমার্জ্জনী দ্বারা রথের সম্মুখস্থান মার্জ্জনা করেন। তদনন্তর তিনি স্বয়ং ধূপ, দীপ ও পুষ্পাদিসহ দেবতাদিগের পূজা করিয়া রথরজ্জু ধরিয়া টান আরম্ভ করাইয়া দেন। তৎকালীন ৪২০০ কাল-বেড়ীয়া নামক বৃত্তিভোগী বাহক রথ টানিতে আরম্ভ করে। সেই সময় আনন্দবিহ্বল যাত্রীগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে রথরজ্জু টানিতে টানিতে গুণ্ডিচাভিমুখে গমন করে। এইরূপে রথের টান হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে প্রায় তিন চারি দিন সময় লাগিয়া থাকে। আজ কাল নূতন ম্যানেজারের শাসনে রথ সদ্যসদ্যই গমন করিয়া থাকে।

জগন্নাথ দেব গুণ্ডিচাতে গমন করিলে লক্ষ্মীদেবী পঞ্চমীতে বেশ-ভূষা করিয়া মহা সমারোহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই দিবসেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই উৎসবকে হয়পঞ্চমী কহে।

জগন্নাথ দেব নবমী পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া দশমীর দিন প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আসিবার কালীন গুণ্ডিচার বিজয় দ্বার দিয়া রথের উপর আরোহন করিয়া তিন চারি দিনে পুনরায় মন্দিরে আসিয়া থাকেন। জগন্নাথ দেবকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মীদেবী ভেটমণ্ডপে অপেক্ষা করেন। তৎপরে সেই মূর্ত্তিগুলিকে মন্দিরে পূর্ব্ববৎ আনয়ন করা হয়। এই সময় নীলাদ্রিবিজয় নামে আর একটী উৎসব হইয়া থাকে। রথের সময় পুরীর রাজপথ নানা বর্ণের পত্র পুষ্প ও ধ্বজা পতাকার দ্বারা পরিশোভিত হইয়া থাকে। রথ তিন খানি রাজভবনের নিকটবর্ত্তী হইলে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ ছাদ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া থাকে।

রথের সময় মহাপ্রসাদ বিক্রয় বন্ধ, কারণ কাহার জন্য আর ভোগ রন্ধন হইবে? সুতরাং এই সময় যাত্রীগণ অন্যান্য দ্রব্যাদি বা ফলাহার করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। এই সময় এত অধিক ভিড় হয় যে ৮।১০ টাকা দিয়াও বাসা পাওয়া যায় না। জনতার আধিক্য বশতঃ প্রায়ই যাত্রীগণের মধ্যে বিসূচিকা হইয়া থাকে। অধুনা রেল হওয়ায় ৫।৬ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। যখন রেল হয় নাই তখনও প্রায় ২ লক্ষ লোক হইত। এত জনতা হইবার কারণ এই যে "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীর এই বিশ্বাস যে রথে বামনরূপী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে আর পুনরায় জন্ম হয় না।

১৪। শয়ন একাদশী—রথের পর আষাঢ় মাসেই শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে। মন্দিরের এক কোণে পর্য্যঙ্কোপরি বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেবের ক্ষুদ্রমূর্ত্তিকে শয়ন করান হয়।

১৫। ঝুলন যাত্রা—শ্রাবণ মাসের শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উৎসব হইয়া থাকে। এই কয়েক দিবস মুক্তিমণ্ডপ সজ্জিত হইয়া তাহাতে নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে এবং প্রতি রাত্রিতে মদনমোহন দোলমঞ্চে উপবেশন করেন।

১৬। জন্মাষ্টমী—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে ভগবানের জন্মোৎসব হইয়া থাকে। এই দিবস নর্ত্তকীগণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাসুদেব ও যশোদা সাজিয়া নৃত্য গীত করিয়া থাকে।

১৭। কালীয়দমন—শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে মদনমোহন মূর্ত্তি মার্কণ্ডেয় সরোবরে গমন পূর্ব্বক একটী সর্পের উপর কালীয়দমন অভিনয় করিয়া থাকেন।

১৮। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন—ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে।

১৯। সুদর্শনোৎসব—আশ্বিনী পূর্ণিমাতে (কোজাগরী) সুদর্শন-মূর্ত্তিকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া নৃত্যগীতাদি সহ নগর ভ্রমণ করান হয়। ঐ দিবস লক্ষ্মীরও বিশেষ পূজা হইয়া থাকে।

২০। উত্থান একাদশী—কার্ত্তিক মাসের শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে।

২১। রাসযাত্রা—কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে মহা সমারোহে হইয়া থাকে।

এই সমস্ত উৎসব ভিন্ন অন্য কতকগুলি উপযাত্রা হইয়া থাকে। তাহা উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমীর দিন একটী দর্শনযোগ্য ব্যাপার হইয়া থাকে। সেই দিবস প্রাতঃকাল হইতে পুরীর স্থানে স্থানে কতকগুলি মহিষাসুর মর্দ্দিনী দুর্গা দেবীর অদ্ভুত মূর্ত্তি (সঙের মত নানা আকার প্রকারের) প্রস্তুত করিয়া রাখে। সন্ধ্যার সময় সমস্ত মূর্ত্তিগুলিকে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার সম্মুখে একত্রিত করা হয় এবং সকলে নৃত্য করিতে থাকে। তৎপরে পুরীর রাজবাটীর সম্মুখে ঐ মূর্ত্তিগুলি দর্শন করাইয়া সমুদ্রজলে বিসর্জ্জন করিয়া বিজয়োৎসব করিয়া থাকে। এতদুপলক্ষে বহু উড়িয়া সমবেত হইয়া মূর্ত্তিগুলি স্কন্ধে করিয়া নানা প্রকারের নৃত্য করিতে থাকে। মূর্ত্তিগুলি বেশ বড় বড়, কিন্তু প্রতিমার মুখের দিকে চাহিলে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

পুরীর শ্রীমন্দির ভিন্ন অন্য বহুবিধ দর্শনযোগ্য স্থান আছে। সকল স্থান দর্শন করিতে হইলে অন্ততঃ এক সপ্তাহ তথায় বাস করা উচিত নচেৎ সমস্ত দর্শন অসম্ভব। প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল।

পুরীর দ্রষ্টব্য স্থান।

১ম—স্বর্গদ্বার।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখে দক্ষিণ দিক দিয়া যে পথটী ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে হেলিয়া সমুদ্রদিকে গিয়াছে, সেই বেলাভূমিতে স্বর্গদ্বার অবস্থিত। এই স্থানে ব্রহ্মা দেবমূর্ত্তি গঠনার্থ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হন, তজ্জন্য ইহাকে স্বর্গদ্বার কহে। এই স্থানে অনেক মন্দির ও মঠ আছে। যথা, (১) নিমাই চৈতন্যের মঠ; (২) বিদুরাশ্রম বা মুলুকদাস বাবাজীর মঠ; (৩) স্বর্গদ্বার সাক্ষী; (৪) কানপাতা হনুমান; (৫) সুদামাপুরী; (৬) নানকপন্থীর মঠ।* (৭) কবিরপন্থীর মঠ; † (৮) শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন বা শঙ্করমঠ। ‡

২য়—চক্রতীর্থ।

সমুদ্রতীরে ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল দূরে অগ্নিকোণে বালগুণ্ডি নালার ধারে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ দারুবৃক্ষ ভাসিয়া আসিয়াছিল। এখানে চক্রনারায়ণ মূর্ত্তি এবং হনুমান মূর্ত্তি বিরাজিত।

---

* পঞ্জাব দেশীয় সিদ্ধপুরুষ নানককে শ্মশ্রুধারী দেখিয়া পাণ্ডাগণ মুসলমান ভ্রমে শ্রীমন্দির হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। তিনি অতি কাতরভাবে এই স্থানে আসিয়া জগন্নাথ দেবের আরাধনা করেন। ইহাতে মহাপ্রভু ব্যথিত হইয়া ভক্তের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত গভীর রাত্রিতে স্বয়ং স্বর্ণথালা করিয়া প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হন; এবং তাহার গৌরব রক্ষার্থে পদদ্বারা কূপ খনন করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন। পরদিবস সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া নানকের গৌরব বৃদ্ধি হইল। তদবধি ইহা একটী তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

† এই স্থানে কবিরের কাষ্ঠপাদুকা ও জপের মালা অদ্যাবধি পূজা হইয়া থাকে। এখানে আমানি প্রসাদ বিতরণ হয়।

‡ এই মঠে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের একটী তরুণ বয়স্কের শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত সৌম্য মূর্ত্তি আছে। এই মঠ অতি প্রাচীন, এখানে সংস্কৃত বিদ্যালয় ও অনেক দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। মঠের মহান্তদিগের সাধুতা ও পবিত্রতার জন্য আরমষ্ট্রং সাহেব গবর্ণমেণ্ট হইতে ৩০০ বিঘা নিষ্কর জমি প্রদান করেন। মঠাধিপগণ শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

৩য়—সিদ্ধ বকুল।

সমুদ্র যাইবার পথে গলির রাস্তায় একটি বাটীর ভিতর এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ অবস্থিত। বৃক্ষটী তলদেশ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত ফোঁপরা, কেবল মাত্র একদিকের ত্বকের উপর ভর দিয়া উপরের সমস্ত বৃক্ষটী দণ্ডায়মান। ইহা দেখিলে বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। অনেকে বলেন চৈতন্যদেব, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তমণ্ডলী এই বৃক্ষতলে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতেন। একবার রথের কাষ্ঠের অভাব হওয়াতে রাজার হুকুম হইল যে ঐ প্রাচীন বকুল বৃক্ষটী কর্ত্তন করিয়া উহার গুড়িতে রথচক্র প্রস্তুত হউক। এই নিদারুণ আদেশ অবগত হইয়া ভক্তগণ রোদন করিতে করিতে ঐকান্তিক মনে জগন্নাথদেবকে স্মরণ করিয়া ঐ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। পরদিবস প্রভাতে সকলে দেখিলেন যে বৃক্ষটী ফোঁপরা হইয়া হেলিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষ কর্ত্তন করিতে আসিয়া-কাঠুরিয়াগণ লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল। তদবধি ঐরূপ অবস্থায় বৃক্ষটী আজপর্য্যন্ত অক্ষয় অমর হইয়া পূর্ব্ব কীর্ত্তির বিবরণ যাত্রীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই স্থানে চৈতন্যদেব ও হরিদাস ঠাকুরের মূর্ত্তি বিরাজিত।

৪র্থ—মার্কণ্ডেয় হ্রদ বা সরোবর।

ইহা শ্রীমন্দিরের অর্দ্ধমাইল পশ্চিম উত্তরে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকেই প্রস্তরমণ্ডিত বাঁধা ঘাট। দক্ষিণদিকে মার্কণ্ডেয়শ্বরের মন্দির আছে। কথিত আছে এই স্থানে মার্কণ্ডেয় ঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন। মন্দিরটী ৮১১ খৃঃ রাজা কুন্তলকেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার গঠন নিতান্ত মন্দ নহে, পঞ্চতীর্থের ইহা অন্যতম। উত্তর ঘাটের সন্নিকটে অষ্টমাতৃকামূর্ত্তি বিরাজিত, যথা—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা। সরোবরের পূর্ব্বতীরের মধ্যভাগে কালীয়সর্পের উপর দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিতেছেন।

৫ম—শ্বেতগঙ্গা ।

ইহা শ্রীমন্দিরের অতি সন্নিকটে পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ইহার ধারে শ্বেত-মাধব ও মৎস্য-মাধব বিরাজিত।

৬ষ্ঠ—যমেশ্বর ।

ইহা শ্রীমন্দিরের অর্দ্ধমাইল দূরে দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এই স্থানে শঙ্কর যমের সংযম নষ্ট করিয়াছিলেন। যমেশ্বরের মন্দিরটী সাধারণ, কিন্তু লিঙ্গটীর পূজা করিলে কোটী লিঙ্গপূজার ফল হইয়া থাকে।

৭ম—অলাবুকেশ্বর ।

৬৫০ খৃঃ ললাটেন্দু কেশরী কর্ত্তৃক যমেশ্বরের পশ্চিমে ইহা প্রতিষ্ঠিত। কপিলসংহিতায় উক্ত আছে যে এইস্থানে দেবতার আশীর্ব্বাদে অপুত্রক-ব্যক্তি পুত্র প্রাপ্ত হন এবং কুরূপ সুন্দর হইয়া থাকে।

৮ম—কপালমোচন ।

অলাবুকেশ্বরের অতি সন্নিকটেই ইহা অবস্থিত। কালভৈরবের হস্তস্থিত কপাল (ব্রহ্মার পঞ্চমবক্ত্র) এই স্থানে মুক্ত হয় এবং ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতেও তিনি মুক্ত হন, তজ্জন্য এই স্থান মহাতীর্থ।

৯ম—নরেন্দ্র সরোবর ।

ইহা শ্রীমন্দিরের অর্দ্ধমাইল দূরে উত্তরদিকে অবস্থিত। পুরীর মধ্যে ইহাই বৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট সরোবর। আমরা প্রত্যহ এই সরোবরে স্নান করিতাম। ইহার জলও অন্যান্য সরোবরের মত পানাযুক্ত নীলাভ নহে। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরমণ্ডিত সোপানশ্রেণী ও মধ্যস্থলে ২টী কৃত্রিম দ্বীপ, তদুপরি মন্দির বিরাজিত। বৈশাখ মাসে এই স্থানে জগন্নাথদেবের উৎসব মূর্ত্তি মদনমোহনের চন্দনযাত্রা হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইহাকে চন্দনপুকুরও বলিয়া থাকে।

১০ম—সমাধিমন্দির।

নরেন্দ্র সরোবরের উত্তরদিকে ভগবান বিজয়কৃষ্ণ দেব ঠাকুরের সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতায় মদীয় ভবন সংলগ্ন ৪৫নং হ্যারিসন রোডস্থ বাটীতে ইনি অবস্থিতি করিয়া মধুর হরিসংকীর্ত্তনে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন; এবং দীক্ষা ও সাধনা প্রণালী শিক্ষা দিয়া অনেক পাপী তাপীকে উদ্ধার পূর্ব্বক এই শ্রীক্ষেত্রধামে আসিয়া সমাধি যোগে দেহ ত্যাগ করেন। ভক্ত শিষ্যগণ এই মন্দিরের নিম্নে ভূগর্ভে তাঁহার সমাধি প্রদান করেন। কিয়দ্দিবস পরে সমতল জমির উপর তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিকৃতি জটার সহিত দিব্যমূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হয়। অলৌকিক এই সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই তাঁহার অবতারত্ব স্বীকার করেন। মূর্খ শিষ্যগণ মন্দির প্রস্তুত করিবার সময় এই মূর্ত্তিটী নষ্ট করিয়া তদুপরি মার্ব্বেল প্রস্তর দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে তাঁহারা বেদী সাজাইয়া পুষ্পাদিদ্বারা প্রত্যহ তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই স্থানে একটী সুদৃশ্য বাগানবাটী আছে। তথায় অনেক শিষ্য বাস করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী এই ১০টী দ্রষ্টব্য স্থান ব্যতীত ২টী প্রধান স্থান আছে তাহা প্রত্যেক যাত্রীই দর্শন করিয়া থাকেন। ১ম গুণ্ডিচা-গড় বা মাউসীবাটী, ২য় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। শ্রীমন্দিরের ২ মাইল দূরে ঈশান কোণে গুণ্ডিচাগড় এবং ২॥ মাইল দূরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর অবস্থিত। আমরা বৈকালে ৺০ দিয়া একখানি গো-শকট যাতায়াতের ভাড়া করিয়া গুণ্ডিচাগড় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখিতে গিয়াছিলাম। পিলগ্রিম রাস্তা যেখানে শেষ হইয়াছে সেই স্থানে গুণ্ডিচাগড় তৎপরে আরও অর্দ্ধমাইল পথ গমন করিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। এই স্থানের রাস্তায় ভয়ানক বালি।

১১শ—গুণ্ডিচাগড়।

গুণ্ডিচাগড় যেন একটী বাগানবাটী, চতুর্দ্দিকেই আম্র ও অন্যান্য ফলের বৃক্ষে পরিশোভিত। চলিত ভাষায় ইহাকে গুঞ্জবাড়ী বলিয়া থাকে। রথের সময় জগন্নাথদেব, দাদা বলাই ও ভগ্নীর সহিত এখানে আসিয়া সপ্তাহ কাটাইয়া যান। তজ্জন্য এখানেও মন্দির, রত্নবেদী, রন্ধনশালা, গরুড়স্তম্ভ প্রভৃতি সমস্তই আছে। এমন কি শ্রীমন্দিরের মত অশ্লীল মূর্ত্তিরও অভাব নাই। ইন্দ্রদ্যুম্নের পাটরাণীর নাম গুণ্ডিচা ছিল, তাঁহারই নামে এই গড় খ্যাত হয়। স্থানীয় লোকেরা গুণ্ডিচা রাণীকে জগন্নাথদেবের মাসী বলে; তজ্জন্য ইহাকে মাসীর বাড়ী বা মাউসীঘর কহিয়া থাকে। ইহার প্রাঙ্গণ ৪৩০×৩২০ ফিট, চতুর্দ্দিকের প্রাচীর ২০ ফিট উচ্চ ও ৫॥ ফিট বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমদিকে সিংহদ্বার, দ্বারদেশে ২টী সিংহ, সম্মুখের একটী করিয়া হস্তোত্তলন করিয়া আছে। উত্তর-দিকে বিজয়দ্বার ও মধ্যস্থলে দেবাগার। এই দেবাগারও আবার ৪ অংশে বিভক্ত। দেবল বা মূলস্থান দীর্ঘে প্রস্থে ৫৫×৪৬ ফিট এবং উচ্চে ৭৫ ফিট। ইহার মধ্যে ১৯ ফিট দীর্ঘ ও ৩ ফিট উচ্চ রত্নবেদী আছে। রথযাত্রার সময় মূর্ত্তিগুলি এই রত্নবেদীর উপর ৭ দিবস অতিবাহিত করেন। নাটমন্দিরের ভিতর স্তম্ভোপরি বদ্ধাঞ্জলি গরুড়মূর্ত্তি শোভা পাইতেছেন। রথের সময় ভিন্ন অন্য যত সময়েই এই শ্রীক্ষেত্রধামে গমন করিয়াছি, ততবারই এই গুণ্ডিচাগড়ের রত্নবেদী শূন্য দেখিয়াছি। মন্দিরগাত্রে অনেক দেব দেবীর চিত্র অঙ্কিত আছে। এখানকার রন্ধন-শালা অতি বৃহৎ ও অদ্ভুত ব্যাপার। আমাদের দেশে ইক্ষুশালে গুড়-জ্বাল দিবার জন্য যেমন লম্বা লম্বা উনান বা বানশাল প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ গুণ্ডিচাগড়ের রন্ধনশালায় লম্বাকৃতি বিস্তর উনান প্রস্তুত আছে। কারণ রথযাত্রায় এখানে লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে; সেই কারণে

ভোগের আয়োজনও তদ্রূপ বৃহৎ ব্যাপার হইয়া থাকে। এই উনানে একেবারে হাঁড়ির উপরে হাঁড়ি রাখিয়া অন্নাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই গুণ্ডিচাগড়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথমে আসিয়া পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করেন; এবং তিনি এই স্থানে তিন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপনান্তে বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মদারু হইতে ওঁকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। জগন্নাথদেবের প্রথম মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানকে অনেকে জনকপুর বলে। কারণ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথদেবের জন্ম দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জনক-স্বরূপ। হিন্দুস্থানী ও উড়িয়াগণ জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে তজ্জন্য জনকপুরযাত্রা কহে। গুণ্ডিচাগড়ের চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখিবার নিমিত্ত পদব্রজে গমন করিলাম। বালির রাস্তা বলিয়া গো-শকট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

১২শ—ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

গুণ্ডিচাগড় হইতে পদব্রজে কিয়দ্দূর গলির রাস্তায় আসিয়া প্রকাণ্ড এক মনোরম সরোবর দেখিলাম। এই অপূর্ব্ব দীর্ঘিকাই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজনামে প্রচার করেন। তাই ইহার নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। ইহা দার্ঘে ৪৮১ ফিট ও প্রস্থে ৩৯৬ ফিট। এই পুণ্যপ্রদ সরোবর তীর্থে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

এই সরোবরে অনেকগুলি বড় বড় কচ্ছপ আছে। প্রবাদ এই যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার পর চিন্তা করিলেন যদি আমার অবর্ত্তমানে আমার বংশধরগণ কর্ত্তৃক দেবতার কীর্ত্তিকলাপ লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে এত চেষ্টা সকলই ব্যর্থ হইবে। এই মনে করিয়া তিনি স্ববংশনাশের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এই বর প্রদান করিলেন যে, তোমার সন্ততিগণ এই

সরোবরে কচ্ছপরূপে পরিণত হউক; তাহাতে তোমার কীর্ত্তি অক্ষুন্ন থাকিবে এবং বংশধরগণও অমর হইবে। সেইহেতু এই কচ্ছপগুলি ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশধর বলিয়া যাত্রীগণের নিকট হইতে, খই মুড়কী প্রভৃতি আদরের সহিত পাইয়া থাকে। যাত্রীপ্রদত্ত তীর্থপিণ্ডও ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। সরোবরের তীরে উড়িয়াগণ খৈ মুড়কি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে। আমরাও খৈ মুড়কী কিনিয়া কচ্ছপগুলিকে প্রদান করায় এককালীন বহু কচ্ছপ তথায় আসিয়া নির্ভীকচিত্তে সেইগুলি ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে আমরা বেশ আনন্দ অনুভব করিয়া তীরে উঠিলাম।

এই সরোবরের দক্ষিণ দিকে সোপানের পূর্ব্বপার্শ্বে নৃসিংহ দেবের মন্দির ও পশ্চিমপার্শ্বে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান আছে। উক্ত দেবদ্বয় দর্শনান্তে গৃহাভিমুখে আসিবার কালীন পথে নবগ্রহের মূর্ত্তি সকল এবং দশ অবতার, রাধাকৃষ্ণ, শিবলিঙ্গ ও অন্যান্য অনেক দেবমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

১৩শ—অষ্টাদশ নালা।

গুণ্ডিচাগড় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখিয়া আমরা অষ্টাদশ নালা দেখিতে গমন করিলাম। ইহা নরেন্দ্র সরোবরের পার্শ্ব দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথ হইতে এক পোয়া পথ গমন করিলে অষ্টাদশ খিলানযুক্ত একটী সেতু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই আঠারনালা নামে অভিহিত। "মুটিয়া" অথবা "মধুপুর" নাম্নী নদীর উপর এই সেতু। পূর্ব্বে নদীতে স্রোত ছিল এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে। এই সেতু সম্বন্ধে ২টী প্রবাদ আছে। ১ম রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যাত্রীগণের গমনাগমনের সুবিধার জন্য সেতু নির্ম্মাণকালে নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আপনার অষ্টাদশ পুত্রের বলি প্রদান করিয়া তাহাদের মস্তক প্রত্যেক

নালাকে প্রদান করেন। ২য় প্রবাদ এই যে ভগবান চৈতন্য দেব পুরী আসিবার কালীন এই স্থানে বন্যা প্রযুক্ত খরস্রোত নদটি পার হইতে না পারিয়া রাত্রি যাপন করেন। ভগবান জগন্নাথ দেব গৌরাঙ্গের কষ্টে ব্যথিত হইয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিয়া সেই রাত্রি মধ্যেই এই সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

পূর্ব্বে হাঁটা পথের সময় এই আঠার নালা পার হইবামাত্র পাণ্ডারা যাত্রীগণকে এই স্থান হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজা প্রদর্শন করাইয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে ধ্বজাদর্শনী অন্ততঃ এক টাকা আদায় করিত। এখন রেল কোম্পানির আনুকূল্যে পাণ্ডাদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। যাহা হউক আমরা আঠার নালা দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

১৪শ—লক্ষ্মীর জলা।

আঠার নালা যে রাস্তার উপরে অবস্থিত সেই রাস্তা বরাবর মাঠপানে গিয়াছে। সেই মাঠে আঠার নালার জল গিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় এই স্থানের জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা ও তেজস্কর হইয়াছে। তজ্জন্য এই স্থানে প্রায় বার মাসই ধান্য হইয়া থাকে। ধান্য পাকিয়া যাইলে আবার অন্য দিকে ধান্য রোপন আরম্ভ হয়, এই কারণে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকে, এই স্থানে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন বলিয়া একদিকে ধান্য পাকিতেছে অন্যদিকে গাছ জন্মাইতেছে। এই লক্ষ্মীরজলার ধান্যে ভগবানের ভোগ হইয়া থাকে। এই স্থানের ধান্যের শীর্ষ অনেক গোছা করিয়া লক্ষ্মী ও বিমলা দেবীর মন্দিরে সজ্জিত থাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৫শ—লোকনাথ।

শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে ২ মাইল দূরে ইহা সমুদ্র সন্নিকটে অবস্থিত। আমরা গো-শকটে লোকনাথ দর্শনে যাত্রা করি। মন্দিরের নিকট

পৌঁছিয়া প্রবেশদ্বার সম্মুখে একটী সুন্দর দীর্ঘিকা দেখিলাম। এই সরোবরের নির্ম্মল বারি সেবন করিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইল। তৎপরে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া আম্রবৃক্ষ ও অন্যান্য মহীরূহ সমাচ্ছন্ন দেখিলাম। রৌদ্রের সময় এই সকল বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া যাত্রীগণ ক্লেশ-দূর করিয়া শান্তি পাইয়া থাকে। মন্দিরের প্রাঙ্গণটীও প্রশস্ত। লোকনাথ শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি, লিঙ্গটী সর্ব্বদাই জলে ডুবিয়া থাকে। মন্দিরটী অতি ছোট, বহির্দ্দেশে একটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। এই মন্দিরের ভিতর জলের স্প্রীং বা উৎস থাকায় সর্ব্বদা ধীরে ধীরে জল উঠিতেছে এবং অতিরিক্ত জল দেবীপীঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই দেবী-পীঠের ভিতরেই লিঙ্গটী নিমগ্ন থাকেন। শিবরাত্রির সময় স্প্রীংয়ের মুখ বন্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে সকলেই লিঙ্গ দর্শন করিতে পারেন। স্প্রীংয়ের বিষয় সাধারণ লোকে অবগত না হওয়ায় শিবরাত্রিতেই শুষ্ক দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকে। লোকনাথ জগন্নাথ দেবের তোষাখানার দাওয়ান। তজ্জন্য ইহাঁর ধাতু-নির্ম্মিত উৎসব মূর্ত্তিটী প্রতি রাত্রিতেই শ্রীমন্দিরের তোষাখানায় আনীত হইয়া প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার স্বস্থানে নীত হইয়া থাকেন। প্রাঙ্গণের পশ্চিম-দিকে রন্ধনশালা আছে। তথায় অন্ন রন্ধন হইয়া প্রত্যহ লোক-নাথের ভোগ হইয়া থাকে। ভোগের বিশেষ ঘটা দেখিলাম না। সামান্য ব্যঞ্জনযুক্ত ৩।৪ সের তণ্ডুলের অন্ন ভোগ মাত্র দেখিলাম। তৎপরে আরত্রিক ক্রিয়া দেখিয়া কিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। মন্দিরের বহির্ভাগে বাগানের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বাসায় পৌঁছিতে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল গরুর গাড়ীতে অতিবাহিত করিতে হইল।

সমুদ্র।

পুরীতে পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দির, সরোবর ও দেবদর্শন ব্যতীত একটী প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান আছে, তাহা সমুদ্র। সে সমুদ্র যে কি মহান্ প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি তাহা যে না দেখিয়াছে তাহার জীবন বৃথা। কবির বর্ণনায় চিরকাল সমুদ্রের কথা শুনিয়া আসিতেছি, আজ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিব, এই আনন্দে বাসা হইতে পদব্রজে সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। প্রায় ১৫ মিনিট কাল হাঁটিয়া সমুদ্র সন্নিহিত বালুকাময় বেলা ভূমিতে উপনীত হইলাম। রেল গাড়ীর মত সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন বাসা হইতেই শ্রুত হইতেছিল, এক্ষণে যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই সেই শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। কিন্তু মনে মনে কতই ভাবিতে লাগিলাম কেন এই শব্দ হইতেছে, কিরূপে এ শব্দ হয়! না জানি সমুদ্র কেমন, ইত্যাদিরূপ আন্দোলিত মনে, সতৃষ্ণ-নয়নে, উদ্‌গ্রীব ভাবে বালুকা প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে বিস্তীর্ণ নীলজলরাশি দর্শন করিয়া যেন আত্মহারা হইলাম। রবিকিরণে নীলাম্বু তরতর করিতেছে, প্রচণ্ড উর্ম্মিমালার ঘাত প্রতিঘাতে ভীষণ শব্দ হইতেছে। আহা সমুদ্রের নীলরূপ দেখিতে কি সুন্দর! এ শোভার সীমা নাই, এযে অনন্ত—অফুরন্ত, মানসপটে তখনই উদাসভাব আনয়ন করে। ঐ দেখ অনন্তদেব অনন্তবারিধি বক্ষে ভগবানকে ক্রোড়ে করিয়া যেন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। যথার্থই যেন নারায়ণ অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, মন্দিরে কি দেখিয়াছিলাম, দেবতাই বা কি দেখিয়াছিলাম, যদি যথার্থ কিছু ভগবান বলিয়া থাকেন তাহা এই সমুদ্র। দিব্য চক্ষে সকলেই দেখিতে পাইবেন যেন ঐ মা লক্ষ্মী-দেবী ভগবানের পদপ্রান্তে উপবিষ্টা হইয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। বীচিমালা-বিচুম্বিত সৈকতভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া মনে কত কি ভাবের

উদয় হইতে লাগিল। ক্ষণেকের জন্য উত্যক্ত জীবন শান্তিলাভ করিল, এমন শান্তি আর কখনও পাই নাই, জীবনে আর কখন পাইব কি না বলিতে পারি না। হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইল; প্রেমাবেশে নয়নকোণে ভক্তিবারি আসিয়া জুটিল; আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, তখন শাস্ত্রোক্ত প্রণামমন্ত্রে বলিলাম—

"নমস্তে বিশ্বগুপ্তায় নমো বিষ্ণোহ্যপাম্পতে।
নমো হিরণ্যশৃঙ্গায় নদীনাং পতয়ে নমঃ॥"

এই বলিয়া অনিল বিকম্পিত, তরঙ্গমেখলা বিজড়িত, নীলাম্বু-রত্নাকরকে প্রণাম করিলাম। সমুদ্রসৈকতের বালুকাভূমি অতি বিস্তীর্ণ, কেবল বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। তাহাতে ঝিনুক ও তদ্‌জাতীয় অন্যান্য কত কি মৃত শম্বুকজাতীয়ের শুষ্ক গাত্রাবরণ (খোলা) চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আমরা আনন্দসহকারে কতকগুলি শঙ্খ, শুক্তি, কপর্দ্দক, শম্বুক প্রভৃতি কুড়াইতে লাগিলাম। এমন সময়ে সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ, গর্জ্জন করিতে করিতে দৌড়াইয়া আসিয়া আমার পাদুকা আর্দ্র করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সৈকতপুলিনে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ গর্জ্জন এবং অনাবিল সফেন উর্ম্মিমালার বেলাভূমি চুম্বন দর্শন করিলে আর সে স্থান হইতে আসিতে ইচ্ছা করে না। এখনও যেন সে সুখ স্বপ্নের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিতেছে। বীচিমালা, বায়ু-বিতাড়িত হইয়া কখন মস্তক উন্নত, কখন বা অবনত করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে, যেমনি অগ্রসর হইতেছে, অমনি ফেণময় হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছে। এইরূপ কার্য্যের আর বিরাম নাই, কি দিবা—কি রাত্রি—অষ্ট-প্রহরই তাহার এই ক্রীড়া হইতেছে। তরঙ্গাকুলিত এই অসীম নীল-সলিলোপরি মৎস্যজীবিগণের সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহাদের

ক্ষুদ্র নৌকাগুলি তরঙ্গাবর্ত্তে অদূরে ক্ষণেক অদৃশ্য হইয়া আবার নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। এইরূপে তাহারা নির্ভয়ে মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কতকগুলি বালক ও ইতরশ্রেণীর লোক তথায় দণ্ডায়মান থাকে। সেই ঢেউর মধ্যে একটী আধটী পয়সা ফেলিয়া দিলে, তাহারা তরঙ্গকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সেই ভীষণ ঢেউ হইতে পয়সা তুলিয়া লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাই তাহাদের উপার্জ্জন, আর আমাদের আনন্দলাভ। বেলাভূমিতে এই কাণ্ড, আর দূরে—অতি দূরে—যথায় সিন্ধুবক্ষে অনন্তের ছায়া পড়িয়াছে—যথায় অনন্ত আকাশের সঙ্গে অনন্তবারিধি মিশিয়াছে, সেই চক্রবালের শেষ প্রান্তে যে কি আছে, বা কি হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

সূর্য্যাস্ত।

সমুদ্রের এই সুদূর প্রান্তভাগে সূর্য্যাস্ত একটী দেখিবার জিনিষ। আমরা অদ্য এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিলাম। সে মনোরম দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। তপনদেবের রক্তিমাভ গোলাকার সুবর্ণদেহ যেন নাচিতে নাচিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, অমনি টুপ করিয়া সেই অগাধ নীলসলিলে অবগাহন করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া মনে যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হইল। যে বস্তু কখন দেখি নাই, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই এইরূপ আনন্দ হইয়া থাকে। প্রান্তর মধ্যে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছি বটে—সে যেন একরূপ, আর সিন্ধুগর্ভে সূর্য্যাস্ত এ যেন যথার্থই স্বচক্ষে দেব লীলা দর্শন। সূর্য্যাস্তের পর প্রকৃতিদেবী তিমির বরণ ধারণ করিবেন তজ্জন্য আর বিলম্ব না করিয়া আমরা সমুদ্রকূলে সিকতাপল্লীর দু একখানি বাঙ্গালা দেখিয়া ষ্টেসনের ধার দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মনের আবেগে বাসায় আসিয়া পৌছিলাম। তৎপরে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া ভগবানের আরাত্রিক-ক্রিয়া দর্শন করিবার জন্য মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

সমুদ্রস্নান ও সূর্য্যোদয়।

সমুদ্র স্নান করিবার জন্য পর দিবস অতি প্রত্যূষে যাওয়াই স্থিরীকৃত হইল। কারণ সঙ্গিগণের সকলেরই ইচ্ছা যে স্নানের পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে সূর্য্যোদয় দর্শন করেন। অদ্য সূর্য্যাস্ত দেখিয়া মনে যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছি তদ্রূপ কবির বর্ণনার সেই সাধের সূর্য্যোদয় দেখিব, এই আনন্দে যামিনী-যাপন করিলাম। নিশাবসানে সকলে অতি প্রত্যূষে সমুদ্র স্নানার্থ গমন করিলাম।

সূর্য্যোদয় দর্শন করিবার জন্য অদ্য আমরা আবার সেই মনোহর তরঙ্গায়িত সৈকতে দণ্ডায়মান হইয়া অনন্ত বারিধি দর্শন করিতে লাগিলাম। প্রভাতের স্নিগ্ধ নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে করিতে আনন্দসুখে প্রাণ ভরিয়া গেল। ক্রমে গগনপ্রাঙ্গণ রাঙ্গারঙ্গে রঞ্জিত হইয়া তপনদেবের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিল। তন্মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় রাঙ্গা রশ্মি একটু একটু করিয়া উঁকি মারিতে লাগিলেন। এমন সময় তপনদেব সুবর্ণবর্ণের গোলাকার দেহখানি প্রথমে নীল-সলিলোপরি একটুখানি দেখাইলেন। তৎপরে যেন তিনি লম্ফ দিতে দিতে একাবারে বিমানপথে নীলাম্বু পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িলেন। শেষের লম্ফটী দ্রুততম এবং স্পষ্টরূপে দেখা যাইল। ইহার কারণ এই যে তথায় তির্য্যগ্‌গত-ক্ষিতিজরেখা প্রতীয়মান হয়। অনন্ত জলরাশির সহিত অনন্তাকাশের সঙ্গমস্থলে চক্রবালের উপর সমুদ্রের জল ভিন্ন আর কিছুই নাই। সুতরাং তাহার মধ্যদিয়া স্বচ্ছ বারিধিবক্ষে সূর্য্যোদয় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বৃক্ষাদির অন্তরায় হেতু তেমন পরিলক্ষিত হয় না। বালারুণ কিরণচ্ছটায় পূর্ব্বদিকের রক্তিমাভ নীল-নভোমণ্ডল ক্রমে উজ্জ্বলতর হইল। প্রভাত-মারুত সঞ্চালিত কল্লোলশালী ফেনিল নীলাম্বুর উপর সুবর্ণ

গোলকের প্রতিবিম্ব তরঙ্গে তরঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেমন দেখাইতে লাগিল। নীলবর্ণের সহিত লালবর্ণ মিশিলে যেন মনে হয়, নীলাকাশে সৌদামিনী ক্রীড়া করিতেছেন। সলিলোপরি এই ছায়া তদ্রূপ অপরূপ দেখাইতে লাগিল। বিশ্ববিধাতার এই প্রীতিপদ স্বর্গীয় সুষমা নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমময়ের অনন্ত-প্রেমে ভাসিতে লাগিলাম। তখন সকলেই এককালে বলিয়া উঠিলেন—লীলাময় তোমার অনন্ত-লীলা।

যাহা হউক এইরূপে তপনদেবের উদয় দেখিয়া সমুদ্র স্নানের আয়োজন করিলাম। বালুকাময় বেলাভূমিতে গাত্রাবরণাদি রাখিয়া সকলে তৈলমর্দ্দন করিলাম। তৎপরে সকলে স্নানের জন্য জলে নামিতে না নামিতে এক তরঙ্গাঘাতে সকলে কাত হইয়া পড়িলাম। উপর্য্যুপরি ঊর্ম্মিমালার আবর্ত্তনে আমরা ওলটী পালটী খাইতে লাগিলাম। ঢেউ খাইতে বেশ প্রীতিপদ—কিন্তু সর্ব্ব শরীরে এত অধিক বালুকা সংলিপ্ত হয়, যে, অন্য জলে পুনরায় আর স্নান না করিলে চলে না। লবণাম্বুতে একপ্রকার আটা অনুভূত হয়। তজ্জন্য গাত্র চট্ চট্ করিতে থাকে। লবণাধিক্যবশতঃ জল মুখে করা যায় না। সমুদ্র-স্নান কিন্তু বড় স্বাস্থ্যপ্রদ—

সমুদ্র-স্নানের মন্ত্রঃ।

বেদাদির্য্যো বেদবশিষ্ঠ যোনিঃ সরিৎপতি সাগর রত্নযোনিঃ।
অগ্নিশ্চ তে তেজ ইলা চ তেজো রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্য নাভিঃ॥
ইদন্তে অন্যাভিরস্য মান মত্তির্য্যাঃ কাশ সিন্ধুং প্রবিশন্ত্যাপঃ।
সর্পোজীর্ণামিব ত্বচং জহামি পাপং শরীরাৎ॥

অর্থঃ—হে সমুদ্র তুমি বেদেরও পূর্ব্ব, তোমা হইতেই বেদ ও বশিষ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি সকল নদীর পতি এবং তুমি সর্ব্ব রত্নের স্থান। অগ্নি তোমার তেজ, বিষ্ণু তোমার রেত ধারণ করেন; তুমি অমৃতের

নাভিস্বরূপ। অপরাপর নদ নদীর সহিত তোমার আর কি তুলনা দিব। তৎসমস্তই তোমার গর্ভে আসিয়া পতিত হয়। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমি তোমাতে স্নান করিয়া শরীর হইতে পাপকে পরিত্যাগ করি।

অর্ঘ্যমন্ত্র।

সর্ব্ব রত্নময়ং শ্রীমান্ সর্ব্ব রত্নাকরাকর।
সর্ব্ব রত্ন প্রধানস্ত্বং গৃহাণার্ঘ্যং মহোদধে॥

পঞ্চ রত্ন দ্বারা কেহ বা নারিকেলাদি ফলের দ্বারা সমুদ্রকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তৎপরে প্রণামমন্ত্রে তাঁহার প্রণাম করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর আবাহন করিতে হয়।

আবাহনমন্ত্র।

বিশ্বাচি ত্বং ঘৃতাচি ত্বং বিশ্বযোনে বিশাম্পতে।
সান্নিধ্যং কুরুমে দেব সাগরে লবণাম্ভসি॥

হে দেব! তুমি বিশ্বাচি (বিশ্বব্যাপী) তুমি ঘৃতাচি (যজ্ঞভুক্) তুমি এই বিশ্বের এক মাত্র কারণ, তুমিই বিশ্বপতি (জীবের পতি) তুমি এই লবণসাগরে সন্নিহিত হও।

সমুদ্রজলে স্নান করিয়া সর্ব্ব শরীর বালুকাময় হইয়া গেল সুতরাং তথা হইতে নরেন্দ্রসরোবরে আসিয়া পুনরায় স্নান করিয়া বালুকা ধৌত করিয়া সুস্থ হইলাম।

জগন্নাথ সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ।

উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে মালবদেশে (বর্ত্তমান উজ্জয়িনীতে) ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন পরম বৈষ্ণব রাজা ছিলেন।

ইনি ব্রহ্মা হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ইঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ। এক দিন তিনি সভাপণ্ডিতগণের সহিত মন্দিরে অবস্থিতি কালীন বলিলেন—এরূপ উত্তম ক্ষেত্র কোথায় আছে, যথায় ভগবানকে চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দর্শন করা যায়। তখন বহুতীর্থ ভ্রমণকারী একজন বৃদ্ধ বলিলেন মহারাজ! দক্ষিণ সমুদ্রতীরে নীলাচলোপরি নীলমাধব মূর্ত্তি ও অক্ষয় বট নামে কল্পবৃক্ষ এবং রোহিণী কুণ্ড আছে। সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া নীলমাধবকে দর্শন করিলে জীবের সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। আপনিও তথায় যাইয়া ভগবানের সেই মূর্ত্তি দর্শন করুন। এই কথা বলিয়া সেই বহু তীর্থগামী তপস্বী-ব্রাহ্মণ সর্ব্ব সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। রাজা তৎশ্রবণে চমৎকৃত হইয়া তদ্দর্শনাভিলাষী হইলেন। তখন পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ার্থ যথাবিধানে প্রেরণ করিলেন।

বিদ্যাপতি রথারোহণে গমন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহানদী পার হইয়া দক্ষিণ সাগরতীরে নীলাচল সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাপতি সেই পর্ব্বতে আরোহণান্তর চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়াও দেব সমীপে যাইবার কোন পথ প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে অরণ্য মধ্যে বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সেই দিকে গমন করিয়া কতকগুলি শবরালয় দেখিতে পাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিশ্বাবসু নামধারী এক জন বৃদ্ধ শবর, ভগবানের পূজা সমাপন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালীন বিদ্যাপতিকে দেখিতে পাইলেন। বিজন অরণ্যে ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিশ্বাবসু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে বিপ্র! তুমি কোথা হইতে কি কারণে এখানে অসিয়া উপস্থিত হইয়াছ? বিদ্যাপতি শবরকে যথাযথ বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন শবর বিশ্বাবসু বিদ্যাপতিকে পাদ্যার্ঘ্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বিদ্যাপতি বলিলেন যতক্ষণ আমি নীলমাধব

হরিকে দর্শন না করিব ততক্ষণ আমি কিছুই আহার করিব না। ইহা শুনিয়া তাঁহাকে সেই দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকারময় পথে লইয়া চলিলেন। বিদ্যাপতি বহুকষ্টে তথায় উপনীত হইয়া রোহিণী কুণ্ডে অবগাহন করিলেন। তৎপরে নীলমাধবকে দর্শন করিতে করিতে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন তিনি শবরালয়ে আসিয়া তৎ-প্রদত্ত ভোগান্ন ভোজন করিলেন। এইরূপে শবরপতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া রাজার জন্য নির্মাল্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কেহ কেহ বলেন বিশ্বাবসু বিদ্যাপতিকে প্রথমে দেবদর্শন করান নাই। শেষে তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিয়া নিজ দুহিতা ললিতার সহিত বিবাহ দেন। তাহার পর ললিতার যত্নে শবরের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্যাপতির দেবদর্শন ঘটিয়াছিল। শবরপতি জামাতার চক্ষে বস্ত্র বান্ধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু চতুরা ললিতা স্বামীর নিকট একথলি সর্ষপ দিয়াছিলেন। সেই সর্ষপ চিহ্নিত পথ দিয়া পরদিবস একাকী তথায় গমন করিয়া নীলমাধবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই সময় একটী কাক তথায় পতিত হইয়া যেমনি বিনষ্ট হইল অমনি চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিল। ব্রাহ্মণ এই অলৌকিক ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন; এবং মরণেচ্ছায় বৃক্ষে উঠিয়া যেমনি পড়িতে যাইবেন, অমনি সেই সময় দৈববাণী হইল, হে বিপ্র! নিবৃত্ত হও; অগ্রে ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই সংবাদ প্রদান কর তৎপরে মুক্তি কামনা করিও। ব্রাহ্মণ দৈববাণী শুনিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শবর-দুহিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। এবং তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট যথাযথ বর্ণনা করিলেন।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তৎশ্রবণে বলিলেন, হে বিপ্র, আমি এরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রজাগণের সহিত সেই ক্ষেত্রে বাস

করিব; এবং প্রত্যহ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিব। ইত্যবসরে নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাদ্যার্ঘ্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া নৃপতি এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তদনন্তর রাজা জ্যৈষ্ঠ শুক্ল সপ্তমীর পুষ্যানক্ষত্রে শুক্রবারে শুভলগ্নে শুভক্ষণে চতুরঙ্গ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া নারদ সহ তথায় যাত্রা করিলেন। রাজমহিষী ও পুরনারীগণ রথারোহণে রাজার অনুগমন করিলেন।

ক্রমে বহু নদ নদী পর্ব্বত অরণ্যাদি অতিক্রম করিয়া উৎকল প্রদেশের সীমান্তে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাপতি প্রদর্শিত পথে যাইতে যাইতে নীল পয়োধি তটস্থ নীলাচল সমীপে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর বিদ্যাপতি, রাজাকে নীলমাধব দর্শন করাইবার নিমিত্ত গমন করিয়া দেখেন, যে নীলমাধব ও রোহিণী কুণ্ড তথায় নাই। বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক লুকায়িত হইয়াছে অনুমান করিয়া, রাজা তাহাকে ধৃত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল যে, অগ্রে নীলাচলোপরি আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠা কর, তৎপরে তুমি আমার দর্শন পাইবে।

তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মহা-সমারোহে সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞারম্ভের ষষ্ঠ রাত্রিতে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটী নয়নাভিরাম রক্তবর্ণ তরু শ্বেত দ্বীপ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। তাহাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম চিহ্ন আছে; তদুপরি ভগবান্ নীল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত। দক্ষিণপার্শ্বে অনন্তদেব ও মধ্যস্থলে লক্ষ্মী মূর্ত্তি দেখিলেন। দেবর্ষি নারদ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন হে রাজন্! দশ দিবস মধ্যে ইহার প্রত্যক্ষ ফল পাইবে।

যজ্ঞ সমাপনকালে যাজ্ঞিকগণ উচ্চৈঃস্বরে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে-ছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে এক মহা-বৃক্ষ ভাসিয়া আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন রাজন্, এই বার

স্বপ্নবৃত্তান্ত সত্য হইল। ঐ মহাবৃক্ষ ভগবানের সাক্ষাৎ বপু জানিবে এবং ঐ কাষ্ঠে স্বপ্নের মত মূর্ত্তি-চতুষ্টয় নির্ম্মাণ কর। তখন রাজা মহাসমারোহে সমুদ্রতীর হইতে সেই বৃক্ষ আনয়ন করিয়া রত্নবেদীর উপর রাখিলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল যে "সম্মুখস্থ যন্ত্রধারী ঐ বৃদ্ধ পুরুষ দ্বারা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাও" নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন ইহা কেহ দর্শন না করে। ইহা শুনিয়া রাজা সেই ছদ্মবেশী বৃদ্ধ (বিশ্বকর্ম্মা)কে মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে রাজা স্বপ্নে যেরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া ছিলেন, ঠিক্ সেইরূপ সুন্দর মূর্ত্তিচতুষ্টয় দিব্য রত্নময় সিংহাসনে বিরাজিত দেখিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে এক বিংশতি দিবস দ্বার রুদ্ধ রাখিবার আদেশ থাকে; কিন্তু পঞ্চদশ দিবসের দিন ইন্দ্রদ্যুম্নের পট্টমহিষী গুণ্ডিচাদেবী দেবদর্শনের জন্য কাতর হওয়ায়, মন্ত্রীকে দ্বার উদ্ঘাটন করিতে বলেন, কিন্তু মন্ত্রী সত্যলঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিলেন। শেষে তিনজনে মন্দির-দ্বারে উপনীত হইয়া কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না; তখন রাজা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন যে, হস্তপদ বিহীন মূর্ত্তিত্রয় এবং একখণ্ড লম্বা কাষ্ঠ বিরাজ করিতেছে। দ্বারোদ্ঘাটন হইলে বৃদ্ধ সূত্রধর কোথায় অন্তর্ধান হইলেন। সেই সময় আকাশ বাণী হইল যে, এই মূর্ত্তিই জগন্নাথ বলিয়া জানিবে এবং সত্বর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ইহাঁর প্রতিষ্ঠা কর।

অনন্তর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভগবানের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধি তাহার গর্ভপ্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে নারদের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। যখন তাঁহারা তথায় গমন করিলেন তখন ব্রহ্মা সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ছিলেন। এজন্য তাঁহারা কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিলেন। কাহারও কাহারও মতে সেই সময় ব্রহ্মা ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। যাহা

হউক তৎপরে ব্রহ্মা, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও নারদকে সংবর্দ্ধনাপূর্ব্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন করযোড়ে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন তোমরা পদ্মনিধি ব্রহ্মর্ষিগণ ও ইন্দ্রাদি দশদিকপালের সহিত তথায় গমন কর আমি পরে যাইতেছি। কারণ এক্ষণে দ্বিতীয় মনুর কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা তুমি অবগত হইতে পার নাই। মানব পরিমাণে নয় যুগকাল অতিবাহিত হইল। এতাবৎকাল পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ রাজা রাজত্ব করিয়া গতাসু হইয়াছে। তৎকৃত দেবালয় ও রাজপ্রাসাদ বালুকায় আবৃত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার রাজ্য নাই বংশও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদ ও ইন্দ্রাদি দেবগণসহ মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অনেক অনুসন্ধানে দেবমন্দির প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় গালে নামক রাজা রাজত্ব করিতে ছিলেন। দেবালয় তাঁহার বলিয়া তিনি আপত্তি করিলেন। শেষে ভূষণ্ডিকাক সাক্ষ্য দিলেন যে এই মন্দির রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। অনন্তর রাজা বহু অনুসন্ধান করিয়া বিগ্রহমূর্ত্তি বাহির করিলেন। তখন ব্রহ্মা আসিয়া দেবতা ও মন্দির যথানিয়মে প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পর রথযাত্রা ও অন্যান্য উৎসব সমূহের বিধি ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তদবধি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক এই মন্দির এবং বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক এই জগন্নাথ অদ্যাবধি পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

বৌদ্ধমত।

কেহ কেহ বলেন জগন্নাথ বুদ্ধ অবতার। তৃতীয় শতাব্দীতে রাজা ব্রহ্মদত্ত, তৎপুত্র কাশী, এবং প্রপৌত্র সুনন্দের রাজত্বকালে উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয়। সেই সময় বৌদ্ধগণ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত করিয়া উপাসনা করিতেন।

এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথানুসারে পূর্ব্বমুখে এই মূর্ত্তিত্রয় বসান হয়। বুদ্ধদেবের দেহাবসানে শিষ্যগণ তাঁহার দন্ত, অস্থি, নখ ও কেশ রাখিয়া দিয়াছিলেন। সিংহলে এখনও বুদ্ধদেবের দন্ত লইয়া এক দন্তোৎসব পর্ব্ব মহাসমারোহে প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধদেবের এই অস্থিই জগন্নাথদেবের উদরে রক্ষা করা হইয়াছে। হিন্দুগণ বলেন যে জগন্নাথ দেবের উদরে বিষ্ণু-পঞ্জর আছে; কিন্তু এই কথা কতদূর সত্য তাহা দেখুন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকর্ত্তৃক নিহত হইলে, অর্জ্জুন তাঁহার সৎকার করেন। তাঁহার পঞ্জর বা কেশ অর্জ্জুন রাখিয়া দেন নাই, সমস্তই ভস্মীভূত হয়। তাহা হইলেই এই অস্থি বুদ্ধদেবের ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না।

৩৯৬ শকাব্দে যযাতি কেশরী উৎকলের রাজদণ্ড ধারণ করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিশিষ্ট রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিলেও বৌদ্ধগণ তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার বশতাপন্ন হইতে লাগিল। তখন তিনি তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজার জন্য তাহাদিগকে অধিকার দিলেন। অধিকন্তু তিনি ঘোষণা করিলেন যে, বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার। সুতরাং ইহা হিন্দুমাত্রেরই পূজা করা কর্ত্তব্য। পূজাপদ্ধতি সমস্তই বৌদ্ধ মতানুসারে হইবার আদেশ দিলেন; এবং উৎকল ব্রাহ্মণদিগকে পাচক ও পূজকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বৌদ্ধগণের সহিত একতা স্থাপন করিয়াদিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উদার নীতি অবলম্বনে জাতিভেদ উঠিয়া গেল; সকলে একত্রে ভোজন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বৌদ্ধগণ আরও হৃষ্টচিত্ত হইয়া হিন্দুগণের সহিত মিশিতে লাগিল। যখন উৎকলে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের বেশ মনের মিলন হইল, তখন বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্গ এই মূর্ত্তিত্রয়ের নামের পরিবর্ত্তে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইল। তৎপরে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্ধান হইল।

এই দেবতা গুলি একবারে হিন্দুগণেরই করায়ত্ত হইল। তখন বৌদ্ধ-দিগের অস্তিত্ব লোপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বলিয়া মান্দলা পঞ্জিকাতে লিপিবদ্ধ করা হইল। এবং ইহা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠিত করেন এই বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। ক্রমে ক্রমে যত পুরাতন হইতে লাগিল ততই মনুষ্যের আর কোন কিছু বলিবার বা তর্ক করিবার কিছুই রহিল না। এক্ষণে সেই পূর্ব্ব রীতি অনুসারে ইহা হিন্দুদিগের দেবতা বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন।

কিন্তু একটু বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত জগন্নাথ দেবের কিছুই মিল নাই। সেই মুরলী নাই; চরণ ও নূপুর নাই, সেই সুঠাম বঙ্কিম নব জলধর তনু নাই, বামে শ্রীরাধিকা নাই। তৎপরে হিন্দুদিগের যেমন দক্ষিণ বা পশ্চিম মুখে দেবতা রাখা হয়, ইহা তাহার বিপরীত; সুতরাং ইনি যে বৌদ্ধদিগের দেবতা তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তাহার প্রধান কারণ এইস্থানে জাতিভেদ নাই। যাহা হউক ইনি বুদ্ধ অবতারই হউন, আর শ্রীকৃষ্ণ দেবই হউন, সেই ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া প্রণাম কর। জগন্নাথ সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন পরবর্ত্তী বর্ণনাই অতি উত্তম। একবার তাহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করুন।

জগন্নাথ সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস।

(জনৈক সাধু বর্ণিত।)

সন ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে একদিন হরিদ্বারের কোন একজন শাস্ত্রজ্ঞ সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রভু! আপনি বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় হরিদ্বারের মত প্রীতিপ্রদ আর কোন তীর্থ নাই। এতদুত্তরে তিনি বলিলেন; সকল তীর্থই সমান ও সর্ব্বস্থানেই দেবতার মূর্ত্তি আছে।

মনুষ্যের হৃদয়ে প্রীতি ও ভক্তি আনয়ন করিবার নিমিত্তই, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই সকল দেবতা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, এক একটী তীর্থ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে—শ্রীক্ষেত্রে কিছু বিশেষত্ব আছে। তজ্জন্য শ্রীক্ষেত্রই শ্রেষ্ঠ এবং ইহাতে অনেক বিষয় বুঝিবার আছে—জন সাধারণ তাহা জানে না। ইহার প্রকৃত তথ্য যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে প্রশ্ন করিও।

তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—"দেখ, অবোধ শিশু, যে কখন সিংহ কি হস্তী দেখে নাই, সে যদি জিজ্ঞাসা করে, বাবা সিংহ কিরূপ ? তখন তাহাকে সেই সিংহের আকৃতি আঁকিয়া দেখাইলে কিংবা একটা মাটীর সিংহ আনিয়া দিলেও বুঝিতে পারে যে, সিংহ এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট জন্তু। তদ্রূপ অবোধ মানবগণকে আমাদের এই জটিল হিন্দু-শাস্ত্র ও ভগবান কি, তাহা সহজে বুঝাইবার নিমিত্তই এই শ্রীক্ষেত্রধাম নির্ম্মিত হইয়াছে। উজ্জয়িনীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অর্থ সাহায্যে কোন সাধু কর্ত্তৃক এই পুরীধাম ঠিক শাস্ত্রানুসারে সাজাইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এবং ইহা কত সুন্দর তাহা একবার পাঠক মহাশয়গণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

পূর্ব্বে যখন রেলপথ হয় নাই তখন সকলকেই হাঁটা পথে প্রথমে ১৮ নালা পার হইয়া যাইতে হইত। যখন চৈতন্যদেব এইস্থানে আগমন করেন, তখন ইহার উপর সেতু ছিল না। তিনি এইস্থানে আসিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন কিরূপে ইহা পার হইব ? এই ১৮টী নালাই আমাদের অষ্টাদশ পুরাণ। পুরাণে বার, ব্রত উপবাস প্রভৃতি করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহার কারণ এই যে, অল্প অল্প করিয়া এই সকল বারব্রত দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিলে ধর্ম্মে মতি হইবে এবং উপবাসাদি অভ্যাস থাকিলে ক্রমে সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

নচেৎ একেবারে অনভ্যস্ত দেহ লইয়া সাধন কার্য্য করিলে অসুস্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সুতরাং অভ্যাস চাই। এই অষ্টাদশ নালা পার হইলে, তবে বড় রাস্তায় উঠিতে পরিবে। তদ্রূপ আমাদের এই অষ্টাদশ পুরাণের লিখিত বারব্রতাদি করিলে তবে সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। নালায় কি থাকে? না—পঙ্ক; পার হইবার সময় এই পাঁক আমাদের গাত্রে লাগে। তখন ইহা ধৌত করা প্রয়োজন; ধৌত করিলে কি হইবে? না—চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হইবে। এই পঙ্ক ধৌত করিবার জন্যই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর রহিয়াছে। পূর্ব্বে যাত্রীগণ আঠার নালা পার হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান ও তর্পণাদি করিয়া তবে জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন। তদ্রূপ আমাদের অষ্টাদশ পুরাণের পঙ্কিল কার্য্যগুলি করিয়া, পঙ্ক ধৌত করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়াদি দমনরূপ সরোবরে স্নান করিতে হয়। নচেৎ সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সরোবরে স্নান করিলে চিত্ত যেমন প্রফুল্ল হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় দমন করিলে চিত্তে আপনা আপনিই প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে।

তৎপরে সাধন পথে যতই অগ্রসর হইবে ততই ভগবানের স্বরূপ দেখিতে পাইবে। এদিকে মন্দিরে যাইবার জন্য (Pilgrimage Road) বড়রাস্তা দিয়া যতই যাইতে থাকিবে, ততই মন্দিরটী দেখিতে পাইবে। এই প্রকাণ্ড রাস্তাটীর সহিত সাধনমার্গের তুলনা করা হইয়াছে। আঠার নালা, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এবং এই (Pilgrimage) রাস্তাতে, এই তিন স্থানে, কি জগন্নাথ বসিয়া আছেন? না—তাহা নাই। কিন্তু এগুলি না পার হইলে জগন্নাথের নিকট যাইবার উপায় নাই। তদ্রূপ বার ব্রত তপস্যা বা সাধনভজন না করিলে ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। রাস্তা পার হইয়া ক্রমে মন্দিরে উপস্থিত হইলে—এখনও কিন্তু জগন্নাথের দর্শন পাইলে না! মন্দিরের ভিতরে না প্রবেশ করিলে প্রভুর সাক্ষাৎ পাইবে না। এই মন্দিরের সঙ্গে এই জগৎসংসারের তুলনা করা

হইয়াছে। তদ্রূপ এই জগতের উপরে ভগবান নাই, ইহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। মন্দিরের উপরে কি দেখিবে, না—কতকগুলি অশ্লীল ছবি, কতকগুলি অবতার ও কতকগুলি সাধুর মূর্ত্তি। তদ্রূপ এই সংসারে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে তথায় কি দেখিবে? কেবল সৃষ্টির কার্য্য। সৃষ্টি—স্ত্রী পুরুষের সংযোগ না হইলে হয় না, তজ্জন্য মন্দিরগাত্রে স্ত্রীপুরুষের সংযোগ ছবি, আর এই সংসারে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়—তাই মন্দিরগাত্রে সাধু সন্ন্যাসীর ছবিরও অভাব নাই। তৎপরে এই পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে তিনি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্য মন্দিরগাত্রে বামন, নরসিংহ ইত্যাদি অবতারের মূর্ত্তিও রহিয়াছে। মন্দিরের বহির্ভাগে যখন ভগবান পাইলে না, তখন ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিবে—অতুলনীয় সুন্দর মূর্ত্তি। এই জগতের সহিত যেমন মন্দিরের তুলনা করা যায়, তদ্রূপ আবার এই দেহের সহিতও তুলনা করা যায়।

যাহা হউক মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া কি দেখিলে? না—জগন্নাথ দেবের নীলাভ বিশাল বদন, তাহাতে বড় বড় গোলাকার দুই চক্ষু, তাঁহার কর্ণ নাই, বাহু মাত্র আছে—তাহাতে অঙ্গুলি নাই। আর প্রকাণ্ড উদর, চরণ আদৌ দেখা গেল না। অপিচ ভগবানের সৃষ্ট কোন পদার্থ বা প্রাণীর সহিত ইঁহার তুলনা দিতে পারিবে না। ইহার অর্থ কি? এই অনন্ত নীলাকাশের সহিত তাঁহার বিশাল বদনের তুলনা করা হইয়াছে। চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ বড় বড় গোলাকার দুই চক্ষুর দ্বারা সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন। তাঁহার কর্ণ নাই। কর্ণ থাকিলে, পাছে পাপীর করুণ ক্রন্দন শ্রবণ করিতে হয়। আর তাঁহার হস্তের বাহুমাত্র আছে অঙ্গুলি নাই। ইহার অর্থ কি? না—কার্য্য করে অঙ্গুলি, বাহু অঙ্গুলির প্রয়োজক মাত্র, তদ্রূপ তিনি নিষ্ক্রিয়; তিনি মনুষ্যকে কার্য্য করিতে বলিতেছেন, মনুষ্য নিজে কার্য্য করে। যেমন কার্য্য করিবে তদ্রূপ ফল ভোগ

করিবে, ইহাতে তাঁহার কোন হাত নাই। তিনি যেন বাহু দেখাইয়া বলিতেছেন, বাপু পুণ্য কর্ম্ম কর—পুণ্যের ফল পাইবে, পাপকর্ম্ম কর—পাপের প্রতিফল পাইবে, আমার কোন হাত নাই। তাহার পর ঐ যে প্রকাণ্ড উদর, ওটী ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ঐ উদরের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আর, তাঁহার চরণ পাতালে, কি রসাতলে, কি তলাতলে, কোথায় আছে, তাহা বহু তপস্যাতেও দেখিবার উপায় নাই। কারণ চরণ পাইলে ত সকলে উদ্ধার হইয়া যাইবে, তজ্জন্য তিনি চরণ দুই খানি লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

জগন্নাথ দর্শন করিলে কি হয়? না—চিত্ত আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। তাঁহার নিকট আর জাতি ভেদ নাই, মনে কোনরূপ দ্বিধা নাই, তাই—মন্দিরে তাঁহার আনন্দ বাজার, তথায় কোনরূপ জাতিভেদ নাই। উচ্ছিষ্ট খাইতে মনে কোনরূপ দ্বিধা নাই। তৎপরে ভগবান কোথায় থাকেন? না—ভব সমুদ্র পারে; তাই সমুদ্র তীরে তাঁহার এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

অবোধ হিন্দু নরনারীকে সহজে ভগবানের স্বরূপ বুঝাইবার নিমিত্ত সাধু মহাশয় আমার নিকট জগন্নাথদেব সম্বন্ধে যেরূপ সুন্দর আধ্যাত্মিক বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বড়ই প্রীতিপ্রদ ও মনের সহিত মিল হইয়াছিল। এক্ষণে পাঠক মহোদয়গণকে উপহার দিলাম, ভাল মন্দের বিচার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত রহিল।

কালাপাহাড়।

মুসলমানের রাজত্বকালে অনেক হিন্দু প্রাণভয়ে মুসলমান হইত। রাজু নামক কোন ব্রাহ্মণ-কুমারকে মুসলমান হইতে হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ কুমার মনের দুঃখে দেবদ্বেষী হইলেন। রাজুর বিখ্যাত নাম কালাপাহাড়। বঙ্গদেশে যখন সোলেমান রাজত্ব করেন, তখন

উড়িষ্যায় মুকুন্দদেব নামক একজন হিন্দুরাজা ছিলেন। কালাপাহাড়ই সোলেমানের প্রধান সেনাপতি ও জামাতা ছিলেন। কালাপাহাড় যাজপুরের নিকট রাজা মুকুন্দদেবকে সমরে হত্যা করেন। তদনন্তর কালাপাহাড় দেবমূর্ত্তি সকল ভঙ্গ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ভারতের নানাস্থানে নানা তীর্থের দেবদেবীর মূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি জগন্নাথদেবের নিকট অব্যাহতি পান নাই।

কালাপাহাড় আসিতেছে শুনিয়া পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি চিল্কা হ্রদের তীরে পারিকুদ নামক স্থানে বালুকা মধ্যে লুক্কাইত রাখেন। দুর্ব্বৃত্ত কালাপাহাড় অনেক অনুসন্ধানে এই সংবাদ অবগত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি উত্তোলন করিল এবং হস্তী পৃষ্ঠে চাপাইয়া গঙ্গাতীরে আনয়ন পূর্ব্বক দাহ করিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় উক্ত পাষণ্ডের দেহ হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্খলিত হইতে লাগিল ও মূহূর্ত্ত মধ্যে পাষণ্ডের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।* যখন কালাপাহাড় শ্রীমূর্ত্তিকে বঙ্গদেশের গঙ্গা তীরে আনয়ন করে, তখন বেশর মহান্তি ছদ্মবেশে তাহার অনুসরণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন এবং জগন্নাথ দেবের সেই অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তি লইয়া অন্তর্হিত হন। তৎপরে কোন নিভৃত স্থানে, তাহা হইতে ব্রহ্ম-প্রদত্ত "ব্রহ্মমণি" বাহির করিয়া কুজং দুর্গাধিপতি খাণ্ডায়তের নিকট অতি যত্নে লুক্কাইত রাখেন। এইরূপে বিংশতি বৎসর কাল শ্রীমন্দির শ্রীমূর্ত্তি শূন্য থাকে; শেষে খুড়দার রাজা রামচন্দ্র দেবের সময় কুজং হইতে উক্ত "ব্রহ্মমণি" আনীত হয়। তৎপরে নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা নবমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

---

* কেহ কেহ বলেন যে কাশীতে জ্বররোগে কালাপাহাড়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

কনারকের সূর্য্যমন্দির। (১০১ পৃঃ।)

Printed by K. V. Seyne & Bros.
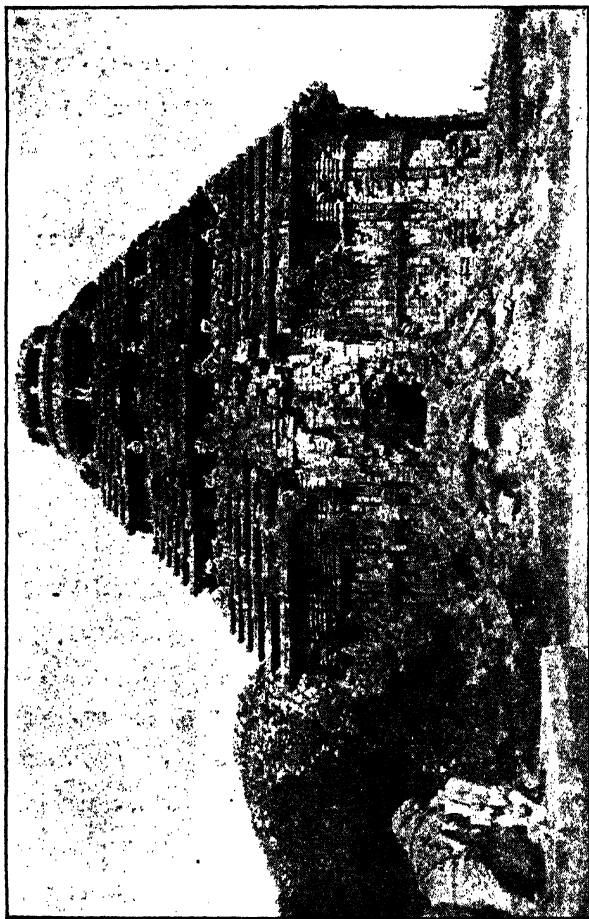
কোনার্ক বা কানারক্।

পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে চন্দ্রভাগা নদীতীরে সমুদ্রকূলে সূর্য্যদেবের এই সুন্দর মন্দির বিরাজিত। পূর্ব্বে এই মন্দিরের কারুকার্য্য অতীব আশ্চর্য্যজনক ছিল। এক্ষণে প্রায় অনেক স্থান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে কানারক কহিয়া থাকে। শাম্বপুরাণে এই স্থান মৈত্রবন নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম পদ্মক্ষেত্র। বড় দুঃখের বিষয় এই স্থানের নাম অনেকে জানে না। ইহার কারণ সূর্য্যদেবের এই কৃষ্ণমন্দির (Black Pagoda) অনেক দূরে দুর্গমপথে অজানিত অবস্থায় অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

শ্রীপঞ্চমী পূজার পর সপ্তমী-তিথিতে এই স্থানে একটী মেলা হইয়া থাকে। তজ্জন্য সেই সময় তথায় বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে, অন্য সময় যাত্রী আদৌ হয় না। এই কারণে অনেকের অদৃষ্টে কনারক দর্শন ঘটে না। আমরা যতবার শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছি, ততবার বহু চেষ্টাতেও এই স্থান দর্শন ঘটে নাই। শেষে এইবার পাণ্ডাকে অনেক অনুরোধ করায় যাইতে স্বীকৃত হইল। প্রথমে নানা ভয় দেখাইতে লাগিল, দুর্গম বালুকাময় পথের বিষয় উল্লেখ করা হইল, দস্যুতস্করাদির কথাও কহিল, কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা, সুতরাং অগত্যা সম্মত হইল। এখানে দিবাভাগে গাড়ী চলিতে পারে না, কারণ প্রায় সমস্ত পথই বালুকাময়। সূর্য্যকিরণে বালুকণা এরূপ উত্তপ্ত হয় যে কিছুতেই গরু চলিতে পারে না। তজ্জন্য রাত্রিতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এই দুর্গম পথে যাইতে হয়। আমরা সমস্ত রাত্রি গো-শকটে গমন করিয়া পরদিবস প্রভাতেই পৌঁছিলাম। তথায় সূর্য্যদেবের প্রকাণ্ড মন্দির দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। অনেক স্থান একবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সংস্কার অভাবে চতুর্দ্দিকে প্রস্তর সকল স্তূপাকৃতি হইয়া রহিয়াছে। এরূপ হইবার কারণ এই যে কোনার্কের মন্দিরচূড়ায় চুম্বক প্রস্তর ছিল। এই

প্রস্তরের আকর্ষণগুণে অনেক জাহাজ সমুদ্রে নষ্ট হইত। তজ্জন্য ইংরাজগণ বহু অনুসন্ধানে স্থির করেন যে মন্দিরের চূড়াই অনিষ্ঠের কারণ। সেই হেতু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট চূড়া ও মন্দিরের অনেকস্থান ভগ্ন করিয়া দেন। এখানকার অনেক প্রস্তর ফলক ও মূর্ত্তি কলিকাতায় আনয়ন করিয়া গভর্ণমেণ্ট যাদুঘরে রাখিয়া দিয়াছেন।

কোনার্কের উৎপত্তি।

বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞানাম্নী দুহিতার সহিত সূর্য্যদেবের পরিণয় হয়। তাহাতে তিনটী সন্তান জন্মে। প্রথম মনু, দ্বিতীয় যম, তৃতীয় যমুনা। সংজ্ঞাদেবী সূর্য্যদেবের অসাধারণ তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় অনুরূপ রূপবিশিষ্টা ছায়ানাম্নী এক রমণীকে নিজের পরিবর্ত্তে স্বামী সেবায় রাখিয়া তপস্যার্থ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। সূর্য্যদেব এ রহস্য কিছুই অবগত হইলেন না। ক্রমে ছায়ার গর্ভে, শনি ও সাবনি নামক দুই পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। এতাবৎকাল ছায়া ও সংজ্ঞার রহস্য কেহই অবগত হইতে পারেন নাই। একদিন ছায়া কোন কারণ বশতঃ যমকে অভিসম্পাত করাতে সূর্য্যদেব ও যম উভয়ে বুঝিতে পারিলেন যে এ রমণী কখনও যমজননী নহে। ক্রমশঃ সকল রহস্য প্রকাশ পাইল। তখন সূর্য্যদেব সমাধিযোগে অবগত হইলেন যে সংজ্ঞা অশ্বিনীরূপে অরণ্যে তপস্যা করিতেছে। তখন তিনিও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অশ্বিনীরূপধারিণী সংজ্ঞার সমীপে উপনীত হইলেন। অশ্ব ও অশ্বিনীরূপে অবস্থিতি কালে ইহাঁদের আর ৩টী পুত্র জন্মিল। ১ম যুগল-অশ্বিনীকুমার, আর একটীর নাম রেবন্ত। তৎপরে সূর্য্যদেব পুনরায় সংজ্ঞাকে স্বস্থানে আনয়ন করিলে, বিশ্বকর্ম্মা ভ্রমিযন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যদেবের তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন। ইহার কিয়দংশ দৈবাৎ চন্দ্রভাগা নদীতে পতিত হইয়াছিল। সেই তপনতেজাংশ, শাম্বদেব তপস্যা-কালীন চন্দ্রভাগা হইতে প্রস্তরময় বিগ্রহ মূর্ত্তিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শাম্ব উপাখ্যান।

জাম্ববতীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের শাম্ব নামে এক পুত্র জন্মে, তিনি কন্দর্প-সদৃশ রূপবান ছিলেন। রূপ-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তিনি কাহারও সম্মান রক্ষা করিতেন না। এই কারণে নারদঋষি শাম্বকে শাস্তি দিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন মহাশয়, আপনার ষোড়শ শত বনিতাদিগের সহিত শাম্বের যেরূপ ঘনিষ্টতা তাহাতে সহজেই মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় আমি একদিন আপনাকে স্বচক্ষে দর্শন করাইব।

কিয়ৎদিবস পরে শ্রীকৃষ্ণ রৈবতক পর্ব্বতে মৃগয়ার্থ গমন করিলে নারদ শাম্বকে বলিলেন, তোমার পিতা রৈবতক পর্ব্বতে গিয়াছেন সেখানে তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। তদনুসারে শাম্ব তথায় গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার যোলশত বিমাতা মদিরাপানে মত্ত হইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন। শাম্বের রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইলেন। সেই সময় নারদ শ্রীকৃষ্ণকে আনাইয়া সমস্ত দেখাইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া শাম্বকে অভিসম্পাত করিলেন যে তোমার রূপলাবণ্য নষ্ট হইয়া কুষ্ঠব্যাধিতে পরিণত হউক। পুত্রের করুণ অভি-যোগে নারদের সমস্ত চাতুরি প্রমাণিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ শাপ-খণ্ডনের নিমিত্ত নারদের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন, যে, তুমি মৈত্র বনে যাইয়া সূর্য্যের আরাধনা কর, তাহা হইলে তুমি কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

তদনুসারে শাম্ব মৈত্রবনে চন্দ্রভাগা নদীতীরে উপনীত হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়া সূর্য্যদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন। সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্ত করিলেন; এবং বলিলেন তুমি চন্দ্রভাগাতে স্নান করিলে দিব্যকান্তি লাভ করিবে, এই বলিয়া তিনি

প্রস্থান করিলেন। তখন শাম্ব স্নানান্তে দেখিলেন যে, তাঁহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাবণ্যবিশিষ্ট হইয়াছে; এবং স্নান করিয়া উঠিবার সময় এক প্রস্তরময় সূর্য্যদেবের বিগ্রহ পাইলেন। বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যতেজ-প্রশমন করিলে যে তেজ চন্দ্রভাগাতে পতিত হইয়াছিল, সেই তেজে এই বিগ্রহ হইয়াছিল। এক্ষণে শাম্ব সেই বিগ্রহ মূর্ত্তি লইয়া তথায় দিব্য মন্দির প্রস্তুত করাইয়া মহানন্দে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তদবধি কোনার্কে এই মন্দির ও বিগ্রহ শোভা পাইতেছে। কালের গতিতে সেই মন্দির এখন ধ্বংসপ্রায়, বিগ্রহ লুক্কায়িত। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট মন্দির সংরক্ষণে একটু দৃষ্টি রাখিতেছেন এবং এখানে রেল হইবারও প্রস্তাব হইতেছে! আমরা এই মন্দির দর্শন করিয়া বৈকালে রওনা হইয়া পুনরায় প্রভাতে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলাম।

শ্রীক্ষেত্রে সমস্তদিন থাকিয়া সন্ধ্যার সময় পাণ্ডার নিকট সুফল লইলাম। পরদিন প্রভাতে যাত্রা করিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শন করিব, এইজন্য রাত্রিতে একখানা গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিলাম। সেই রাত্রে জগন্নাথদেবের শেষ এক বার মুখচন্দ্রমা দর্শন করিয়া এবং প্রণাম ও বিদায় গ্রহনান্তর বাসায় আসিয়া শুইয়া রহিলাম। নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে গাড়োয়ান আসিয়া আমাদিগকে লইয়া ষ্টেসনে পৌছাইয়া দিল। আমরা সাক্ষীগোপালের টিকেট কিনিয়া গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। যথা সময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ষ্টেসন হইতে গাড়ী চলিতে চলিতে যতক্ষণ শ্রীমন্দির দেখা যাইতে লাগিল ততক্ষণ আমরা দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলাম।

উৎকলবাসীর আচার ব্যবহার।

উড়িয়াদের সকলেই দেখিয়াছেন সুতরাং ইহাদের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কলিকাতায় গঙ্গার ঘাটে উড়িয়া ব্রাহ্মণদের দেখিয়াছেন।

ইহারা ব্রাহ্মণজাতীয়, এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রজাতি আছে। ইহাদের ভাষা উড়িয়া, অক্ষরগুলি গোলাকৃতি। উড়িয়াদের পুরুষগণ কম বহরের মোটা ও ময়লা বস্ত্র পরিধান করে। প্রায় ভিক্ষাই ইহাদের ব্যবসা, বিদ্বান খুব কম দেখা যায়। ইংরাজী পাঠ করিলে পাছে জাতি নষ্ট হয় এই বিশ্বাসে ইহারা মূর্খ হইয়া আছে, ইংরাজী আদৌ শিখিতে চায় না। কেহ কেহ কিছু সংস্কৃত ও উড়িয়াভাষা শিক্ষা করে। আজ কাল অল্প সংখ্যক ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের যত্নে অনেক উড়িয়া মানুষ হইয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহারা মনুষ্যপদবাচ্য হইবে।

ইহাদের স্ত্রীলোকেরা এমনি গহনাপ্রিয় যে, কাঁসার খাড়ু, মল প্রভৃতি সামান্য আভরণ পরিয়া থাকে। খাড়ুগুলি ওজনে প্রায় একসের হইবে। গরুর স্কন্ধে যেমন দাগ হয় সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের হস্তপদে গহনাপরার দাগ হইয়া থাকে। কেহ কেহ একপায়ে মল ব্যবহার করিয়া থাকে। কর্ণে এক প্রকার এমনি গোলাকার রৌপ্য-অলঙ্কার পরিয়া থাকে যে সেগুলির ভারে প্রায়ই কর্ণের ছিদ্র কাটিয়া যায়। ইহারা ১৪ হাত সাড়ী পরিধান করিয়া থাকে। তথাপি ইহারা এমনই অসভ্য যে জানুর উপরিভাগের অধিকাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার মহারাষ্ট্রীয় রমণীর মত কাছা দেয়।

শূদ্রজাতির মধ্যে বিধবা হইলে ইহাদের পুনরায় দেবরের সহিত* বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন দোষ হয় না ও সমাজ চলিত।

* "ন দোষো মগধে মদ্যে অন্নযোন্যোঃ কলিঙ্গজে
ওড়ে ভ্রাতৃ বধূভোগে দক্ষিণে মাতুল কন্যকা॥
পশ্চিমে চর্ম্মপানীনা উত্তরে মহিষী মাংসম্।
পরাশর বিধানেন আচার দেশতো বিধিঃ॥"

*মগধে (বিহারে) মদ্য পানে দোষ হয় না, সে দেশে পিতা, পুত্র, পরিজনবর্গ সকলে মিলিয়া মোয়া নামক একপ্রকার মদ্য পান করে। কলিঙ্গ দেশে (উড়িষ্যায়)

ইহারা খুব কর্ম্মিষ্ঠ ও সর্ব্বকার্য্যেই ইহাদিগকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহারা বড় মিথ্যাবাদী, ভীরু এবং লম্পট স্বভাবযুক্ত। মস্তকে বেণী থাকায় উড়িয়াদের অনেকেই কিষ্কিন্ধ্যার বংশধর বলিয়া থাকে। অর্থাৎ পুচ্ছ ক্রমে শিরোদেশে উঠিয়াছে। যাহা হউক্ এ জাতিকে যে ভগবান দয়া করিয়াছেন, সেই পুণ্যফলে জগন্নাথদেবের অনুগ্রহে উড়িয়াদের আজ সম্মান। নচেৎ এজাতি বড় পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এবং কতদিনে যে ইহারা উন্নতি লাভ করিবে তাহা কে বলিতে পারে?

সাক্ষীগোপাল।

পুরী হইতে ৭টার সময় গাড়ী ছাড়িয়া অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই সাক্ষীগোপাল ষ্টেসনে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ৫ মিনিট কাল পথ হাঁটিয়া মন্দিরের নিকটে একটী বাসা ঠিক করিলাম। লোকপিছু ৵১০ হিসাবে ঘর ভাড়া হইল। ঘরগুলি সব উলুখড়ের। এখানে পাকা বাটী আদৌ দেখিতে পাইলাম না। তবে চতুর্দ্দিকে বেশ বাগান ও লোকজনের বসতি আছে। বিশেষ রেল হওয়ায়, পুরীর প্রায় সকল যাত্রীই এইস্থানে অবতরণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য প্রত্যহই এই স্থানটী বেশ সরগরম হইয়া থাকে। সাক্ষীগোপাল, পুরী হইতে ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গুপ্তবৃন্দাবন নামক গ্রামে বৃহৎ উদ্যান মধ্যে সত্যবাদী গোপাল নামক শ্রীকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরে যাইবার পথের দুই পার্শ্বে তদ্দেশজাত খাদ্যদ্রব্য

অন্ন ও যোনির বিচার নাই। ওড্রে (উড়িষ্যা দেশে), বিধবা পুত্রবতী হইলেও স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পুনরায় বিবাহ হইয়া থাকে। দক্ষিণ দেশে (মালাবারে) মাতুল কন্যার সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। পশ্চিমে (রাজপুতানা অঞ্চলে) যবকের জল ব্যবহৃত হয়। উত্তরে (নেপাল অঞ্চলে) মহিষ মাংস ভক্ষণ করিলেও দোষ হয় না। পরাশর ঋষির বিধান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আচার পদ্ধতি দেখা যায়।

দোকানে সুসজ্জিত। পার্শ্বে একটী সুন্দর সরোবর, এই সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে আমরা স্নান আহ্নিক সারিয়া দেবদর্শনে গমন করিলাম।

মন্দিরটী একটী পরীখা বেষ্টিত উদ্যান মধ্যে অবস্থিত। সম্মুখে প্রস্তর-নির্ম্মিত অষ্টাদশ নালা সদৃশ একটী সেতু পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণ দীর্ঘে প্রস্থে ১৩২ × ১৩৮ ফিট। মন্দিরটী লেটারাইট প্রস্তর নির্ম্মিত। মন্দির প্রাঙ্গণে অনেকগুলি বৃক্ষ আছে। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে ২২ হস্ত পরিমিত একখণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত ধ্বজ-স্তম্ভ বিদ্যমান। মন্দিরটী ৭০ ফিট উচ্চ ও পঙ্কের কার্য্যে ঢাকা বলিয়া আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যাত্রীদিগের নিকট ৷১০ করিয়া মাশুল লয়। ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তৎপার্শ্বে শ্রীরাধিকা। এই যুগলমূর্ত্তি দেখিলে, মন ভক্তিরসে ও আনন্দে আপ্লুত হইতে থাকে। যেন মনে হয়, আবার শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছি। গললগ্নীকৃতবাসে ভগবানকে প্রণাম করিলাম। ৫ ফিট পরিমিত ধূসর বর্ণের গ্রেনাইট-প্রস্তরের কৃষ্ণমূর্ত্তি এবং উজ্জ্বল পিতলের ৪ ফিট উচ্চ শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি। ইঁহাদের প্রতিদিন সপ্তবিধ শৃঙ্গার বেশ ও ৭ বার মিষ্টান্নভোগ হইয়া থাকে। অন্নভোগ আদৌ হয় না। আমরা পূজা দিতে আমাদের কিঞ্চিৎ মালপোভোগ প্রসাদ দিয়াছিল। সাধারণ যাত্রীগণের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস যে জগন্নাথ দর্শন করিয়া সাক্ষীগোপালকে দর্শন না করিলে সমস্ত ফল নষ্ট হয়। এই কারণে সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন কালীন এই স্থানে নামিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া থাকেন। আমরা দেবদর্শন করিয়া ঐ স্থানে রন্ধনাদি করিয়া বেলা ৩টার গাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। এখানে স্বতন্ত্র একটা বাজার নাই, তবে রাস্তার ধারে ধারে ফল মূলাদি বিক্রয় হইতেছে। একটা বিশেষ আশ্চর্য্য দেখিলাম আলু আদৌ মিলে না। জিজ্ঞাসা

করায় তাহারা বলিল যে আলু অপবিত্র, বিলাতি জিনিস উহা কি ঠাকুরকে দেওয়া যায়? যে জিনিস দেবতার ভোগে ব্যবহৃত হয় না সে জিনিস এখানে দুষ্প্রাপ্য। কেবল কচু ও পটল পাওয়া যায়। চুনা মৎস্য বড় সুলভ। এখানে কেবল উড়িয়া, অন্য কোন জাতি দেখিলাম না, চতুর্দ্দিকে গাছ পালা থাকায় স্থানটী বেশ প্রীতিপ্রদ।

সাক্ষীগোপালের বিবরণ।

কাঞ্চিপুরের নিকটস্থ বিদ্যানগরে দুইজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে কাশী, গয়া, মথুরা দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে উপনীত হন। ইহাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি কুলীন ও বিদ্বান ছিলেন; কিন্তু কনিষ্ঠটী সামান্য বংশজাত ও মূর্খ ছিলেন। ইহাঁরা কিছুদিন গোপাল জীউর মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় বয়োজ্যেষ্ঠের কঠিন পীড়া হইল, কনিষ্ঠ প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ বিপ্র তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া গোপাল সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, তুমি পুত্র অপেক্ষাও আমার সেবা করিতেছ, যদি আরোগ্য লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারি তাহা হইলে আমার কন্যাকে তোমায় সম্প্রদান করিব। গোপাল জীউর কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়া দুইজনে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে প্রতিজ্ঞা পালনের কথা বলাতে জ্যেষ্ঠ বলিলেন অসুস্থ অবস্থায় কি বলিয়াছি তাহা আমার স্মরণ নাই। জ্যেষ্ঠের পুত্রগণও এ বিষয়ে আপত্তি করিতে লাগিলেন। মূর্খকে কন্যাদান করা কাহারও ইচ্ছা হইল না। সকলেই নিষেধ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তাহারা বলিলেন বাপু উনি যে কন্যাদান করিবেন বলিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? তখন কনিষ্ঠ বিপ্র সাশ্রু নয়নে বলিলেন স্বয়ং ভগবান গোপাল জীউ আমার সাক্ষী আছেন। এই কথায় সকলে হাসিয়া

উঠিলেন এবং বলিলেন যদি তিনি এখানে আসিয়া সাক্ষ্য দেন তাহা হইলে তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করা হইবে। তাহাতে যুবক মর্ম্মাহত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে কনিষ্ঠ বিপ্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া গোপাল জীউর সম্মুখে প্রায়োপবেশন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে দৈববাণী হইল "হে যুবক! তুমি কাতর হইওনা আমি যাইয়া তথায় সাক্ষ্য দিব। আমার গমন কালীন তুমি পশ্চাতে একবারও দেখিও না, আমার নুপুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জানিবে যে আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি। পশ্চাৎ দিকে দেখিলেই আমি সেইস্থানে থাকিব। আর অগ্রসর হইব না।" তখন যুবক সাহ্লাদে স্বদেশাভিমুখে আসিতে লাগিলেন, এবং ভগবান গোপালজীউ সুন্দর নুপূরধ্বনি করিতে করিতে তদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যুবক প্রতিদিন ১সের মিষ্টান্নের ভোগ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে কাঞ্চিপুরের সন্নিকট হইলে বালুকারাশি নুপূর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় ক্রমেই ধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হইল না। তখন যুবক নুপূর ধ্বনি শ্রবণ করিতে না পাইয়া যেমনি পশ্চাতে চাহিলেন, অমনি বিগ্রহ জড়বৎ হইয়া সেই স্থানে রহিলেন আর অগ্রসর হইলেন না; এবং তিনি যুবককে কহিলেন তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে এইস্থানে আনয়ন কর। আমি আর অগ্রসর হইব না। তখন যুবক সেইস্থানে যাইয়া জ্যেষ্ঠ বিপ্র ও অন্যান্য সকলকে এই কথা বলিলে, সকলে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই স্থানে ছুটিয়া আসিয়া বালুকোপরি সুন্দর বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তখন গোপাল জীউ সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন "এই বিপ্র, কনিষ্ঠ যুবককে কন্যা দান করিবে বলিয়া আমার নিকট শপথ করিয়া বাগ্দান করিয়াছে।" তখন বৃদ্ধ জাত্যভিমান ত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠকে কন্যাদান করিলেন। এ দিকে তদ্দেশীয় রাজা এই কথা শুনিয়া স্বদল বলে তথায় আসিয়া

ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং ঐ বিপ্রদ্বয়কে পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। উহারাই বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্র নামে অদ্যাবধি অভিহিত হইতেছেন।

কয়েক শতাব্দী পরে কটকের রাজা প্রতাপরুদ্র কাঞ্চীপুর রাজকন্যা পদ্মাবতার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া তথায় গমন করিলে, কাঞ্চীপুরাধীশ্বর তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে প্রতাপরুদ্র ক্রোধে দুইবার কাঞ্চীপুর আক্রমণ করিয়া পদ্মাবতী ও সাক্ষীগোপালকে পুরীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। শেষে দেবতার আদেশে গুপ্তবৃন্দাবনে তাঁহাকে স্থাপনা করিলেন। এবং তিনি বলিলেন অদ্যাবধি আমি মিষ্টান্ন ভোগ খাইব, অন্নভোগ খাইব না। যদি কেহ আমাকে অন্নভোগ দেয় তাহা হইলে সে স্ববংশে নরকে গমন করিবে। তদবধি তাঁহার মিষ্টান্নভোগ হইয়া থাকে। সাক্ষীগোপাল স্থানের নামই গুপ্ত বৃন্দাবন।

পূর্ব্বে যে কয়েকবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলাম সেই কয়েকবার সাক্ষী গোপাল দর্শন করিয়া বেলা ৩ টার ট্রেণে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময়ে খুরদারোড ষ্টেসনে রেলগাড়ী বদল করিয়া মান্দ্রাজ মেলে বাটী ফিরিতাম। কিন্তু এবার অর্থাৎ ১৩১৩ সালের ৬ই আশ্বিন সেতুবন্ধ যাত্রা কালীন ভুবনেশ্বর কি পুরী কোথায়ও না নামিয়া আমরা বরাবর মান্দ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করি। সেতুবন্ধ হইতে প্রত্যাগমন কালীন ওয়ালটেয়ার, পুরী, সাক্ষীগোপাল ও ভুবনেশ্বরে পুনশ্চ অবতরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে খুরদা হইতে ওয়ালটেয়ারের মধ্যবর্ত্তী স্থানের বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

খুরদা হইতে বেজওয়াডা।

চিল্কাহ্রদ।

খুরদা রোডে বেলা ৯ টার সময় গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। এইগাড়ী মান্দ্রাজ অভিমুখে গমন করে। পুরী-যাত্রীগণ এই স্থানে অবতরণ করিয়া গাড়ী বদল করিল। আর আমরা বরাবর ওয়াল্‌টেয়ার অভিমুখে চলিলাম। ক্রমে চিল্কাহ্রদ আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। ট্রেণে বসিয়া এই হ্রদের মনোহর গম্ভীর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। অদূরে হ্রদবক্ষে শ্যামল তরুরাজি শোভিত কয়েকটী দ্বীপ দেখিলাম। আমাদের গাড়ী কখনও উপকূল দিয়া কখনও একেবারে জলের কিনারা দিয়া গমন করিতে লাগিল। চিল্কা হ্রদ এত বড়, যেন সমুদ্র, কূল কিনারা কিছুই দেখা যায় না। যেন জলে ও আকাশে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় জলের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কত রকমের জল-বিহঙ্গম কূজন করিতে করিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে। গাড়ী চলিতেছে, আমরা গাড়িতে বসিয়া বসিয়া এই মহান দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলাম। ক্রমে রম্ভা ষ্টেশনে গাড়ী আসিলে কতকগুলি লোক নামিয়া গেল। তাহারা বোটে করিয়া এই হ্রদে বেড়াইবেন এই উদ্দেশ্য। চিল্কা হ্রদে খুব বড় বড় কাঁকড়া পাওয়া যায়। এই সমুদ্র কর্কটী ভক্ষণের নিমিত্তই অনেকে এইস্থানে নামিয়া থাকে। ভুসন্দপুর ষ্টেশন হইতে হুমা ষ্টেশন পর্য্যন্ত ৩ মাইল রেলের ধারে ধারে চিল্কা হ্রদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই হ্রদ দীর্ঘে ২২ ক্রোশ, প্রস্থে কোন স্থান দুই ক্রোশ কোন স্থান বা একেবারে ১০ ক্রোশ, গভীরতা ২ হইতে ৪ হস্ত পর্য্যন্ত।

মৎস্য জীবীরা চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র নৌকা করিয়া মৎস্য ধরিয়া বেড়াইতেছে। প্রায় চারিদিকেই ঘুনিপাতা রহিয়াছে। এক সময়ে এই হ্রদের চতুর্দ্দিকে সাত সহস্র শিব মন্দির ছিল, এক্ষণে কোন কোন স্থানে কিছু কিছু মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগর হইতে ইহা ৪০০ হস্ত বালুকাময় বাঁধ দ্বারা বিভক্ত। এবং দক্ষিণ পশ্চিমদিকে কতক শৈল থাকায় যেন সমুদ্রের দিকে একটী স্বাভাবিক প্রাচীর প্রদত্ত হইয়াছে। একটী অপ্রশস্থ মোহানাদ্বারা ইহা সমুদ্রের সহিত সংযোজিত। চিল্কাহ্রদে হাঙ্গর কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্রক জল জন্তু আছে। ইহার জল দেখিতে সমুদ্রের মত নীলাভ নহে; অনেকটা বর্ষাকালীন গঙ্গাবারির মত, কিন্তু সমুদ্রাম্বু হইতেও অধিকতর লবণাক্ত। চিল্কাহ্রদে যে সমস্ত বিহঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এরা নামক এক প্রকার বক জাতীয় পক্ষী আছে। তাহাদের পালক শ্বেত ও লালবর্ণে চিত্রিত হওয়ায় বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। অনেক সাহেব এখানে পক্ষী শীকার করিতে আসিয়া থাকেন। চিল্কাহ্রদ পর্য্যন্ত উড়িয়াদের রাজ্য শেষ হইল।

ইহার দক্ষিণ দেশ হইতে গঞ্জাম জিলা আরম্ভ। ইহাদের ভাষা তেলেগু। ইহারা দেখিতে কতকটা উড়িয়াদের মত আর কতকটা মান্দ্রাজবাসীদের মত। মেদিনীপুরের দক্ষিণ ভাগের অধিবাসীগণ যেমন, না বাঙ্গালী না উড়িয়া, তদ্রূপ ইহারাও যেন ঠিক উড়িয়া ও মান্দ্রাজবাসীর মধ্যবর্ত্তী লোক। তবে ইহারা উড়িয়াদের অপেক্ষা অনেকটা সভ্য ও বিদ্বান। উড়িয়াদের মত ইহাদের মস্তকে বেণী আছে কিন্তু সভ্য জাতীয়ের মত ইহারা কোট পরিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ। যাহা হউক আমাদের গাড়ী গঞ্জাম জেলার প্রধান নগর বরহামপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বেলা ১২॥ টা, এখানে কুড়ি মিনিট গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকে।

বরহামপুর।

গঞ্জাম বৃহদায়তন জেলা। ইহার অধিকাংশ স্থান অরণ্য ও পর্ব্বতাকীর্ণ। ট্রেণ হইতে চতুর্দ্দিকে কেবল শৈলশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। পার্ব্বত্যাঞ্চলে খন্দ নামক অসভ্য জাতির বাস। তাহারা ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বধের নিমিত্ত নানাবিধ অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। সাধারণতঃ গঞ্জামবাসিগণের ভাষা তেলেগু; কিন্তু উড়িষ্যার অদূরবর্ত্তী বলিয়া তাহারা প্রায় সকলেই উড়িয়া ভাষা বুঝিতে ও কহিতে পারে। উড়িয়া বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষার ন্যায়, তেলেগু সংস্কৃত মূলক ও সহজে বোধগম্য নহে। কুল্পি বরফের হাঁড়ী নাড়িলে যেমন কড় মড় শব্দ হয়, তেলেগু ভাষাও শুনিতে প্রায় তদ্রূপ। অনেক বাঙ্গালী এখানে বহুকাল থাকিলেও সহজে এই ভাষা আয়ত্ত করিতে পারেন না। এখানকার অধিবাসিগণ মস্তকে দীর্ঘ কেশপুঞ্জ ধারণ করে ও মাথার পশ্চাৎ দিকে তাহা জড়াইয়া স্ত্রীলোকের মত বাঁধিয়া থাকে। তাহার উপর আবার কেহ টুপি ধারণ করে, কেহবা পাগড়ী বাঁধিয়া থাকে। ইহাদের পরিধানে ছয় হস্ত পরিমিত ধুতি। তাহার এক কোণ কোমরে গুজিয়া রাখে, আর এক কোণ কাছার দিকে ঝুলিতে থাকে। ইহারা দশ হাত ধুতি, কোঁচা করিয়া পরিতে জানে না। বস্ত্রের খর্ব্বতা প্রযুক্ত তাহাদের কোঁচা অতিশয় সরু হয়।

গঞ্জাম জেলার প্রধান নগর বরহামপুরে সিভিল কোর্ট, সাবকলেক্টর অফিস্ ও বিদ্যালয় আছে। এইস্থানে প্রায় ২৬০০০ লোক বাস করে। বরহামপুর, রেশমী বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ এবং এখানে তুলারও সূক্ষ্ম মিহি কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা সর্ব্বত্র বহুমূল্যে আদরের সহিত বিক্রীত হয়। খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের যত্নে এখানকার ভদ্র অভদ্র সকলেই অল্পাধিক ইংরাজীতে কথা বলিতে পারে।

এ দেশের মহিলারা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকেন না। আবশ্যক মত অনাবৃত মস্তকে পুরুষের মত কাচা আঁটিয়া প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন করে। এতদ্দেশীয় লোকের চরিত্রের প্রশংসা শুনা যায় না। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নীতির বড়ই শিথিলতা। এখানকার সামান্য শ্রেণীর বহু লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। প্রায় সকলেই রোমাণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহারা গির্জ্জায় যাইয়া যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্ট মাতা মেরীর উপাসনা করে, আবার এদিকে হিন্দুদের দেবদেবীকেও মান্য করিয়া থাকে।

এখানে অনেক শ্বেতাঙ্গের সমাগম হেতু ষ্টেশনটী বেশ লতাপুষ্পে সুসজ্জিত। ট্রেণটী এখানে ২০ মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে কোন কোন ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে গোয়ালিনীরা ছোট ছোট কেঁড়ে মস্তকে করিয়া "পালু" "পালু" বলিয়া উচ্চ রবে দুগ্ধ বিক্রয় করিতে আসিল। ইহারা দুগ্ধকে 'পালু' বলে। ইহাদের ভাষা কিছুই বুঝিবার যো নাই। ক্রমে গাড়ী বৈকাল ৫॥ টার সময়ে ভিজনা গ্রামে আসিয়া পৌছিল।

ভিজিয়ানা গ্রাম বা বিজয় নগর।

ভিজিয়ানা গ্রামের রাজাদিগের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহাঁদের এক্ষণে পূর্ব্বগৌরব না থাকিলেও গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত মহারাজ উপাধি (Maharaj of Vizianagram) ও বড় বড় জমিদারী আছে। মহারাজের একটী পুরাতন দুর্গ আছে। এখানে কলেক্টর সাহেবের হেড কোয়ার্টার ও কিছু কিছু রেজিমেণ্ট আছে। অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত মন্দ নহে, প্রায় ৩৫ হাজার। তজ্জন্য বাজার হাট, দোকান, প্রভৃতিতে সহরটী বেশ পরিপূর্ণ। রাস্তা ঘাটও বেশ প্রশস্ত এবং কঙ্করময় ও পাকা। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা নারায়ণচন্দ্র কাশীতে প্রাসাদ ও প্রমোদ উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশীতেই জীবন লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র গজপতি রাজ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ বৎসর বয়সে ভিজিয়ানা গ্রামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৬৩ খৃঃ ইনি মহারাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সনন্দ পান। পরে কে, সি, এস্, আই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গভর্ণমেণ্ট লেজিস্লেটীভ কাউন্সিলের মেম্বর হন। ১৮৭৭ খৃঃ দিল্লীর দরবারে সম্মান সূচক তাঁহার ১৩টী তোপ প্রদত্ত হয়।

ইনি নিজ ব্যয়ে রাস্তা, পুল, দিঘী, হাঁসপাতাল, স্কুল নির্ম্মাণ করিয়া দেন; এবং বারাণসীতে অনেক সদ্ব্যয় করেন। ১৮৭৮ খৃঃ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র আনন্দ গজপতিরাজ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। ১৮৮১ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাজ উপাধি ও ৩১ তোপ প্রদান করেন। দুঃখের বিষয় ইনি অপুত্রক।

বিজয় নগর হইতে ৭মাইল দূরে রামতীর্থ নামক একটী তীর্থ আছে। ৪ মাইল দূরে একটী নদী পার হইয়া যাইতে হয়। কথিত আছে এই স্থানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিছুদিন অতিবাহিত করেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও এখানকার পদ্মনাভ নামক স্থানে ছয় মাস বাস করেন। রামতীর্থ ক্রমে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়। পরে বিজয় নগরের পূর্ব্বরাজা সীতারামচন্দ্র স্বপ্ন আদিষ্ট হইয়া জঙ্গল কাটাইয়া শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের শিলামূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি ঐস্থানে হ্রদের ধারে উচ্চস্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নিত্য সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তদবধি এখানে প্রতিদিন এক মণ চাউলের অন্ন ভোগ হইয়া ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের সেবা হইয়া থাকে। উক্ত মন্দির ভিন্ন এখানে দ্রষ্টব্য এমন কিছুই নাই। তবে দুর্গ মধ্যস্থ মহারাজার দ্বিতল অট্টালিকাটী দেখিবার জিনিস। কারণ এখানে নানাবিধ অস্ত্র, শস্ত্র, পুস্তক, দরজায় বৃহৎ বৃহৎ আয়না, প্রাঙ্গণস্থ উদ্যান, প্রত্যেক কক্ষে বহুমূল্য সুসজ্জিত দ্রব্যাবলীর একত্রীকরণ দেখিয়া মনে প্রীতি ও আনন্দ উৎপাদন করে।

ওয়ালটেয়ারের পথ।

ভিজিয়ানা গ্রাম পার হইয়া ট্রেণ সবেগে ওয়ালটেয়ারাভিমুখে চলিতে লাগিল। ট্রেণে বসিয়া বসিয়া সূর্য্যাস্ত গমন পর্য্যন্ত আমরা উভয় পার্শ্বস্থ গিরিমালা, অরণ্য ও প্রান্তর, মধ্যে মধ্যে সরিৎ সরোবরাদির সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, পুলকিত মনে গমন করিতে লাগিলাম। নীলগিরি বা পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত শ্রেণীর উপত্যকা ভূমির মধ্যস্থল দিয়া ট্রেণ গমনাগমন করাতে উভয় দিকেরই পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্যামল ক্ষেত্র অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থানে শ্রেণীবদ্ধ কুটির দেখিতে পাওয়া যায়। কুটিরগুলি আমাদের দেশের মরাইয়ের মত গোলাকার ও তালপত্রের চালে আচ্ছাদিত। উহা এতনিম্ন যেন ভূমিকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে। কুটীর গাত্র তালপত্র ও মৃত্তিকায় নির্ম্মিত। প্রবেশ দ্বার চালায় আচ্ছাদিত। কুটীরে প্রবেশ কালে গৃহের নিম্নতা ও ক্ষুদ্রতা প্রযুক্ত সময়ে সময়ে অধোমুখে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে হয়। গৃহাভ্যন্তরে বায়ু বা আলোক প্রবেশ অসম্ভব। দরিদ্র কৃষককুল এই সকল গৃহে বাস করিয়া থাকে। বিশ্বরচয়িতার অনেক অভিনব বস্তু নয়নপথে পতিত হইয়া আমাদের মনে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই একখানি কৃষ্ণ মেঘ দেখা দিল, তখন সেই শুক্ল নিশা—তিমির বসন প্রসারণ করিয়া পর্ব্বতপুঞ্জ, প্রান্তর ও অরণ্যানী আবৃত করাতে আমাদের দর্শন সুখের বাধা পড়িল। যেন সকল স্থানই অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে লুক্কাইত রহিল। যেন প্রকৃতি দেবীর নাট্যাভিনয়ের একটী অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল। আর কিছুই দেখা গেল না। গাড়ীও কোথাও থামিল না। বিজয় নগর হইতে মেল ট্রেণ ছাড়িয়া একেবারে রাত্রি ৭॥০ টার সময় ওয়ালটেয়ারে পৌছিল।

ওয়ালটেয়ার।

১৩১০ সালের পূজার সময় আমরা প্রথম ওয়ালটেয়ারে আসি। তৎপরে সুবিধা পাইলেই এই স্থানে আসিয়া থাকি। এবারেও এখানে নামিয়া ছিলাম। কিন্তু প্রথম বারে আসিয়া কিরূপে আমরা এই স্থানে ছিলাম তাহার একটু আভাষ দিব। ওয়ালটেয়ার ও ভিজাগাপট্টম্ পাশাপাশি স্থান। কিন্তু রেল লাইন একটু ঘুরিয়া গিয়া তথায় স্বতন্ত্র ষ্টেশন হওয়াতে, ইহার দূরত্ব দুই মাইল হইয়াছে। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেকে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে এই ওয়ালটেয়ারে শেষ হইল এবং এখান হইতে মাদ্রাজ রেল লাইন আরম্ভ হইল।

ওয়ালটেয়ারে ট্রেণ আসিবা মাত্র আমরা সকলে টিকেট দিয়া যেমনি বাহিরে যাইব, অমনি একজন মাদ্রাজি প্লেগের ডাক্তার আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার আটচালায় লইয়া গিয়া মুদ্রিত ফরমে আমাদের নাম, ধাম, পিতার নাম, কোথায় গমন ইত্যাদি লিখিয়া প্রত্যেককে এক একখানি ফরম দিতে লাগিলেন। পুনশ্চ বলিয়া দিলেন, কাল সকালে বাসায় ডাক্তার গমন করিলে এই রসিদ দেখাইতে হইবে। প্লেগের রোগী থাকুক, বা নাই থাকুক, এরূপ একটা বাজে কাজ লইয়া তাঁহার চাকরিটী অদ্যাবধি বজায় রাখা হইয়াছে। যাহা হউক আমরা প্লেগ রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া ষ্টেশনস্থিত গোশকটে আরোহণ করিয়া ছত্রের দিকে চলিলাম। এখানে লোকেরা গাড়িকে বাণ্ডি কহে। এই বাণ্ডি, গরুতে টানে এবং ঘোড়াতেও টানে। তবে আমাদের দেশের মত ঘোড়ার গাড়ী সে দেশে নাই। ছত্রের নাম (Turnur's Chatram) টার্নার্স ছত্রম্। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা, জয়পুরের মহারাজা প্রভৃতি বদান্যবর নৃপতিবর্গের আনুকূল্যে টার্নাস সাহেবের

নামে এই ছত্র বাটী নির্ম্মিত হয়। ১৫ মিনিট মধ্যেই আমাদের গাড়ী এই ছত্রের মধ্যে উপস্থিত হইল। পথে যাইতে যাইতে চতুর্দ্দিকস্থ পাহাড় যেন প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাহাড়ের উপরে ফণী মনসার গাছ ও কতকগুলা বুনা জঙ্গলি গাছও জন্মিয়াছে, দেখিলাম।

ছত্র বাটীটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সম্মুখে একটী ফটকের ভিতর খানিকটা জায়গা আছে। সেইস্থানে প্রায় গাড়ী হাজির থাকে। ফটকের বাহিরে একটী জলের কল আছে। দিবারাত্র সেই কলে খুব তোড়ের সহিত বিশুদ্ধ জল সরবরাহ হইয়া থাকে। ছত্রের চতুর্দ্দিকে সুন্দর বাগান ও পশ্চাতে একটী কুয়া আছে। ছত্র বাটীর মধ্যে বৃহৎ প্রাঙ্গণ থাকায় অধিকতর শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। দুই পার্শ্বে অনেকগুলি গৃহ, প্রত্যেক গৃহের রান্নাঘর ও উঠান আছে। ছত্রের একজন ম্যানেজার আছে। ম্যানেজারটী তৈলঙ্গী, ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তজ্জন্য তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে বড় কষ্ট হইয়াছিল। এই ছত্র বাটী প্রায়ই যাত্রীতে পূর্ণ থাকে। সুতরাং ঘর খালি পাওয়া দুষ্কর।

আমরা ছত্রে পৌঁছিয়া দেখিলাম সমস্ত ঘরই যাত্রীতে পূর্ণ, কোন গৃহ খালি নাই। তখন ভগ্ন মনোরথে সকলে দালানেই বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী গৃহ খালি হইল; তাহারা তল্পি তল্পা লইয়া কোথায় যাত্রা করিল। তখন ম্যানেজারের নিকট হুকুম লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই গৃহটী দখল করিলাম। এই ছত্রে দুই দিবস বিনা ভাড়ায় থাকিতে পাওয়া যায়, ইহার অধিক হইলে প্রতি দিন ।০ হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। বর্ত্তন, ঘটী, বাটী, বেড়ী, খুন্তি প্রভৃতি বিনা মূল্যে ব্যবহারের জন্য যাত্রীদিগকে দেওয়া হয়। যাত্রীগণ রসিদ দিয়া এই সকল দ্রব্য লয়। আবার চলিয়া যাইবার সময় দ্রব্যগুলি দিয়া রসিদ ফেরৎ লইয়া থাকে।

এখানে ৪।৫ পয়সার বাজার করিলে একটী মোট হয়। এক পয়সায় প্রায় ⁄১ একসের বেগুন, একটী পাই দিলে এত শাক দেয় যে, এখানে সেগুলির মূল্য ⁄৹ এক আনা। একটী লাউ ৲৹ দুই পয়সা, মৎস্য ও মাংসের সের ।৹ চারি আনা, উত্তম আতপ তণ্ডুল টাকায় ⁄৮ ও ।৹ সের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ঘৃত ⁄১॥৹ হইতে ⁄১৸৹ পোয়া, চিনি ⁄৬ সের, দাউল ⁄৯ সের হইতে ।৩ সের, ময়দা ⁄৮ সের ও দুগ্ধ ।৹ সের টাকায় বিক্রয় হয়। তরি তরকারীর মধ্যে আলু, বেগুন, পটল, উচ্ছে, কাঁচকলা, ঝিঙ্গে, মোচা, চাল্‌তা, ও নানাপ্রকার শাক যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্‌ভিন্ন নারিকেল, আতা, পেয়ারা, পাতিলেবু, বাতাবিলেবু ও কদলী প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে এবং সুবিধাদরে পাওয়া যায়। চিত্রবিচিত্র-বিশিষ্ট নানাপ্রকার সমুদ্রের মৎস্য, ও ভাঙ্গন, ইলিস, চিংড়ি, বাটা ও নানারকম চাঁদামৎস্যও পাওয়া যায়; কিন্তু এই সকল মৎস্যের এত আঁস্‌টে গন্ধ যে, নূতন বাঙ্গালীর তাহা সহ্য হয় না।

ওয়ালটেয়ারে বাঙ্গালী খুব কম। আমার একজন পরম বন্ধু স্বনামখ্যাত রাজেন্দ্রনারায়ণ বাগ* মহাশয় রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টারি কর্ম্মের জন্য এইস্থানে বাটী প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতেছেন। ঈষ্ট্‌কোষ্ট্‌ ট্রেডিং কোং নামক ষ্টেসনারি দোকানও তাঁহার; সুতরাং তাঁহার অধীনে প্রায় ২০।২৫ জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী কর্ম্ম করিতেছেন। সেই সকল বাঙ্গালী ভিন্ন বোধ হয় ১০।১৫ জন মাত্র অপর বাঙ্গালী দেখিলাম। আমি ওয়ালটেয়ারে আসিয়াছি শুনিয়া রাজেন্দ্র বাবুর অন্যতম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত তারিণী চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পরদিবস প্রাতে আমাদের (Turnur's Chatram) বাসায় আসিয়া আমাকে তাঁহাদের

* রাজেন্দ্রবাবু অল্পদিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

বাটীতে লইয়া গেলেন। সেখানে রাজেন্দ্র বাবু আমাকে পাইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আমার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, যে কয় দিবস ওয়ালটেয়ারে থাকিবেন সে কয় দিবস ছত্রে আহারাদি করিতে পাইবেন না। আমার এখানেই থাকিতে হইবে। নানা কারণ দেখাইয়াও তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলাম না সুতরাং তাঁহার নিকটেই থাকিতে বাধ্য হইলাম। রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন এখানে যখন আসিয়াছেন, তখন ওয়ালটেয়ারের যাহা কিছু দর্শনযোগ্য তাহা দেখিয়া সামাচলম্ বা সিংহাচলম্ দেখিবেন। সেটী প্রহ্লাদ-পুরী। পর্ব্বতোপরি নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ পাইবেন। এই কথা শুনিয়া আমরা তৎপরদিবস প্রাতেই তথায় যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম এবং অদ্য বৈকালে সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ করিয়া নীলাম্বুধির লহরক্রীড়া দর্শন করিয়া সকলে ডল্‌কিন নোজ নামক পর্ব্বত ও ভেলি গার্ডেন প্রভৃতি দেখিতে গমন করিলাম।

দ্রষ্টব্য-স্থান।

ঘাটের উপর পোর্ট-আফিস। ইহার উত্তর দিকে পাহাড়শৃঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মতের তিনটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। একটী মুসলমানগণের মসজিদ, ২য়টী হিন্দুদিগের মন্দির, ৩য়টী খৃষ্টানদিগের গির্জ্জা। প্রথমটী কোন মুসলমান সিদ্ধপুরুষের সমাধির উপর এই মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস বঙ্গোপসাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপর মসজিদের দার্গা সাহেবের সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। প্রত্যেক দেশীয় পোত এই স্থান দিয়া যাইবার সময় বোটের পতাকা তিনবার উঠাইয়া ও নামাইয়া দার্গা সাহেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। অনেকে মানসিক করিয়া রৌপ্য প্রদীপ প্রদান করে। প্রতি শুক্রবারে দার্গার সম্মুখে দীপাবলী দেওয়া হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় হিন্দুদিগের বেঙ্কট্ স্বামীর মন্দির—ইহা দার্গার পশ্চিমদিকে পাহাড়ের উপর স্থিত। ভিজগাপট্টমের হিন্দুব্যবসায়িগণের দ্বারা উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইস্থানে নিয়মিতরূপে বেদ পাঠ ও অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

তৃতীয়টী গির্জ্জা,—ইহা পাহাড়ের সর্ব্ব পশ্চিমে রোমান ক্যাথলিকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তজ্জন্য ইহার নাম ক্যাথলিক চার্চ। ইংরাজেরা ও দেশীয় খৃষ্টানেরা এইস্থানে উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

ডলফিন্স নোজ।

ইহা একটী পাহাড়। ইহার উপর বিস্তৃত সমতল ভূমি আছে অন্য পাহাড়ের উপর এরূপ সমতল ভূমি প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না। পাহাড়ে উঠিতে পরিষ্কার পাকা রাস্তা আছে। পাহাড়ের উপর যাইয়া দেখি এক পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষতলে কয়েকটী ইষ্টক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। ইহা সাধু সন্ন্যাসীর থাকিবার উপযুক্ত স্থান। এখানে আসিয়া প্রাণে বিমল শান্তি পাইলাম। দক্ষিণ দিকে অনেকদূর যাইয়াও সীমান্ত পাওয়া গেল না; ইহার প্রান্তভাগে পাহাড়ীরা বাস করে। তথায় একটী বৃহৎ ইঁদারা বা কূপ এবং একটী গোরস্থান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে সমতল ভূমিতে পাহাড়ের উপর পূর্ব্বে একটী দূর্গ ছিল এখন তাহার পরিবর্ত্তে তথায় এ, বি, নরসিংহরায়ের ফ্লাগ ষ্টাপ রহিয়াছে। ইহাকেই নিশান বাতী কহে। ইহা পাহাড়ের উপর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হয়। বিশেষতঃ পোতবক্ষ সমুদ্রকে যেন চিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ভ্যালি গার্ডেন।

উপত্যকা উদ্যানে গমন করিতে হইলে, একটী সমুদ্রের খাঁড়ী (ক্ষুদ্র নদী বা খালের মত) পার হইতে হয়। এরূপ সুন্দর বাগান প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না। দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান সরল ও বক্রভাবে সজ্জীকৃত। উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষ আছে। নারিকেল বৃক্ষ প্রচুর। প্রান্তভাগে একটী ঝরণা হইতে জল নির্গত হইতেছে। গ্রীষ্মকালে অনেকেই এই ঝরণার বিশুদ্ধ জলে স্নান করিতে আইসেন। উদ্যান মধ্যে একটী ব্যাঘ্রধরা ফাঁদ দৃষ্টিগোচর হইল। এই সমস্ত দর্শন করিয়া আমরা ভিজিগাপট্টমের রাস্তার ধারের দোকানগুলি দেখিতে দেখিতে ওয়াল-টেয়ার অভিমুখে আসিতে লাগিলাম, পথে জগন্নাথ স্বামীর মন্দির দেখিলাম।

এদেশের স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই পরিশ্রমশীলা। তাহারা নিজে নিজেই আপনাদের গৃহ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা অপর জাতির জল গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণীগণ মস্তকে করিয়া জল আনয়ন করেন, কিন্তু কৃষ্ণা জেলার স্ত্রীলোকেরা স্কন্ধে করিয়া জল আনিয়া থাকে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানসীন নহে; তাহারা কাছাদিয়া বস্ত্র পরিধান করে; এবং সদর রাস্তা দিয়া অবাধে গমনাগমন করিয়া থাকে। উচ্চ পদস্থ স্ত্রীলোকেরা পদব্রজে প্রকাশ্য পথ দিয়া দেবদর্শন বা পরস্পর বাটীতে গমনাগমন করিলেও নিন্দনীয় হয় না। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বড় ভূতের ভয়। কাহার অসুখ করিলে জানিবে যে ইহাকে ভূতে ধরিয়াছে। তখন রোজা আসিয়া সেই জ্বর-রোগাক্রান্ত রোগীকে প্রায় ১৫।১৬ ঘড়া জলে স্নান করাইবে। রোগী দাঁড়াইতে অশক্ত হইলেও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া থাকে। জবাপুষ্প ও ধূনা দিয়া দেবীর অর্চ্চনা করা হয়। ঢোলের বাজনাও বাজিতে থাকে। শেষে রোগীকে সকলে

ধরিয়া ধরিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যায়। শয্যায় শুইয়া রোগী হয় ত রোগ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ইহ সংসার পরিত্যাগ করে; নচেৎ অদৃষ্টের জোর থাকিলে সে যাত্রা বাঁচিয়াও যায়। রোগ আরোগ্যের এরূপ সুন্দর প্রক্রিয়া সন্দর্শনে আমরা বিস্মিত হইয়া ছিলাম। জগতে কত রকমেরই লোক আছে? এতদ্দেশীয় শূদ্রেরা ছাগ, কুক্কুট, মেষ প্রভৃতির মাংস ও মৎস্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। কুক্কুট প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই বিচরণ করিতেছে।

রাজেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে ছত্রে আসিয়া আমার সহযাত্রীগণকে সীমাচলম্ যাইবার কথা বলিলাম। সকলে যাইবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সেই রাত্রে ২ খানি গোশকট ভাড়া করিয়া রাখিলাম। কারণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে। সুতরাং আমি বাসাতেই শয়ন করিলাম। অতি প্রত্যূষে বাতি জ্বালিয়া সকলে মুখ হাত ধুইয়া বস্ত্রান্তর পরিধানান্তে বাসাগৃহে তালা দিয়া সকলে গোশকটে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী প্রত্যেক খা নর যাতায়াত ভাড়া ৸৵০ ধার্য্য হইল। ঠিক ভোর ৬টার সময় সিংহাচলম্ দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। তখনও একটু একটু অন্ধকার। এদেশে যেন চিরবসন্ত; কি গ্রীষ্ম, কি শীত সকল সময়েই যেন বসন্তানিল বহিতেছে। প্রভাতের সেই মধুর মলয় মারুত সেবন করিতে করিতে সকলে সিংহাচলম্ দর্শন করিতে চলিলাম।

সিংহাচলম্।

ওয়ালটেয়ার হইতে ৫ মাইল দূরে পশ্চিম উত্তর দিকে সিংহাচলম্ অবস্থিত। ওয়ালটেয়ারের আগেকার ষ্টেশনের নাম সীমাচলম্। এই স্থান হইতে মন্দির ৩ মাইল মাত্র। এই স্থানে গাড়ী পাওয়া বড় দুর্ঘট, তজ্জন্য সকলে ওয়ালটেয়ার হইতে গমন করিয়া থাকেন। আমাদের গাড়ী

ওয়াল্‌টেয়ার ষ্টেশনের ব্রীজের তলদেশ দিয়া ক্রমে সহর পরিত্যাগ করিয়া পল্লীভূমিতে উপনীত হইল। বেশ পাকারাস্তা, সেই রাস্তা দিয়া গোযান বরাবর যাইতে লাগিল। দূর হইতে পর্ব্বতশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতশ্রেণী একটীর পর একটী তৎপরে আর একটী এইরূপে যেন দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে আমরা সেই সকল পর্ব্বতপুঞ্জের পার্শ্বদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। পর্ব্বতগাত্রে নানাপ্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া স্থানে স্থানে যেন জঙ্গলবৎ হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের শিখরদেশে বিস্তর গরু চরিতেছে দেখিলাম। গাড়ী হইতে সেগুলিকে যেন ছোট ছোট ছাগল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, সেগুলি ছাগল নহে যথার্থই গরু চরিতেছে। জানি না কিরূপে তাহারা এত উচ্চে উঠিয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিয়া আমরা বেলা নয়টার সময় সীমাচলম্ পাদদেশে উপনীত হইলাম।

এই পর্ব্বত অন্যান্য সকল পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চে বড়; তজ্জন্য ইহার নাম সিংহাচল হইয়াছে। ইহা উচ্চে ৮০০ ফিট্। প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই বহু অর্থব্যয়ে এই পর্ব্বতে উঠিবার সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সোপানগুলি দ্বাদশ ফিট প্রস্থ এবং সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৯৭৮ ধাপ আছে। ১০।১২টী ধাপ অন্তর একটী করিয়া বিশ্রাম চাতাল। ধাপের ধারে ধারে ঝির ঝির করিয়া উপর হইতে ঝরণার জল আসিতেছে। সোপানাবলী অতি সুন্দর ও সরলভাবে উর্দ্ধে উঠিয়াছে। নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধে সোপান গুলির দিকে চাহিলে মনে আনন্দবেগ বহিতে থাকে। কিরূপে উঠিব ইহা যেন ভাবনা। যাহা হউক সকলে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। অনেক দূর উঠিয়া সকলেই হাঁপাইতে লাগিলাম। সেই উচ্চ সোপানশ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নের দিকে চাহিয়া দেখি, যেন সবুজ বর্ণের ক্ষেত্রগুলি চিত্রবৎ চতুর্দ্দিকে সজ্জীকৃত;

মানুষ গরু প্রভৃতি যেন পুত্তলিকার মত বোধ হইতে লাগিল। উপরে অধিরোহণকালে পর্ব্বতগাত্রে সোপানপার্শ্বে দুই এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর এরূপ ভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে যেন এখনি খসিয়া পড়িবে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। সোপানটী পূর্ব্বমুখে বরাবর উর্দ্ধে উঠিয়া উত্তর দিকে বক্রভাব ধারণ করিয়াছে। এই স্থানে কতকগুলি ফলের গাছ ও আগাছা জন্মিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে কদলীবৃক্ষ দেখিয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। পাহাড়ের উপর কিরূপে যে কদলীবৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া ফলপ্রসূ হইয়াছে, বস্তুতই ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

পার্শ্বে একটী ছাদশূন্য গৃহের মধ্যে ঝরণা দিয়া হুহু শব্দে বারিধারা নির্গত হইতেছে। আরও উচ্চে উঠিয়া সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড তোরণ অবলোকন করিলাম। ইহাকে হনুমন্ত দ্বার কহে। এই ফটকের ধার দিয়া পিচিকা ও আকাশ ধারা নামে দুইটী ঝরণা বহিতেছে। তাহার পর বেত্রবতী ও বেগবতী নামে দুইটী ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার আশ পাশে কতক গুলি প্রকোষ্ঠ অবস্থিত। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি রহিয়াছে। এখান হইতে সোপান আরও উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এই স্থানে বাগানের মত নানাবিধ বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। আম্র, আতা পেয়ারা নারিকেলাদি বহুবিধ পাদপনিচয় এবং একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ থাকিয়া স্থানটীর শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। এইস্থানে আসিবামাত্র মনে হয় যেন কোন বাগান বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছি। আরও কিয়দ্দূর উর্দ্ধে উঠিয়া সোপান শেষ হইল। এইস্থানে একটী সমতল ক্ষেত্রের উপর কতকগুলি বাটী দেখিতে পাইলাম। সম্মুখে ২।৪টী পাকা বাটী ভিন্ন অধিকাংশই কুটীর দেখিলাম। ইহাকে সিংহাচল পল্লী কহে। সমতল ক্ষেত্রটীর চতুর্দ্দিকে রাস্তা। এই বৃত্তাকারের উত্তর পশ্চিম কোণে মহাপ্রভু নৃসিংহদেবের মন্দির। বেলা ঠিক ১১টার সময় আমরা উপরে পৌঁছিলাম।

আমরা উপরে উঠিয়া একটী বাসা লইলাম। চারি আনা ভাড়া ধার্য্য হইল। দ্রব্য-সামগ্রী তথায় রাখিয়া পশ্চাৎভাগের সুন্দর বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম। প্রায় সহস্র সোপান অধিরোহণ করিয়া সকলকারই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছিল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছিল, কোথায় জল পাইব এই চিন্তা হইতেছিল। সেই সময় গৃহস্বামীর কন্যা বাসায় আসিয়া আমাদিগকে স্নানের জন্য ঝরণা যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। তৎপরে আমরা সেই বালিকাপ্রদর্শিত পথে পশ্চিমদিকে কিয়দ্দূর যাইয়া একটী নিম্নে আর একটী উপরে ২টী ঝরণা দেখিলাম। ঝরণারমুখে একটী প্রস্তরের গোমুখ বসান রহিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া খুব তোড়ে নির্ম্মল বারিধারা নির্গত হইতেছে, জল যেমনি সুস্বাদু, তেমনি স্নিগ্ধ। ইহার নাম গঙ্গাধারা। ইহার সহিত যমুনা ও সরস্বতীর ধারা মিলিত হইয়াছে। এই পুণ্যতোয়া পশ্চিমবাহিনী গঙ্গাধারায় স্নান করিয়া শান্তি লাভ করিলাম।

ক্ষেত্র মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে যে নৃসিংহদেব এই স্থানে লক্ষ্মীর সহিত বাস করিলে পর গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া এই স্থানে আবির্ভূতা হইলেন। এই গঙ্গাধারায় স্নান করিয়া তর্পণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্র তীর্থে শতভার স্বর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, এখানে সামান্য দান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে গয়াধামে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল, এখানে একটী মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে সেই ফল। স্নানের সময় অনেকে পয়সা পাই প্রভৃতি ঝরণার পার্শ্বে রাখিয়া দিতেছে। সেই স্থানে ২।১টী প্রস্তরের বিগ্রহ মূর্ত্তি আছে তথায়ও সকলে পয়সা দিতেছে। গৃহীতার সংখ্যা অল্প তজ্জন্য পয়সাগুলি প্রায় পড়িয়া থাকে। ২।৪ জন সাধু সন্ন্যাসী বসিয়া আছে তাহারাই পয়সা গুলি তুলিয়া লয়। অনেকে বলেন এই জলে

অধিকক্ষণ স্নান করিলে গাল গলা ফুলিয়া থাকে। তিন প্রহরে তিনবার গঙ্গাধারায় স্নান করিলে কুষ্টব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। যাহা হউক এই নির্ম্মল সলিলে স্নান করিয়া শরীর যেন স্নিগ্ধ হইল। তৎপরে বাসায় আসিয়া নৃসিংহদেব দর্শনে গমন করিলাম।

মন্দিরের সম্মুখে দধি, দুগ্ধ, চিপিটিকা, চাউল, কাষ্ঠ এবং ফলমূলাদি বিক্রয় হইতেছে। এই সমস্ত, পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে আনিয়া উপরে যাত্রীদের বিক্রয় করা হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য-বালিকারা করবী পুষ্প ও অন্যান্য নানাজাতীয় বনফুলের মালা বিক্রয় করিতেছে। আমরা এক এক ছড়া মালা ক্রয় করিয়া ৫০৬টী সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে আসিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র আমাদের প্রত্যেককে এক আনা করিয়া মাশুল দিতে হইল। আমরা মাশুল দিয়া মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের প্রবেশদ্বার পূর্ব্বদিকে ও মূলস্থান পশ্চিম দিকে। সম্মুখে ধ্বজ স্তম্ভ বা সোণার তালগাছ। মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত বাহিরের চতুর্দ্দিকে প্রাঙ্গণ ও তাহার ধারে ধারে বারাণ্ডা আছে। মন্দিরটী গ্রেনাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত দুইটী প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত; দেবালয়টী বৃহৎ ও পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। অভ্যন্তরে বহু স্তম্ভ বিরাজিত এবং মন্দির-গাত্র নানা কারুকার্য্যে চিত্রিত, দেখিতে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মত, কিন্তু উচ্চে তত বড় নহে। সুবৃহৎ চূড়াটী সুবর্ণাবৃত। এস্থানেও অতি অশ্লীল মূর্ত্তি বিদ্যমান থাকায় কুরুচির পরিচয় দিতেছে। বিজয়নগরের বর্ত্তমান রাজার প্রপিতামহী বারাণসীগমনের পূর্ব্বে সিংহাচলে আসিয়া দেবমন্দিরে এইরূপ অশ্লীল প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত পলস্তারা দিয়া বুজাইবার আদেশ দেন। তাঁহার আদেশমত মূর্ত্তিগুলি অনেক স্থানে অদ্যাবধি আবৃত আছে।

মূলস্থানে ভগবান্ নৃসিংহদেব-দর্শনে প্রসন্নতা লাভ করিলাম। নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি সুবর্ণময় ও সুন্দর সিংহবদনাকৃতি। উর্দ্ধে প্রায়

চতুর্হস্ত পরিমিত। দুইজন পাণ্ডা অভ্যন্তরস্থ মন্দিরের দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। যেন কেহ ভিতরে না প্রবেশ করিতে পারে। এখানে ভিতরে যাইয়া কাহাকেও দেব-অঙ্গ স্পর্শ করিতে দেয় না। আমরা সেই পুষ্পমাল্য পাণ্ডার হস্তে দিলাম। সকলে মিলিয়া কিছু দক্ষিণা প্রদান করিলাম, তাহাতে পাণ্ডাঠাকুর কর্পূরারতি করিলেন। দীপালোকের সাহায্যে ভগবানের মনঃপ্রীতিকর সুন্দর সুবর্ণবর্ণ মুখকমল দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। পরম ভক্ত প্রহ্লাদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ঐশ্বর্য্য-মদগর্ব্বিত-দুর্দ্ধর্ষ-দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর প্রাণসংহার করিবার নিমিত্ত, নারায়ণ গোলকধাম পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর নরসিংহরূপে এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অদ্য আমরা সেই নরসিংহরূপী নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আজ আমাদের জীবনের কি শুভদিন! পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া "নমোব্রহ্মণ্য-দেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম।

সুবর্ণনির্ম্মিত মুখ ব্যতিরেকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন দ্বারা আবৃত। বৎসরের মধ্যে কেবল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চন্দন অনুলেপন খুলিয়া তাঁহার স্নান হইয়া থাকে, সেই দিন সকলে আসল মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তজ্জন্য সেই সময় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। দেবালয়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে লক্ষ্মী নারায়ণের মূর্ত্তি আছে। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ভাষ্যকার শ্রীরামানুজাচার্য্য ও অপর কয়টী মূর্ত্তি আছে। দক্ষিণে মাণিক্যাম্বা দেবীর মূর্ত্তি ও পশ্চিম উত্তর কোণে তারা ও ষামাদেবী পূজা পাইয়া থাকেন। এই দিকের একটী ছোট দ্বার দিয়া ছত্রবাটীতে যাওয়া যায়। এখানে জগন্নাথ দেবের মত ভোগ বিক্রয় হইয়া থাকে। তবে সেরূপ আনন্দবাজার ও অন্নছত্র নাই। পাণ্ডাকে পয়সা দিলে তাঁহারা ভোগ আনিয়া দিয়া থাকেন। সাধারণ ভোগের জন্য প্রত্যেককে ৵০ দিতে হয়।

পূজার নিমিত্ত আটজন অর্চ্চক, আটজন বেদগায়ক, ষোলজন মসালবাহক এবং এতদ্ব্যতীত আরও ৪৫ জন বৃত্তিভোগী আছে। প্রত্যহ ৩/০মণ চাউলের অন্নভোগ দেওয়া হয়। দেবোত্তরের আয়ও যথেষ্ট; খরচ হইয়াও উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। দেবালয় সমস্ত ভিজিনাগ্রামের মহারাজের অধীন। রাজকোষ হইতে দেবতার সমস্ত খরচ প্রদান করা হয়। মন্দিরসংলগ্ন পার্শ্বস্থ হলের বিস্তৃত কক্ষে নরসিংহদেবের একখানি সুদৃঢ় লৌহচক্রবিশিষ্ট রথ ও নানাবিধ ধ্বজা সংরক্ষিত হইয়াছে এবং হস্তী পাল্কী, প্রভৃতি উপকরণ, সজ্জীকৃত রহিয়াছে। বোধ হয় মেলার সময় এখানে সং রং হয়। তজ্জন্য সঙের পুতুলও দেখিলাম। এরূপ নিভৃত উচ্চ ও সুগুপ্ত স্থানেও কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। দুর্বৃত্ত মন্দিরের অনেক স্থান নষ্ট করিয়াছে।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া যে রাস্তা ঝরণার দিকে গিয়াছে, সেই রাস্তার কিয়দ্দূরে মন্দিরের পার্শ্বদিয়া একটী সোপানশ্রেণী ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। এই স্থানে বিজয়নগরের মহারাজার গোলাপ পুষ্পোদ্যান ও উদ্যানস্থ বিশ্রাম ভবন আছে। উদ্যানে অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। বেগবতী ঝরণা হইতে লোহার পাইপের মধ্য দিয়া ঐ সকল ফোয়ারায় জল আসিয়া থাকে। উৎসের চাবি খুলিয়া দিলে যখন প্রবলবেগে জল বহির্গত হইতে থাকে, তখন তাহার দৃশ্য অতি চমৎকার হইয়া থাকে। পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিতে ১২০০ সোপান আছে। মধ্যে মধ্যে রাস্তাও অতিক্রম করিতে হয়। আমরা বৃক্ষ, লতা, গুল্ম-পরিবেষ্টিত উচ্চ এবং ভগ্ন সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছিলাম। এখান হইতে নিম্নে চাহিয়া দেখিলে মন্দিরটী ও ঘরবাড়ীগুলি যেন একটী সুগভীর শুষ্ক সরোবরের মধ্যে অবস্থিত দেখায়। অদূরে নীল সলিলোপরি শ্বেত ফেণযুক্ত তরঙ্গ-মালা লইয়া রত্নাকরের ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় আনন্দ অনুভব

করিলাম। ষ্টেশনের রেলগাড়ীগুলি যেন বালকদিগের ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই সকল নয়ন-মন-প্রীতিকর অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শনে মনে ভগবদ্ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি হয়। ভগবানকে বুঝিবার ও ভাবিবার ইচ্ছা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সমস্ত কারণে সাধুসন্ন্যাসিগণ এইরূপ নিভৃত স্থানে নির্জ্জনে তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। পর্ব্বতগাত্রে আনারসের চাষ দেখিতে পাইলাম। এই স্থানে আতা ১ পয়সায় ৪টী। পর্ব্বতে আতা, আনারস, লেবু, রম্ভা প্রভৃতি সুলভ দেখিয়া মনে বাস্তবিকই আনন্দ হইতে লাগিল। আমরা এইরূপে চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া বাসায় আসিয়া দধি ও চিনি মিশ্রিত করিয়া চিপিটিকার ফলার করিলাম। এবং আতা, রম্ভা প্রভৃতি ফল খাইয়া সে দিবস অতিবাহিত করিলাম।

নৃসিংহদেবের উৎপত্তি।

পুরাকালে বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় ও বিজয়, সনকাদি ঋষির শাপে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দৈত্যরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ ত্রিভুবন জয় করিলে ভগবান্ বিষ্ণু ভয়ঙ্কর বরাহমূর্ত্তিতে দংষ্ট্রাঘাতে তাহাকে বধ করেন। তজ্জন্য জ্যেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে বধ করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া অভিলষিত অমরবর প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার বরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ তাঁহার আজ্ঞাকারী ছিলেন। অমরত্ব লাভ করিয়া দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, মানব সকলকেই করতলগত করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর আর কেহ নাই, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। প্রহ্লাদ নামে তাঁহার একটী পুত্র জন্মে। পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমে যণ্ড ও অমর্ক নামে গুরুর নিকট প্রহ্লাদকে বিদ্যাভ্যাস করিতে দিলে, পুত্র ব্রহ্মবাচক-প্রণবনামে যে অক্ষর তাহাই শিখিলেন অন্য কিছু শিখিলেন না।

ইহাতে ষণ্ডামার্ক গুরু দুইটী, রাজা হিরণ্যকশিপুর নিকট অভিযোগ করিলেন যে, প্রহ্লাদ নারায়ণ ও হরি ব্যতীত আর কিছুই উত্তর দেয় না। তৎজ্জন্য পিতার ক্রোধে পড়িয়া প্রহ্লাদকে কত শাস্তি পাইতে হইল, তথাপি হরিনাম ত্যাগ করিলেন না। ভক্তবর প্রহ্লাদ হরিনাম করিয়া হলাহল পান করিয়াও জীবিত রহিলেন। জ্বলন্ত হুতাশনে, বিষ ভক্ষণে, অস্ত্রাঘাতে, হস্তীর পদতলে এবং সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াও বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু তাহার কিছুতেই জীবননাশ করিতে পারিলেন না। যখন প্রহ্লাদের জীবন কিছুতেই নষ্ট হইল না, তখন হিরণ্যকশিপু স্বয়ং খড়্গাঘাতে প্রহ্লাদের জীবনবধের নিমিত্ত "কোথায় তোর হরি" বলিয়া যেমন স্ফটিক স্তম্ভে খড়্গাঘাত করিলেন, অমনি স্বয়ং ভগবান্ হরি গোলকধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর নরসিংহরূপে হুঙ্কার করিতে করিতে দুর্দ্দান্ত হিরণ্যকশিপুর জীবন সংহার করিলেন। প্রহ্লাদ চরিত্র সকলেই জ্ঞাত আছেন বলিয়া বিশদরূপে তাহা আর বর্ণনা করিলাম না।

ভগবান্ নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া প্রহ্লাদকে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর এই সিংহাচলে আসিয়া ভগবান্ লক্ষ্মীর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ, জীবনের শেষভাগে আপন পুত্র হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপস্যার্থ এই সিংহাচলে আসিয়া নৃসিংহদেবের দর্শন লাভ করিলেন। তৎপরে মন্দির নির্ম্মাণ, নৈমিত্তিক পূজার বন্দোবস্ত ও ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। শেষে বহুদিনব্যাপি অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ পলায়ন করিলেন। শেষে দেবতার নিত্যসেবা বন্ধ হইল। ক্রমে পর্ব্বতোপরি স্থান সমূহ অরণ্যে পরিণত হইল। শেষে তাহা সিংহ ব্যাঘ্রাদি ও সর্পের আবাসভূমি হইয়া উঠিল। মন্দিরগাত্রে বল্মীকের স্তূপ হইল, সুতরাং ভগবান্ আবৃত হইয়া রহিলেন।

অনন্তর চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা ভারতে একছত্র রাজা হইলে ব্রহ্মার নিকট হইতে কামগমন নামে আকাশগামী বিমান প্রাপ্ত হন। একদা তিনি কৈলাসপুরী হইতে আসিবার কালীন উর্ব্বশীনাম্নী অপ্সরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তৎপরে উভয়ে কামগমনে আরূঢ় হইয়া দক্ষিণাভিমুখে বিহার করিতে যাত্রা করিলেন। শেষে তাঁহারা এই সিংহাচলে অবতীর্ণ হইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুরূরবা উর্ব্বশীকে বলিলেন, দেখ এই স্থানটী অতি মনোহর ও সুখপ্রদ, তোমাকে লইয়া এই স্থানে যাবজ্জীবন বাস করিব। তখন উর্ব্বশী বলিল, মহারাজ এস্থান পুণ্যভূমি, ভগবান্ শ্রীহরি এই পর্ব্বতে লক্ষ্মীর সহিত বাস করিতেছেন। ইহা প্রহ্লাদ প্রতিষ্ঠিত নৃসিংহক্ষেত্র। অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষবশতঃ এস্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে।

এতৎ শ্রবণে পুরূরবা হরির অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চিম বাহিনী গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। উভয়ে তথায় স্নান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। পরে বহু অন্বেষণেও ভগবানের কোন সন্ধান না পাইয়া কুশের উপর শয়ন করিয়া অনশনে শ্রীহরির চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিবসত্রয় অতিবাহিত হইলে চতুর্থ দিবসের প্রাক্কালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যে ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন "হে রাজন্ আমি তোমার অগ্রভাগে এই বল্মীক ঢিপির অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে আছি। আমাকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া বস্ত্রদ্বারা সজ্জিত করিয়া ষোড়শোপচারে আমার পূজা কর, তৎপরে চন্দন অনুলেপন দ্বারা আমার আপাদ মস্তক আবৃত কর, যাহাতে অপর সাধারণে আমাকে দর্শন করিতে না পায়। অদ্য অক্ষয় তৃতীয়া, প্রতি বৎসর এই দিবসে চন্দন-অনুলেপন খুলিয়া আমার মূর্ত্তি দর্শন করিলে ধর্ম্ম, অর্থ ও মনস্কাম সিদ্ধ হইয়া অন্তে মোক্ষ পাইবে। বৎসরে একদিন মাত্র উক্ত অক্ষয় তৃতীয়াতে আমাকে দেখিতে পাইবে। যদি কেহ অন্যদিন আমার বাক্য অবহেলা করিয়া

আমার মূর্ত্তি দেখিতে প্রয়াস পায় তাহা হইলে তাহার বংশ নাশ হইবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।”

অনন্তর রাজা উর্ব্বশীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিয়া, বলিতে লাগিলেন এখন কোথায় পঞ্চামৃত পাই। উর্ব্বশী তৎশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন ভগবান্ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার এই প্রীতিকর আদেশ ত্বরায় সম্পাদন করুন। আপনার মহিমা আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন। উর্ব্বশীর বাক্য শ্রবণে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আপন মহিমা স্মরণ করিবা-মাত্রই দেবতারা সহস্র ঘট দুগ্ধ লইয়া উপনীত হইলেন। তখন সকলে সেই বল্মীক স্তূপোপরি দুগ্ধ ঢালিতে ঢালিতে বল্মীক মাটী গলিয়া পদদ্বয় ব্যতীত ভগবান্ নৃসিংহদেবের প্রকৃতমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল। রাজা পদদ্বয় দেখিতে না পাইয়া চিন্তাতুর হইলে দৈববাণী হইল, “রাজন! তুমি মানব হইয়া মুনিগণারাধ্য আমার চরণ দেখিতে প্রয়াস পাইও না। অদ্য অক্ষয় তৃতীয়া, তুমি অভিষেক কর, আমার সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া স্নান ও পূজা সমাপন করিয়া সত্বর চন্দন অনুলেপনে আমার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত কর। পুনরায় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ঐরূপে আমার অর্চ্চনা করিয়া দর্শন লাভ করিবে; এবং অন্তিমে তোমার বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে।”

আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া রাজা ভক্তিসহকারে গঙ্গাজলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া ষোড়শ উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। সমস্ত দেবগণও বিবিধ উপকরণে তাঁহার পূজা করিলেন। তৎপরে চন্দন অনুলেপনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ভগবৎ আদেশ পালন করিলেন। রাজা তাঁহার নিত্য সেবার জন্য ব্রাহ্মণপল্লী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তদবধি তাঁহার যথানিয়মে পূজা হইয়া আসিতেছে এবং প্রতি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তাঁহার চন্দনলেপন খুলিলে আসল মূর্ত্তি দর্শনলাভ হয়। মুখটী সুবর্ণ নির্ম্মিত। আমরা তাঁহার এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্ত প্রহ্লাদকে স্মরণ করিয়া হরিনাম করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

তপনদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইবার বহুপূর্ব্বেই আমরা নরসিংহ-দেবকে প্রণামপূর্ব্বক সিংহাচল পর্ব্বত হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। সোপানের দুই পার্শ্বে অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ প্রভৃতি ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা পাইবার আশায় বসিয়া রহিয়াছে। একটী পাই পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। কালীঘাটের কাঙ্গালীর মত তাহারা পুনঃ পুনঃ দেহি দেহি করে না, তাহাদের কিছু কিছু দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া আমরা নিম্নে নামিয়া আসিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা নিম্নে অবতরণ করিলাম, কিন্তু উঠিবার সময় আমাদের দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। গাড়োয়ান আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা সম্মুখের হাটে একটু বিচরণ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। হাটে কেবল খাসীর মাংস, পলাণ্ডু, লশুন ও রম্ভা দেখিয়া এবং বিক্রেতাগণের জঘন্য সাঁওতালদিগের মত আকৃতি দেখিয়া কেমন রুচিবিকার হইল; আমরা কালবিলম্ব না করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী ঠিক সন্ধ্যার পরই টারনাস ছত্রে আসিয়া পৌঁছিল। আমি রাজন বাবুর বাটীতেই প্রীতিভোজ সমাপন করিয়া অদ্যকার মত শয়ন করিলাম। অতি প্রত্যূষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ছত্রবাটীতে আসিলাম। সকাল সকাল সকলে আহার করিয়া লইলাম। ম্যানেজারের উদারতার জন্য কিছু প্রণামি দিয়া আমরা ষ্টেশনে গমন করিলাম।

গোদাবরী জেলা।

পিঠাপুর দর্শনের নিমিত্ত প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে না যাইলে সুবিধা হয় না। কারণ ওয়ালটেয়ার হইতে মেলে যাইলে বা মান্দ্রাজ হইতে মেলে আসিলে এই স্থানে গাড়ী রাত্রেই পৌঁছে। আমরা ওয়ালটেয়ার হইতে বরাবর বেজওয়াড়া গিয়াছিলাম; কিন্তু বাটী ফিরিবার কালীন

গোদাবরীসঙ্গমে স্নান করিবার নিমিত্ত শ্যামলকোট হইয়া কোকনদায় গিয়াছিলাম। শ্রাদ্ধাদি করিবার নিমিত্ত অনেকে পিঠাপুরেও গিয়াছিলেন। এই গোদাবরী ডিষ্ট্রীক্টে যে কয়টী তীর্থ আছে তাহার বিষয় আমরা এই স্থানে অগ্রে বর্ণনা করিয়া পশ্চাৎ কৃষ্ণা জেলার বেজওয়াড়ার বিষয় বলিব।

গোদাবরী জেলার দ্রষ্টব্য তীর্থ—১ম পিঠাপুর বা পাদগয়া, ২য় শ্যামলকোট, ৩য় কোকনদা বা গোদাবরীসঙ্গমে কমলেকামিনী, ৪র্থ রাজমহেন্দ্রী, ৫ম গোদাবরী।

১ম—পিঠাপুর বা পাদগয়া।

পিঠাপুর শ্যামলকোটের পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেসন, ইহা একটী ক্ষুদ্র সহর। স্থানীয় লোকেরা পিঠাপুরম্ বলে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রায় সমস্ত স্থানের নামই অম্ ভাগান্ত, যেমন ভিজিগাপট্টম্, রায়পুরম্, সিংহাচলম্, কুম্ভকোণম্ ইত্যাদি। গয়াসুরের দেহ এতদূর বিস্তৃত যে গয়াতে তাঁহার মস্তক, বিরজাক্ষেত্রে নাভি এবং এই পিঠাপুরে তাঁহার চরণ অবস্থিত। তজ্জন্য গয়ার নাম শীর্ষগয়া, বিরজাক্ষেত্র নাভিগয়া এবং পিঠাপুর পাদগয়া। এই স্থানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিতে হয়। তথায় একটী বিষ্ণুমন্দির ও একটী ক্ষুদ্র জলাশয় আছে তাহাতে পিণ্ডদান করে। এই জলাশয়ই পাদগয়া। এখানে পাণ্ডার বিশেষ জুলুম নাই। পিঠাপুরের জমিদারগণ পূর্ব্বে বর্দ্ধিষ্ঠ লোক ছিলেন। সময়ে সময়ে রাজা উপাধিও গ্রহণ করিতেন। মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অনেক বার অস্ত্রধারণও করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছেন। তথাচ তাঁহারা রাজানামে খ্যাত। এখানে ধর্ম্মশালা ও একটী খাল আছে। প্রতি সপ্তাহে একটী পশু বিক্রয়ের হাট হইয়া থাকে।

২য়—শ্যামল কোট্।

পাদগয়ায় যেমন বিষ্ণু মন্দির আছে, তেমনি খালের পরপারে শ্যামল কোট্ ষ্টেশনের অৰ্দ্ধ মাইল দূরে ভীমেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। খালের পরপারে অৰ্দ্ধ মাইল দূরে কুমার আরামে এই ভীমেশ্বর লিঙ্গ বিদ্যমান। দেবালয়টী অতিবৃহৎ চতুৰ্দ্দিকে নারিকেল প্রভৃতি ফলের উদ্যান, পূর্ব্বদিকে বাঁধান একটী পুষ্করিণী। মন্দিরাভ্যন্তরে লিঙ্গের আকার অতি বৃহৎ ও উচ্চ দেখিলাম। দ্বিতল ভেদ করিয়া উপরে দুই ফিট জাগিয়া আছে। পুরোহিত দ্বিতলে বসিয়া লিঙ্গের পূজা ও অভিষেক করিয়া থাকেন। অভিষেকের সুবিধার জন্য মন্দির দ্বিতলরূপে নির্ম্মিত। তেলেগু অক্ষরের অনুশাসন দৃষ্টে জানা যায়, ইহা প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পীঠাপুরের পরবর্ত্তী ষ্টেশন শ্যামলকোট। শ্যামলকোট একটী জংসন ষ্টেশন, এই স্থান হইতে কোকনদা যাইবার একটী ব্রাঞ্চ লাইন আছে।

৩য়—কোকনদা।

শ্যামলকোট হইতে গাড়ী বদল করিয়া আমরা রাত্রি ৪টার সময় কোকনদা পোর্ট ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। চারি আনায় একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া হইল। ভোররাত্রে আমরা একটী ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম, সেখানে কতকগুলি পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানী শয়ন করিয়া ছিল। আমরা যাওয়াতে তথাকার দ্বারবান ব্যস্তভাবে আমাদের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। সেই ভোরের সময় আমরা একটু নিদ্রা যাইলাম। সকালে উঠিয়া সহরের চারিদিকে একটু বেড়াইলাম। সহরটী নিতান্ত মন্দ নহে, গোদাবরী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারি এই স্থানে আছে; কিন্তু সবকলেক্টর, ডিষ্ট্রীক্ট জজ, মুন্সেফ প্রভৃতি রাজমহেন্দ্রীতে থাকেন।

কোকনদা—গোদাবরীর পোল।
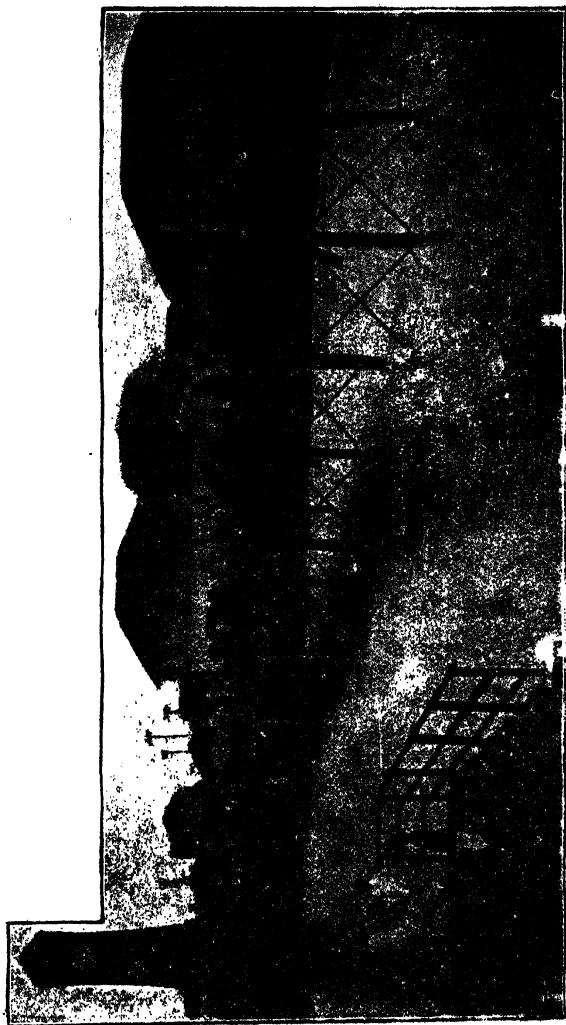
গোদাবরী নদী পশ্চিমঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে সপ্তধা বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে। ইহার এক শাখা কোকনদায় মিলিত হইয়াছে। কথিত আছে এই গোদাবরী-সঙ্গমে শ্রীমন্ত সিংহলে যাইবার সময় কমলে-কামিনী দর্শন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এই কোকনদাই কমলে-কামিনী তীর্থ।

কমলে-কামিনী।

আমরা এই গোদাবরী সাগরসঙ্গমে স্নান করিবার জন্য দুই খানি গরুর গাড়ী ২৲ টাকা দিয়া ভাড়া করিলাম। বাসা হইতে সঙ্গমস্থান প্রায় এক ক্রোশ হইবে। গাড়ীতে যাইতে যাইতে সহরের অনেক স্থান দেখিলাম। গোদাবরী হইতে একটী খাল এই কোকনদা দিয়া বহিয়া যাইতেছে। পার্শ্বে একটী (Clock Tower) ক্লক্‌টাওয়ার ও সেতু বিদ্যমান। Clock Towerটী অতি উচ্চ ও সুন্দর, তখন এই টাওয়ারে বেলা ৯টা বাজিল। এই স্থানের একটী সুন্দর প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। পার্শ্বে খালের জলে কত নৌকা ও বজরা শোভা পাইতেছে। ধান্য, চাউল, দাউল, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা বজরা বোঝাই হইতেছে। কোন স্থানে কুলীগণ নৌকা বোঝাই দিতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা সেতুর উপর দিয়া কতদূর যাইয়া একটী সুন্দর সরোবর দেখিলাম। তাহাতে সমস্ত সরোবর ব্যাপিয়া অসংখ্য রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। মনে করিলাম, এই কমল বনেই বুঝি মা কমলে-কামিনী শ্রীমন্তের মনসাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ক্রমে আমরা সাগরসঙ্গমে উপনীত হইলাম। গোদাবরীর গৌতমী শাখা যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে, তথায় শ্রীমন্ত জগজ্জননী কমলে-কামিনীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। আমরা বেশী দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া যথাসম্ভব নাভি পর্য্যন্ত জলে অবতরণ করিয়া স্নান

করিলাম। সেই স্থানের অনতিদূরে সমুদ্র তরঙ্গের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া মনে আনন্দ হইতে লাগিল। কিন্তু সাহস নাই যে ততদূর গমন করি। আমরা যেখানে স্নান করিলাম তথায় তরঙ্গের উপদ্রব নাই। অধিকন্তু স্থানে স্থানে চড়া, ও জলের বেশী স্রোত বা টান নাই। আমার জ্যেষ্ঠমাতা ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী এবং অন্য সহযাত্রী স্ত্রীলোকগণ এই স্থানে সতণ্ডুল থাল ও গেলাস উৎসর্গ করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর সঙ্গে ছিলেন সুতরাং মন্ত্র বলাইবার ভাবনা নাই।

তরঙ্গায়িত সঙ্গম স্থলে মা কমলে-কামিনী শ্রীমন্তকে দর্শন দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল চড়ায় পূর্ব্বে কমল বন ছিল, কারণ এই স্থানের জল পুষ্করিণীর মত পঙ্কিল। জোয়ারের সময় সমস্ত স্থান ডুবিয়া যায়, আর ভাঁটার সময় অনেক স্থান জাগিয়া উঠে। কোকনদ অর্থে পদ্ম, এই কারণেই এই স্থানের নাম কোকনদা হইয়াছে। উচিৎ ছিল কোন ধনীব্যক্তির এই স্থানে একটী মন্দিরে কমলে-কামিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু সে উদ্যোগ কে করিবে? মন্দির পরিবর্ত্তে দেখিলাম—যে জল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী কুটিরে কতকগুলি নুড়ি ফুল দিয়া সজ্জীকৃত করিয়া একজন মান্দ্রাজি ব্রাহ্মণ দুই এক পয়সা আদায় করিতেছে। ইচ্ছা ছিল এখানে আসিয়া মন্দিরে মাকে দর্শন করিব কিন্তু সে সাধ মনেই রহিল।

যাহা হউক সকলে স্নান করিয়া পুনরায় গাড়িতে উঠিয়া বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে তরি তরকারি সমস্ত মিলে এবং কলিকাতা হইতে অনেক সুলভ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হাঁড়ী মিলে না। আজ হাট বার তাই হাটে হাঁড়ী পাইলাম। নচেৎ হাঁড়ী অভাবে বড়ই কষ্ট হইত। হাটে বেশীর ভাগ মুরগী বিক্রয় দেখিলাম। এখানে বিশেষ কোন তীর্থ নাই কেবল স্নানমাহাত্ম্য ও স্নানের জন্য অনেকে এইস্থানে আসিয়া থাকেন।

৪র্থ—রাজমহেন্দ্রী।

ইহা গোদাবরী জেলার প্রধান নগর; এইস্থান হইতে সমুদ্র ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। গোদাবরী নদী এখান হইতে দুই মাইল মাত্র। গোদাবরী স্নানের জন্য পূর্ব্বে সকলেই এই রাজমহেন্দ্রী ষ্টেশনে অবতরণ করিতেন। এক্ষণে সকলকার সুবিধার জন্য ঠিক গোদাবরী নদীর উপর গোদাবরী ষ্টেশন হইয়াছে। তজ্জন্য সকলে এক্ষণে এই গোদাবরী ষ্টেশনে নামিয়া থাকেন। যেখানে রাজমহেন্দ্রী ষ্টেশন, সেস্থানটা সহর নহে, সেখান হইতে সহর এক মাইল মাত্র। আদালত, কাছারী ও স্কুলবাটী এইস্থানে আছে।

রাজমহেন্দ্রী রাজধানী হইলেও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কোকনদায় থাকেন। অন্যান্য আদালত ও ডিষ্ট্রীক্টজজ এইস্থানে থাকেন। কোটী-লিঙ্গ মহাদেবের মন্দির গোদাবরী-তীরে এই রাজমহেন্দ্রীতে অবস্থিত। এইস্থানে একটী ভূগর্ভস্থ পাহাড় গোদাবরী নদীর ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, রাজমহেন্দ্রীকে কাশীর মত পুণ্যভূমি করিবার অভিপ্রায়ে কোন হিন্দুরাজা কোটী-লিঙ্গ স্থাপনের ইচ্ছায় উক্ত পর্ব্বত-মালায় লিঙ্গ কাটাইয়া প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলে, দেবগণ একটী লিঙ্গ অপহরণ করিয়া রাজার উদ্দেশ্য বিফল করেন। লিঙ্গ অপহৃত হওয়াতে রাজমহেন্দ্রী কাশীর মত পুণ্যভূমি হইল না। কালের করাল-গ্রাসে অনেক লিঙ্গ এক্ষণে গোদাবরী গর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছেন। গোদাবরী জেলাতে ছোট বড় অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে ৫টী প্রধান। ১ম পাদগয়া, ২য় ভীমেশ্বর, ৩য় কোটী-লিঙ্গ, ৪র্থ কোটীফলী, ৫ম দ্রাক্ষারামা। প্রথম ৩টীর বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্ট দুইটীর বিষয় বলা হইতেছে।

কোটীফলী।

রাজমহেন্দ্রী ও করিঙ্গ-নামক বন্দরের মধ্যস্থলে গোদাবরীর গৌতমীশাখা নদীর বামতীরে কোটীফলী তীর্থ আছে। এইস্থানে শিবলিঙ্গ আছেন। ইহার অপর নাম বিমাতৃ-গমনোপহারী। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর অন্তর বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে গমন করিলে গৌতমীতীরে কোটীফলীতে পুষ্কর যোগ হইয়া থাকে। তৎকালে এই স্থানে স্নান করিলে ভারতের সর্ব্বতীর্থে স্নানের ফললাভ হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঐ সময়ে দেবতারাও এই স্থানে স্নান করিয়া থাকেন।

দ্রাক্ষারামা।

এখান হইতে ৭ মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে সুবিখ্যাত দ্রাক্ষারামা স্মার্ততীর্থ বিদ্যমান। অনেকে গোদাবরী ষ্টেশনে নামিয়া নৌকাযোগে তথায় গিয়া থাকেন। এখানকার শিবলিঙ্গ অতি বৃহৎ দ্বিতল ভেদ করিয়া প্রায় ২ ফিট্ উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। ভীমেশ্বরের মত ইহাও দ্বিতল মন্দির। পুরোহিত দ্বিতলে বসিয়া জলাভিষেক করিয়া থাকেন।

৫ম—গোদাবরী।

ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে আনয়ন করেন তদ্রূপ গৌতম মুনিও গঙ্গাকে পুনরায় আনয়ন করেন বলিয়া গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী। ইহাতে স্নান করিলে স্বর্গ-প্রাপ্ত হয় বলিয়া গোদাবরী (গাং স্বর্গং দদাতীতি গোদা, তাসু বরী শ্রেষ্ঠা) নাম হইয়াছে। পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে ইনি উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে সপ্তমুখী হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছেন। দৈর্ঘ্যে ৮৯৮ মাইল। গোদাবরী সপ্তধা বিভক্ত হইয়া যে সপ্তমুখী হইয়াছেন তাহার নাম—তুল্যা, আত্রেয়ী, ভারদ্বাজী, গৌতমী, বৃদ্ধগৌতমী, কৌশকী ও বশিষ্ঠা।

গোদাবরী ধবলেশ্বর হইতে ২য় ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছেন। উত্তর ভাগের স্রোত গৌতমী—ইহা হইতে তুল্যা, আত্রেয়ী ও ভারদ্বাজী এই তিনটী শাখানদী হইয়াছে। দক্ষিণদিকের স্রোত বশিষ্ঠা—ইহা হইতে বৃদ্ধ গৌতমী ও কৌশিকী এই দুইটী শাখানদী হইয়া সপ্ত গোদাবরী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বঙ্গদেশে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম যেমন পুণ্য-তীর্থ, দাক্ষিণাত্যে তেমনি সপ্ত-গোদাবরী সাগরসঙ্গম পুণ্যতীর্থ।

গোদাবরীর উৎপত্তি কারণ।

কোন সময়ে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হওয়ায় সর্ব্বত্র অন্নাভাব হয়। তখন বশিষ্ঠ প্রভৃতি অন্যান্য ঋষিগণ গৌতমের আশ্রমে আতিথ্য-গ্রহণ করেন। গৌতম ঋষি তখন ব্রহ্মগিরির আশ্রমে তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যহ স্বয়ং ক্ষেত্রে বীজবপন করিয়া পূজায় বসিতেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে সেই বীজ হইতে অঙ্কুর, গাছ ও ফল হইয়া তৃতীয় প্রহরে শস্য পাকিত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই ধান্যে উত্তম তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া সকলকে খাওয়াইতেন! এইরূপে দ্বাদশ বর্ষকাল তিনি ঋষিগণকে অন্ন-প্রদান করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে কৈলাসশিখরে মহাদেব সর্ব্বদা গঙ্গাকে জটায় রাখিতেন বলিয়া, দুর্গা ঈর্ষান্বিতা হইয়া মহাদেবকে অনুরোধ করিলেন, যে তুমি আমাকে উরুদেশে ধারণ করিয়া গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছ। ইহা আমার অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছে। সুতরাং গঙ্গাকে মস্তক হইতে দূর করিয়া দেও কিন্তু মহাদেব তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এই জন্য পার্ব্বতী গণেশকে নিজ দুঃখ নিবেদন করিলে তিনি মাতৃ-দুঃখে দুঃখিত হইয়া অনুজ ষড়াননের সহিত পরামর্শ করিয়া গৌতম মুনির আশ্রমে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপনীত হইলেন। তথায়

তাঁহারা বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণগণ, এখন আর অনাবৃষ্টি নাই, সর্ব্বত্র সুশস্য জন্মিয়াছে, সুতরাং তোমরা কেন আর বৃথা গৌতম মুনির গলগ্রহ হইয়া আছ; এক্ষণে স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান কর।"

তখন সমস্ত ঋষিগণ গৌতমের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। এই কথা শুনিয়া গৌতম মুনি বলিলেন, ঋষিগণ! তোমাদিগকে আপৎ-কালে অন্ন দিয়াছি, এখন বসুন্ধরা শস্যশালিনী বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করা উচিৎ নহে। আমি তোমাদিগকে এখন যাইতে দিব না, আমার আশ্রমে কালাতিপাত কর। ঋষিগণ তখন নিরুপায় হইয়া ব্রাহ্মণ-বেশধারী গণপতি ও কার্ত্তিককে বলিলেন যে আমাদের এই স্থানেই থাকিতে হইবে, তিনি ছাড়িতেছেন না। ইহা শুনিয়া গণেশ, কার্ত্তিককে বলিলেন, ভাই যে প্রকারে হউক মাতৃদুঃখ দূর করিতে হইবে। গঙ্গাকে ভগীরথের মত পুনরায় মর্ত্ত্যে না আনিলে মার দুঃখ দূর হইবে না। এই গৌতমই তপঃপ্রভাবে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে নচেৎ অন্যের দ্বারা অসম্ভব। সুতরাং গঙ্গা আনয়নের একটা কারণ নির্দ্দেশ না করিলে তিনি একার্য্যে সম্মত হইবেন না। এই বলিয়া তিনি কার্ত্তিককে বলিলেন, ভাই তুমি গাভীরূপ ধারণ করিয়া গৌতমের ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য নষ্ট করিতে আরম্ভ কর। ইহা দেখিয়া যখন গৌতম তোমাকে তাড়না করিবেন, তুমি অমনি মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে। তাহা হইলে গৌতম গো-হত্যা করিয়াছে শুনিয়া আর কোন ঋষি তাঁহার আশ্রমে আহার করিবেন না, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গঙ্গা আনয়ন করিতে হইবে।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, কার্ত্তিক গাভীরূপ ধারণ করিয়া গৌতমের সমস্ত শস্য নষ্ট করিতে থাকিলে ঋষিবর গাভীকে যেমন তাড়না করিলেন, গাভীও তৎক্ষণাৎ মৃতবৎ পতিত হইল। আশ্রমে গো-হত্যা হইয়াছে শুনিয়া সমস্ত ঋষিগণ পলায়নপর হইলেন। গৌতম মুনি

তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলে সকলে বলিতে লাগিলেন যে, আপনি তপঃপ্রভাবে প্রত্যহ শস্য উৎপন্ন করিয়া যেমন আমাদের জীবনদান করিতেছেন, তদ্রূপ এই গাভীর প্রাণদান করুন। তাহা হইলে আমরা আর এস্থান পরিত্যাগ করিব না। তখন বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপী গণেশ গৌতমকে বলিলেন যে, আপনি হরশিরবিহারিণী গঙ্গাকে এখানে আনয়ন করিলে এই গাভী গঙ্গাবারি স্পর্শে জীবিত হইবে। সুতরাং আপনি যদি গো-হত্যাজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চান, তাহা হইলে ভগীরথের মত গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করুন।

তখন গৌতম ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইয়া সেই ব্রাহ্মণবেশধারী গণপতিকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণগণকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তৎপরে তিনি ত্র্যম্বক পাহাড়ে গমন করিয়া ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবের তপস্যা করিতে লাগিলেন। দেবাদিদেব গৌতমের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বৃষভবাহনে তৎসমীপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। তখন মুনিবর প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। ত্র্যম্বকেশ্বর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন বৎস! তুমি বর প্রার্থনা কর। গৌতম কহিলেন হে ভগবন্! আপনার জটাস্থিত গঙ্গাকে প্রদান করুন। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া পুনরায় দ্বিতীয় বর লইতে বলিলেন। তখন গৌতম বলিলেন ভগবন্! এই গঙ্গা যেন আমার নামে বিখ্যাত হয়। ৩য় বরে গৌতম বলিলেন উহার উভয় তীর পূর্ণতীর্থ হউক এবং উভয় তীরে আপনি লিঙ্গরূপে সর্ব্বত্র অবস্থান করুন। তখন মহাদেব তথাস্তু বলিয়া জটা হইতে গঙ্গাকে প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এখানে গঙ্গা ত্রিধারা হইয়া এক ধারা ব্রহ্মগিরির গৌতম-আশ্রমের উপর দিয়া প্রবাহিত হইল। অপর ধারা ব্রহ্মগিরি ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। তৃতীয় ধারা আকাশে বিয়ৎগঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হইল। কলির পাপে উক্ত ধারা মানবের অদৃশ্য।

গৌতম মুনি প্রীতমনে আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন যে, গঙ্গাবারি স্পর্শে গাভী পুনর্জ্জীবিত হইয়া বিচরণ করিতেছে। তখন ঋষিগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে গঙ্গায় স্নান করিতে লাগিলেন। এ দিকে সপত্নী বিতাড়িত হওয়ায় দুর্গাদেবী প্রসন্নমনে গণেশকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। যে স্থানে এই ঘটনা হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি "কচুর" নামে প্রসিদ্ধ। ইহা গৌতমী শাখার পশ্চিম পারে রাজমহেন্দ্র-বরমের সম্মুখে অবস্থিত। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে তথায় ভাঁঙ্গণমাটী পড়িলে গোক্ষুরের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। গৌতম মুনি এই গোদাবরী গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম গৌতমী-গঙ্গা হইয়াছে।

যাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া কোকনদায় গমন করিতে না পারিবেন, তাঁহারা গোদাবরী ষ্টেশনে নামিয়া স্নানাদি করিতে পারেন। কমলে-কামিনীর জন্য কোকনদায় স্নান-মাহাত্ম্যহেতু অনেকে গমন করেন বটে, কিন্তু তথায় সঙ্গমস্থলের জল কর্দ্দমযুক্ত সুতরাং স্নানের উপযুক্ত নহে। যাহা হউক গোদাবরী অতি পবিত্র ও গঙ্গার মত পুণ্যতোয়া। কারণ শাস্ত্রে বলিতেছে,—

ব্রহ্মহত্যাদি-পাপানি বহুজন্মার্জ্জিতান্যপি।
স্নাত্বা তত্র বিমুচ্যেত সদৈব তু ন সংশয়ঃ॥

বেজওয়াড়া।

গোদাবরী জেলা অতিক্রম করিয়া এই বার আমরা কৃষ্ণা জেলায় উপনীত হইলাম। বেজওয়াড়াই এখানকার প্রধান নগর। আমরা ভোর ৫টার সময় এই ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানে প্রায় তিনদিকেই নাতি-সমুচ্চ শৈলমালা বিদ্যমান। এক দিকের পর্ব্বতশৃঙ্গে একটী বৃহৎ বাঙ্গলা

দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাতে একটী পাদরী বাস করেন। এই পাহাড়ের নাম ইন্দ্রকীলাদ্রি। ইহার উপত্যকা ভূমিতে বিজয়বাড়া বা বেজওয়াড়া নগর। বেজওয়াড়া একটি জংসন ষ্টেশন। এই স্থান হইতে একটী লাইন মাদ্রাজ অভিমুখে গিয়াছে। সেটী ঈষ্টকোষ্ট লাইন আর একটী সাদার্ণ মারহাট্টা লাইন। আমরা সত্বর মুটের মস্তকে দ্রব্যাদি দিয়া ষ্টেশনের অতি নিকটস্থ এক ধর্ম্মশালায় আসিলাম।

কলিকাতায় কোন লোক অন্য দেশ হইতে আসিলে থাকিবার স্থানের অভাবে কত বিব্রত হইতে হয়, কিন্তু কলিকাতা ছাড়া যেখানে যাও সেই স্থানেই ধর্ম্মশালা, ছত্র, অতিথিশালা প্রভৃতি বর্ত্তমান। এই অতিথিশালার দ্বারবান অতি ভদ্র। আমরা যাইবামাত্র নীচের কতকগুলি ঘরের মধ্যে এক খানি ঘর লইতে বলিল। আমরা সম্মুখের এক খানি ঘরে দ্রব্যসম্ভার রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় উপরের ঘরখানি খালি হইল। তখন দ্বারবান ব্যস্ততা সহকারে আমাদের উপরের ঘরখানিতে লইয়া গেল। আমরা সেই ঘরেই বাসা পাইলাম। ঘরখানি সাহেবী ধরণের ম্যাটিং করা ও নানাবিধ ছবিতে সজ্জীকৃত। আমাদের সঙ্গী স্ত্রীলোকগণ ও পুরোহিত মহাশয় এই সাহেবী ধরণের গৃহে আশ্রয় পাইয়া মহাপুলকিত হইলেন। ধর্ম্মশালা-বাটীর প্রাঙ্গণভূমিতে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি বাদামবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র মন্দিরে নরসিংহমূর্ত্তি বিরাজমান। এই বাটীতে কতকগুলি জলের কল আছে। যাত্রীগণ এই কলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া থাকে, এই জল কৃষ্ণা নদী হইতে আসিতেছে।

কৃষ্ণানদী।

বাসায় কুলুপ দিয়া আমরা স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিয়া কৃষ্ণা নদীতে স্নানার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলাম। বাসা হইতে নদী ৫ মিনিটের পথ।

বেজওয়াড়ার দক্ষিণদিকে এই বৃহৎ বেগবতী নদী প্রবাহিত। কৃষ্ণা দেখিতে গঙ্গার মত এবং তীর্থ হিসাবে গঙ্গার মত পুণ্যপ্রদ। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে গঙ্গার মত ভক্তি করে। কারণ এই নদী বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা। যথা,—

আদ্যা গোদাবরী গঙ্গা দ্বিতীয়া চ পুনঃ পুনা।
তৃতীয়া কথিতা রেবা চতুর্থী জাহ্নবী স্মৃতা॥
কাবেরী গৌতমী কৃষ্ণা ব্রাহ্মণী বৈতরণী তথা।
বিষ্ণু পাদাব্জ সম্ভূতা নবধা ভূবি সংস্থিতা॥

সুতরাং কৃষ্ণা যে বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে স্নান ও পূজা করিবার জন্য তদ্দেশীয় গরিব মহিলাগণ একখানি ছোট কুলায় করিয়া রুলি, সিন্দূর, পুষ্প প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে।

আমরা নদীর তীরবর্ত্তী হওয়াতে মহিলাগণ পুষ্পপূর্ণ কুলাহস্তে ছুটিয়া আসিল এবং সকলেই পুষ্পমাল্য বিক্রয়ের জন্য নিজ নিজ কুলা সম্মুখে ধরিল। তাহারা এই কৃষ্ণানদীকে গঙ্গামাই বলে। ভুলিয়াও কেহ কৃষ্ণা নাম করিল না। আমরা প্রত্যেকের নিকট হইতে এক এক পয়সা দিয়া রুলি, সিন্দুর ও পুষ্প এই তিন রকম দ্রব্য ক্রয় করিয়া কৃষ্ণানদীর অর্চ্চনা করিলাম। ঘাটের উপর তদ্দেশীয় মহিলাগণ বস্ত্র-ধৌত করিতেছে। তাহাদের বস্ত্র তাড়নের শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়। সারি সারি ভাবে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রমাগত বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য প্রস্তরের উপর আছাড় দিতেছে। দেখিলে মনে হয়, যেন সে দেশে রজকের প্রথা নাই। প্রায় সকল স্থানেই এই বস্ত্র-ধাবন ব্যাপার। তজ্জন্য স্নানের একটু ফাঁকা জায়গা পাইবার আশা অতি অল্প। তাহাদের নিবৃত্ত হইতে বলিলেও নিবৃত্ত হয় না। কথাই বুঝে না, তা নিবৃত্ত হইবে কি? উহাদের মধ্যে একটু স্থান ঠিক করিয়া সকলে জলে নামিলাম।
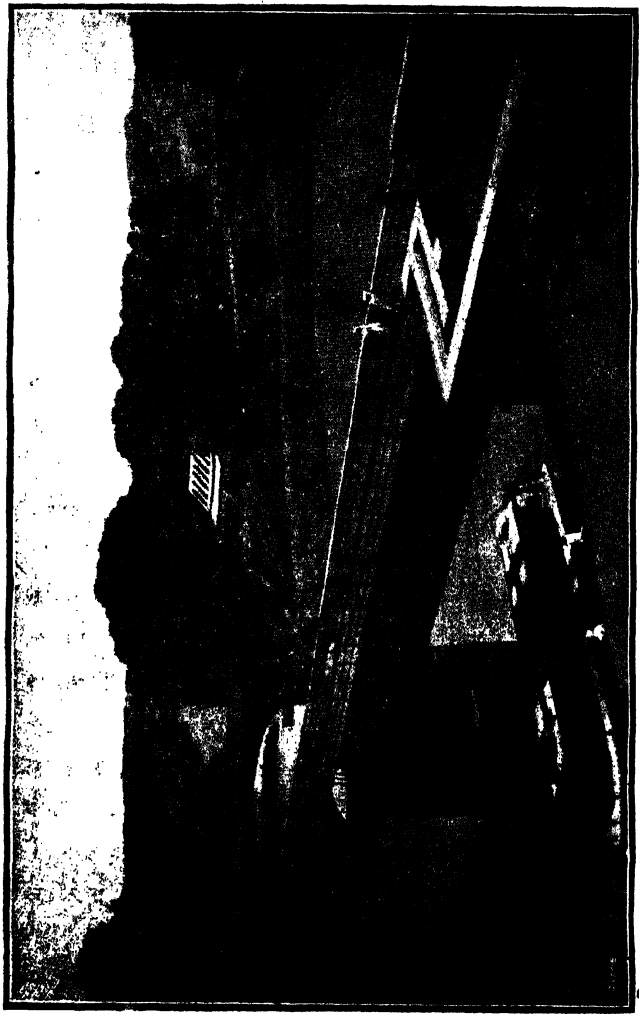
কৃষ্ণা নদীর পোল। (১৪৯ পৃঃ।)

গঙ্গার মত দীর্ঘায়তন বিশিষ্টা কৃষ্ণা নদীকে দেখিলে মন স্বতই আনন্দ ও ভক্তি রসে পূর্ণ হয়। চতুর্দ্দিকে নৌকা ও ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে। জলের মধ্যে স্থানে স্থানে পর্ব্বতপুঞ্জ দেখিয়া মনে হয় যেন উচ্চ উচ্চ দ্বীপশ্রেণী শোভা পাইতেছে। জলে নানাবিধ মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। তন্মধ্যে ছোট ছোট চিংড়ি মৎস্যগুলি আমাদের পাদদেশে ক্রমাগত কামড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণানদীর উভয় তীরে পর্ব্বত থাকাতে উহার পরিসর ৩৮৬০ ফিট্ মাত্র। এই নদী বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। বেজওয়াড়াতে এই কৃষ্ণানদীর জলই সর্ব্বত্র পাইপযোগে পানার্থ ব্যবহৃত হয়।

.৮৭২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণাজেলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে দুই কোটি সাতাশ লক্ষ টাকা রাজস্ব নষ্ট হয়। এই নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট কৃষ্ণা নদীতে আনিকট বাঁধিয়া উভয়তীরে ইরিগেসন অর্থাৎ জলসেচন এবং নেভিগেসন অর্থাৎ নৌকাচালন কার্য্যের উপযোগী পঃপ্রণালী কাটিয়া কৃষিকর্ম্মের সুবিধার নিমিত্ত ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তাহার কার্য্য আরম্ভ করেন। সেই সময় তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা ব্যয়ে কৃষ্ণানদীর উপর সুন্দর সেতু নির্ম্মিত হয়। এই সেতুর উপর দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করিতেছে দেখিলাম। এই নদীর উপরে রেলওয়ে সেতুর একটী ছবি প্রদত্ত হইল। গবর্ণমেণ্ট কৃত কেনাল বা খাল এই কৃষ্ণানদী হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে এই জলপথে যাত্রিগণ রাজমহেন্দ্রী হইতে বেজওয়াড়ায় গমনাগমন করিত। এক্ষণে রেলপথের সুবিধা হওয়ায় আর কষ্টভোগ করিতে হয় না।

যাহা হউক আমরা এই নদীতে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হইলাম। তৎপরে সেই আর্দ্রবস্ত্রে কনকদুর্গা দেখিতে গমন করিলাম। নদী হইতে কনকদুর্গা অতি নিকটে। পাঁচ মিনিটের পথ মাত্র।

কনকদুর্গা।

ইন্দ্রকীলাদ্রি পর্ব্বতের পূর্ব্ব অংশে কনকদুর্গার মন্দির। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসিগণের এই দেবীর উপর প্রগাঢ় ভক্তি। নবরাত্রির সময় দশমীতে অতি সমারোহে কনকদুর্গার উৎসব হইয়া থাকে। আমরা ১৮৫টী প্রস্তর সোপান অধিরোহণ করিয়া কনকদুর্গার মন্দির পাইলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে কনকদুর্গা মূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ পুলকিত হইলাম না। কারণ দেবতার শ্রীও নাই অধিকন্তু স্বর্ণালঙ্কারও নাই, কিন্তু পরিধানের বস্ত্রখানি শুভ্র তাহাতে বেশ চওড়া জরীপাড়। তদ্ভিন্ন দেবতার বিশেষ কোন অলঙ্কার দেখিলাম না। কাণার নাম যেমন পদ্মপলাশলোচন, কালিন্দীর নাম যেমন সুন্দরী, তেমনি এই কনকদুর্গা। যাহা হউক দেবতার নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। দেবতা যাহাই হউক কিন্তু নামের অতটা জাঁক ভাল নয়।

কনকদুর্গার মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভোপরি কতকগুলি অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে। এই মন্দিরের সন্নিকটে ইন্দ্রকীলাদ্রির গাত্রে একস্থানে রাম রাবণের যুদ্ধ, অপর একস্থানে শক্তি দেবীর মূর্ত্তি, অন্য একস্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। তথায় একটী কূপ ও সন্ন্যাসীদিগের থাকিবার কয়েকটি ক্ষুদ্র গুহা আছে। কনকদুর্গা মন্দিরের উত্তরে পাহাড়ের উপর দুর্গা-মল্লেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত।

বেজওয়াড়ায় কৃষ্ণানদীর খালের আনিকট ও কপাটের কল বসাইবার সময় অনেক স্থলের মাটী কাটিতে হইয়াছিল। সেই সময় মাটীর ভিতর কয়েকটী কূপ, একটী প্রস্তরময় প্রাচীর এবং অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটী লিঙ্গের একদিকে ব্রহ্মা ও অন্য দিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নৃসিংহদেব ও

হনুমানের মূর্ত্তি, নন্দীর মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত অদ্যাপি লাইব্রেরী কম্পাউণ্ডে রক্ষিত হইয়াছে। বকিংহাম গেটে একটী যাদুঘর Museum আছে।

নগরটী পর্ব্বতের উপত্যকায় বলিয়া অতিশয় গরম। এখানকার জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর। এখানে চাষ-আবাদ বড় একটা নাই, অন্য স্থান হইতে ফসল আমদানি হইয়া থাকে। তজ্জন্য জিনিষপত্র বড় মহার্ঘ্য। কনকদুর্গা দেখিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন কালীন একটি বাজারে তরিতরকারি ক্রয় কালীন দেখিলাম জিনিসগুলি বড় মহার্ঘ্য। বেজওয়াড়ায় দুই দিবস ছিলাম। এই দুই দিবসের মধ্যে আমরা প্রথম দিন মঙ্গলগিরি দেখিতে গিয়াছিলাম।

মঙ্গলগিরি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বেজওয়াড়া একটী জংসন ষ্টেশন। সুতরাং যে লাইনটি ঘণ্টাকুল হইয়া মাইশোর অভিমুখে গিয়াছে সেই (Southern Marhatta Ry) লাইনে মঙ্গলগিরি নামক ৩য় ষ্টেশনে এক পর্ব্বতোপরি নৃসিংহদেবের মনোহর মন্দির আছে। বেজওয়াড়া হইতে মঙ্গলগিরির ভাড়া /৫ পাঁচ পয়সা মাত্র। ইহা কৃষ্ণাজেলার একটি প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ। আমাদের দলের ৯ জনের মধ্যে আমরা ৫ জন মাত্র মঙ্গলগিরি দর্শন করিতে যাই। বাকী সকলে বেজওয়াড়ার বাসাতে রহিলেন। বেলা ১২টার সময় গাড়ীতে উঠিয়া ৩টার সময় তথায় অবতরণ করি। ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে উক্ত মন্দির অবস্থিত। মঙ্গলগিরি দূর হইতে দেখিতে একটী হস্তীর ন্যায়।

আমরা কয়জন তথায় গমন করিয়া দূর হইতে মন্দিরের সুন্দর গোপুর দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলাম। গোপুর অর্থে লম্বাকৃতি কলস বিশিষ্ট উচ্চ তোরণ। দক্ষিণ দেশে যত মন্দির আছে সমস্ত মন্দিরের সম্মুখেই এইরূপ

সুন্দর সুদৃঢ় উচ্চ তোরণ বা গোপুর আছে। আমাদের এই প্রথম গোপুর দর্শন। যদিচ অন্যান্য গোপুর অপেক্ষা ইহা ছোট তথাচ ইহা প্রথমে দর্শন করিয়াছিলাম বলিয়া ইহাতেই আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। পর্ব্বতের পাদদেশে একটী বৃহৎ বিষ্ণুমন্দির। এই মন্দিরে পাহাড়ের উপর যে নৃসিংহ মূর্ত্তি আছেন ইহা তাঁহারই ভোগমূর্ত্তি। দেবতার উৎসবের সময় এই ভোগ মূর্ত্তির দ্বারা উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আমরা যখন তথায় পৌঁছাই তখন নৃসিংহদেবের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল। তজ্জন্য আমরা এই ভোগমূর্ত্তির মন্দিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে পূজারি ঠাকুর আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আরত্রিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। দক্ষিণ দেশে প্রত্যেক স্থানেই কর্পূরের আরতির বহুল প্রচার দেখিলাম। উক্ত প্রথানুসারে দেবতার কর্পূরের আরত্রিক হইল। আমরা প্রত্যেকে ৵০ আনা করিয়া দেওয়াতে আমাদের নাম ও গোত্র ধরিয়া পূজা করা হইল। তৎপরে তুলসীপত্রসহ দেবতার চরণামৃত প্রদান করাতে আমরা ভক্তিভরে তাহা পান করিয়া প্রণাম করিলাম। ভোগমূর্ত্তি দেখিতে সুবর্ণ-বর্ণ কিন্তু পিত্তল-নির্ম্মিত। দেবতার সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের স্তম্ভগাত্রে বেশ কারুকার্য্য আছে। বহিঃস্থ প্রথম প্রকোষ্ঠে স্তম্ভগাত্রে অনেকগুলি অনুশাসন খোদা রহিয়াছে। মন্দিরের দ্বারের নিকট একটী প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহের ভিতর ছয়টী চক্র-বিশিষ্ট একখানি সুবৃহৎ রথ দেখিলাম। ইহার কারুকার্য্য অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর। পুরীর রথের মত ইহাতে কোন অশ্লীল ছবি নাই। মন্দিরের ভিতর আমরা দুইটী বৃহৎ পিত্তলের সর্পমূর্ত্তি দেখিলাম। এই দেবালয় হইতে ৫০০ ফিট দূরে মহাদেবের একটী সুন্দর ছোট মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখস্থ পথটী পূর্ব্বে বাজারের দিকে গিয়াছে এবং পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে গিয়াছে। আমরা এইবার পর্ব্বতের উপরে উঠিবার নিমিত্ত ঐ পথ ধরিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলাম।

তৎপরে পাহাড়ে উঠিবার সুন্দর সোপান দেখিয়া সকলে তাহাতে উঠিতে লাগিলাম। ঐ সকল ধাপের গাত্রে ইংরাজী সংখ্যা খোদিত রহিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৪০৯টী ধাপ আছে। কিয়দ্দূর উঠিয়া সকলে বলিতে লাগিল ইহা দ্বিতীয় হীমাচল। যাহা হউক কায়ক্লেশে উপরে উঠিয়া মন্দিরে পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে অন্যদিকে নামিতে আরও ৩৫০টী ধাপ আছে। এই মন্দির পাহাড়ের মধ্যস্থলের পাথর কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মূর্ত্তি পাহাড়ের গাত্রে যেন সংলিপ্ত, কেবলমাত্র পিত্তল নির্ম্মিত সিংহাকৃতি মুখটী যেন বাহির হইয়া আছে। ভগবান নৃসিংহ-দেবের ভয়ঙ্কর সিংহবদন দেখিয়া যেন ভয়ের সঞ্চার হয়। ইনি গুড়ের পানা পান করিয়া থাকেন। যুগভেদে ইহাঁর নামেরও প্রভেদ হইয়াছে। ত্রেতাযুগে ইহাঁর মুক্তাদ্রি, দ্বাপরে ধর্ম্মাদ্রি এবং কলিতে মঙ্গলাদ্রি নাম হইয়াছে। ইনি সত্যযুগে অমৃত, ত্রেতায় ঘৃত, দ্বাপরে দুগ্ধ, ও এই কলিকালে গুড়ের সরবৎ পান করেন। ইহাকে পানা বলে। লোকের মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে এইস্থানে গুড়ের পানা মানসিক দিয়া থাকে। মানসিকের মূল্য অর্চ্চক হস্তে প্রদান করিলে পূজারি সেই পরিমাণে গুড়ের পানা প্রস্তুত করিয়া কুশি করিয়া ভগবান নৃসিংহদেবের বদনে দিতে থাকেন। ভগবানের এমনি মহিমা, যে যত পরিমাণ পানা হউক না কেন, তাহার অর্দ্ধেক প্রসাদ ভক্তের জন্য রাখিয়া দেন। এক কলসি পানা দিলে তাহারও অর্দ্ধেক থাকিবে আর দশ কলসি দিলেও তাহারও পাঁচ কলসি প্রসাদরূপে পড়িয়া থাকিবে। এক সময়ে শত শত যাত্রী উপস্থিত হইলেও তিনি সকলের পানা পান করিয়া প্রায় অর্দ্ধেকটা রাখিয়া দেন। সেই স্থানে একটী বিশেষ আশ্চর্য্য দেখিলাম, যে প্রত্যহ তথায় এত পানা পড়িয়া থাকে যে তাহা প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি উচ্চ হইয়া উঠে। এত গুড়ের গন্ধ কিন্তু তথায় একটীও মক্ষিকা দৃষ্টিগোচর হইল না। মাঘ মাসের শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত

পঞ্চ দিবসব্যাপি উৎসব হইয়া থাকে। প্রথম একাদশীর দিবস গরুড় বাহনোৎসব, দ্বাদশীতে রাজাধিরাজ উৎসব, ত্রয়োদশীতে গজবাহনোৎসব, চতুর্দ্দশীতে শেষবাহনোৎসব এবং পূর্ণিমাতে পুনরায় গরুড়বাহনোৎসব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ফাল্গুন মাসে শুক্ল সপ্তমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত কল্যাণ-উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের সময় বহুদূর হইতে যাত্রীদের সমাগম হয়।

এই পর্ব্বতের পৌরাণিক বিবরণ এই—কোন এক ঋষিতনয় পিতৃভয়ে হস্তিরূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে বিষ্ণুর তপস্যা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু প্রত্যক্ষ হইয়া বর দান করিলে ঋষিপুত্র তাঁহাকে নিজ শরীরের উপর অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু কহিলেন তোমার এই হস্তিদেহ পর্ব্বতে পরিণত হইলে আমি অবস্থিতি করিব। তখন ঋষি-পুত্রের শরীর পর্ব্বতে পরিণত হইল। কিয়ৎকাল পরে নমুচি নামক অসুর উক্ত পর্ব্বতে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। তখন ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু ফেন নিক্ষেপ পূর্ব্বক উক্ত নমুচিকে বধ করিয়া ঋষিপুত্রের হস্তিরূপ দেহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা ত্রেতাযুগে ঘটিয়াছিল। তজ্জন্য সকলের বিশ্বাস যে ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহ মূর্ত্তিতে এই পর্ব্বতোপরি সেই অবধি অবস্থান করিতেছেন। যাহা হউক আমরা নৃসিংহদেব দর্শনান্তে পাহাড় হইতে নিম্নে অবতরণ করিলাম। তৎপরে আমরা চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী আসিলে আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া বেজওয়াড়া জংসনে সন্ধ্যার সময় আসিয়া পুনরায় বাসায় উপস্থিত হইলাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

গুড়ুর জংসন হইতে মেডুরা।

আমরা সকলে ভোরে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক ৪॥০ টার সময় বেজওয়াড়ার ছত্রবাটী হইতে সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। সেই ছত্রবাটীর অন্যান্য যাত্রীও ষ্টেশনের দিকে গমন করিতে লাগিল। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি গাড়ী দণ্ডায়মান। এই স্থানে গাড়ী প্রায় ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে। আমরা সত্বর একটী কামরা অধিকার করিয়া বসিলাম। ঠিক ৫টা ৩ মিনিটের সময় গাড়ী ছাড়িল। আমরা মান্দ্রাজ অভিমুখে চলিলাম। নীলগিরি বা পূর্ব্বঘাট-শ্রেণীর উপত্যকা-ভূমির মধ্যস্থল দিয়া ট্রেণ সবেগে চলিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়কালীন পর্ব্বতশিখরে যেন কনকরশ্মি উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। সৌন্দর্য্য-সম্ভার ভূষিত দিগন্তব্যাপী গিরিশ্রেণীর মনোমদ-গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে যেন আমরা কোন এক অজ্ঞাত নূতন স্থানে গমন করিতে লাগিলাম। উভয় পার্শ্বস্থ গিরিমালা, অরণ্য-প্রান্তর ও সরিৎ সরোবরাদির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে আনন্দিত চিত্তে চলিলাম। মধ্যে মধ্যে অসংখ্য তালবৃক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। শ্যামল ক্ষেত্র অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। যেন চতুর্দ্দিকেই তাল বন।

ক্রমে বেলা হইতে লাগিল ক্ষুধারও উদ্রেক হইল। টাইমটেবিল খুলিয়া দেখিলাম বিত্রগুণ্টা ষ্টেশনে গাড়ী ৫১ মিনিট অপেক্ষা করে। তজ্জন্য সেই ষ্টেশনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় ১১টার সময় গাড়ী এইস্থানে (বিত্রগুণ্টা ষ্টেশনে) আসিয়া পৌছিল। ঘড়ি খুলিয়া দেখি গাড়ী তথায় পৌছিতে ২০ মিনিট দেরি (Late)

হইয়াছে। অৰ্দ্ধঘণ্টা পরেই গাড়ী ছাড়িবে জানিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়ীতে বসিয়াই তৈল মৰ্দ্দন করিলাম। প্লাটফরমের উপরে দুইটী বড় বড় জলের কল দেখিয়া সেই স্থানে সত্বর স্নান করিয়া লইলাম। জল অপব্যয় হেতু গার্ডসাহেব ও টিকেট কলেক্টরগণ নিষেধ করিতে লাগিল। তজ্জন্য আমার সহযাত্রীদের স্নান করিতে সাহস না হওয়ায় তাঁহারা কেবল মাত্র মুখ হাত ধুইয়া লইলেন। তৎপরে গাড়ীতে বসিয়াই মনে মনে সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া লইলাম। এইবার খাদ্যের ভাবনা হইল। সাহেবদের মত আচার বিশিষ্ট হইলে আহারের ভাবনা নাই। বিত্রগুণ্টা ষ্টেসনে অতি উত্তম বিলাতি হোটেল (Refreshment room) রহিয়াছে। কি করিব আমরা হিন্দু তজ্জন্য আমাদের আহারের বড় গোল; কোন ষ্টেশনে দেখিলাম না যে হিন্দুদিগের জন্য কোন ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন জাতি একটা হোটেল খুলিয়াছে। হ্যাটকোটধারী অনেক বাঙ্গালী ঐ ষ্টেশনের হোটেলে প্রবেশ করিলেন। সমাজের যেরূপ একছত্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই যে একাকার হইবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমাদের প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং ষ্টেশনে বিক্রীত কতকগুলি কদলী ক্রয় করিলাম। আর বেজওয়াড়ার বাজার হইতে আনীত কিছু ফল ও লাড্ডু (একপ্রকার মিষ্ট) তাহাই ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম।

এই স্থানে বলিয়া রাখি যে ওয়ালটেয়ার হইতে বেজওয়াড়া পর্য্যন্ত কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য ষ্টেশনে বিক্রীত হয়, কিন্তু বেজওয়াড়ার পর হইতে আর কিছুই পাওয়া যায় না। কোন কোন ষ্টেশনে কলা, এক প্রকার বাদাম আর কোথাও বা দুগ্ধ এই মাত্র বিক্রয় হয়। আর তৈলপক্ক ফুলুরি, ঝুরিভাজা প্রভৃতি কতকগুলা নিকৃষ্ট খাদ্যও বিক্রয় হয়। সে গুলি এত জঘন্য যে সদ্য সদ্যই কলেরা আনয়ন করে। লুচি কচুরি প্রভৃতি ঘৃতপক্ক খাবার, বোধ হয় এতদ্দেশীয়েরা কখনও দেখে নাই।

যাহা হউক আমরা ফল মূলাদি দ্বারা কোন প্রকারে সে দিনকার মত কাটাইলাম। বিত্রগুণ্টা হইতে গাড়ী ছাড়িয়া বেলা ১টার সময় গুডুর জংসন ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই গুডুর জংসন হইতে একটী লাইন বরাবর মান্দ্রাজ গিয়াছে। আর একটী রেল লাইন (South Indian Ry.) পশ্চিম দক্ষিণাভিমুখী হইয়া পুনরায় মান্দ্রাজের দক্ষিণে বিল্লপুরম জংসন ষ্টেশনে আসিয়া মিশিয়াছে। যাত্রীদের সেতুবন্ধ যাত্রা কালীন মান্দ্রাজ হইয়া বিল্লপুরম ষ্টেশন অতিক্রম পূর্ব্বক সেতুবন্ধ গমন প্রশস্ত। তৎপরে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন ঐ লাইন দিয়া না আসিয়া বিল্লপুরম জংসন হইতে (South Indian Ry. line দিয়া) গুডুর পৌঁছিয়া কলিকাতাভিমুখে আগমন কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এই দুই লাইনেরই সকলগুলি দ্রষ্টব্য তীর্থ দেখা হইবে। সেগুলির বিষয় এই স্থানে বর্ণনা করিব।

১ম, গুডুর হইতে বিল্লপুরম্ (Madras line দিয়া) ইহার মধ্যে ১ মান্দ্রাজ ২ চিঙ্গলপুত, ৩ মহাবলীপুরম, ৪ শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী তৎপরে বিল্লপুরম এই কয়টী তীর্থ ও দ্রষ্টব্য স্থান আছে। ২য়, গুডুর হইতে বিল্লপুরম (South Indian Ry. line) দিয়া ইহার মধ্যে কালহস্তী, তিরুপতি (বালাজী) ভেলোর, বিরিঞ্চিপুর, তিরুবন্নমলয়, তিরুকাইলুর তৎপরে বিল্লপুরম এই কয়টী দ্রষ্টব্য তীর্থ আছে।

আমরা উভয় লাইনের এই তীর্থ গুলির বিষয় পরে পরে এই স্থানে বর্ণনা করিয়া দেখাইব। এদেশে যে কত তীর্থ কত মন্দির আমাদের অজ্ঞাত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই সমস্ত তীর্থের বিষয় শ্রবণ করিয়া পাঠকগণ যে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ।

যদিচ ইহা তীর্থ স্থান নহে তথাপি কলিকাতা ও বম্বের মত ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী নগর। ইহা সমুদ্রের উপর বিভবশালী হর্ম্মাবলী শোভিত, মনোমদ অপূর্ব্ব ছটায় প্রতিষ্ঠিত। ইহা (Black town) কৃষ্ণ সহর ও (White town) শ্বেত সহর এই দুই ভাগে বিভক্ত। ব্লাক টাউনে দেশীয়েরা বাস করে, এবং শ্বেত সহরে সাহেবরাই বাস করিয়া থাকে। মান্দ্রাজ অন্যতম প্রেসিডেন্সি। এখানে একজন গভর্ণর আছেন কিন্তু তিনি বড় লাটের অধীন। সহর ও সহরতলী ৯ মাইল দীর্ঘ। পূর্ব্বে মনে করিতাম মান্দ্রাজ নামে একটী রেলওয়ে ষ্টেশন আছে কিন্তু তাহা নহে। কতগুলি ষ্টেশনের সমষ্টি লইয়াই এই সমগ্র মান্দ্রাজ সহর। সহরের উপর দিয়াই ট্রেণ চলিতেছে। প্রথম ষ্টেশনের নাম Washer-man pet, ২য় Raypuram, ৩য় Beach, ৪র্থ Egmore এই ৪টী ষ্টেশন লইয়া মান্দ্রাজ। আমরা যখন সেতুবন্ধ যাইবার জন্য এই মান্দ্রাজ আসিয়া উপস্থিত হই তখন এই সকল ষ্টেশন ছিল। অধুনা মান্দ্রাজে Central station নামে একটী ষ্টেশন হইয়াছে। বীচ ও এগমোর ষ্টেশনে আর মান্দ্রাজ মেল গাড়ী থামে না। আমরা বেলা ৫ ঘটিকার সময় মান্দ্রাজের বীচ নামক ষ্টেশনে পৌছিলাম। এই ষ্টেশনেই মান্দ্রাজ লাইন শেষ হইল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া প্লাটফরমে দাঁড়াইবা মাত্র আমাদের বাঙ্গালী দেখিয়া তদ্দেশীয় একজন রেলওয়ে কুলী বেশ ইংরাজী ভাষায় বলিল Babu take care of pick-pockets. কুলীর কথায় সাবধান হইয়া একখানি timetable ক্রয় করিবার জন্য ষ্টেশনের কামরায় প্রবেশ করিলাম, তথায় একটী কেরাণী বাবু বলিলেন, মহাশয়, টাকাকড়ি পকেটে রাখিবেন না, এখানে ভারি পকেটমারা যায় তজ্জন্য সাবধান হউন। বুঝিলাম একটু অসাবধান হইলেই

সর্ব্বনাশ, এদেশে পকেট মারা বিদ্যাটা কলিকাতাকে হারাইয়াছে। যাহা হউক আমরা সাবধান হইয়া কুলীর মাথায় জিনিষপত্র দিয়া ছত্রের দিকে চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম চতুর্দ্দিকে ইলেকট্রিক ট্রাম গাড়ী চলিতেছে।

ষ্টেশনের নিকটে রামস্বামী মুদালিয়ার ছত্রবাটী আছে। এখানে অধিক ভীড় থাকায় আমাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। সুতরাং এখান হইতে কিয়দ্দূর গিয়া মাড়ওয়ারি ছত্রে উপস্থিত হইলাম। সেদিন সেখানেও বিস্তর লোক ছিল। যাহা হউক আমরা কোন রকমে একটু স্থান সংগ্রহ করিলাম। তখন রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে। সমস্ত দিন অন্নাহার না হওয়ায় রাত্রিতে আর ঘুরিতে ভাল লাগিল না, তজ্জন্য এই ছত্রবাটীতেই কষ্ট করিয়া রহিলাম। বাটীর বহির্ভাগে একটী জলের কল আছে। সেই কলে মুখ হাত ধুইয়া খাবারের অন্বেষণে বহির্গত হইলাম। বড়ই আশ্চর্য্য এত বড় সহরে কলিকাতার মত ভাল খাবারের দোকান নাই। কেবল পলাণ্ডুর ফুলুরি, গুড়ের জিলিপি, লাড়ু প্রভৃতি জঘন্য খাদ্যে দোকানগুলি পরিপূর্ণ। সন্দেশ, রসোগোল্লা নাই, কারণ দেশীয়েরা ছানা প্রস্তুত করিতে জানে না। কেবল ক্ষীরের প্রস্তুত বরফি পেঁড়া প্রভৃতি মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। স্থানীয় একজন হিন্দুস্থানী বলিল, যে আপনারা অর্দ্ধ মাইল দূরে গমন করিলে একটা মাড়ওয়ারির দোকান পাইবেন। সেই স্থানে আপনাদের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য পাইলেও পাইতে পারেন। সেই লোকটীর উপদেশ মত তথায় গমন করিয়া তাহার দোকান হইতে কিছু লুচি ভাজাইয়া লইলাম। ভাল ১নং ময়দা তথায় মেলে না। তজ্জন্য লুচিগুলি [illegible]য়া হইয়াছিল। তদুপরি সে ব্যক্তির প্রত্যহ অভ্যাস না থাকা হেতু লুচি গুলি পশ্চিম দেশীয়ের মত মোটা মোটা হইয়াছিল।

সেই রাত্রে আর রন্ধনাদির ব্যবস্থা না করিয়া সেই লুচি ও মিষ্টান্ন

ভোজনে সকলে নিশা যাপন করিলাম। প্রভাতে উঠিয়া এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন মানসে সকলে ছত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। এই মান্দ্রাজ সহরে যদি কলিকাতার মত একটীও ছত্রবাটী না থাকিত তাহা হইলে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হইত। স্থানাভাবে হয়ত রাস্তায় বসিয়া থাকিতে হইত, নচেৎ কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইত, কিংবা কাহারও দ্বারা পূর্ব্বে বাটী ভাড়া করিয়া রাখিতে হইত। কেবল কলিকাতায় ছত্রের নিয়ম নাই। কিন্তু কলিকাতা ছাড়া ভারতের সর্ব্ব স্থানেই দুই চারিটী করিয়া ছত্র বাটী আছে। আমরা সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যে যে স্থানে অবতরণ করিয়াছিলাম সেই সকল স্থানেই প্রাসাদ তুল্য সুরম্য ছত্রবাটী দেখিলাম। যে সকল মহাত্মা পরের জন্য এমন এক একটী ছত্রবাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের কত পুণ্য? তাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়াও অক্ষয় অমর হইয়া রহিয়াছেন। কোন একজন পরিব্রাজক বলিয়াছেন, যে দক্ষিণ দেশে এত ছত্র যে দুই এক মাইল অন্তরই ছত্রবাটী পাওয়া যায়। যদি কোন ব্রাহ্মণ প্রত্যেক ছত্রে একদিন করিয়া থাকিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করেন এবং আসিবার কালে ২।১ দিন করিয়া থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাহা হইলে তাঁহার একবৎসর কাটিয়া যাইবে। এইরূপ ক্রমাগত যাতায়াত করিলে বিনা চাকরীতে তাঁহার জীবন কাটিয়া যায়। প্রত্যেক ছত্রে ব্রাহ্মণগণ আহারের জন্য তিন দিবস সিধা পাইয়া থাকেন। অন্য যাত্রীরা সিধা পান না। ব্রাহ্মণদিগেরই এই সুবিধা আছে।

যাহা হউক আমরা সহরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। বৃষ্টি হইলেই কলিকাতার মত কাদা হয় না; প্রায় প্রত্যেক রাস্তাতেই ট্রাম চলিতেছে। ভাড়া অতি সুলভ, তিন পয়সা চারি পয়সা মাত্র। সদর রাস্তার উপরের বাটীগুলি

প্রায় সুদৃশ্য উদ্যানে সুশোভিত। কলিকাতার সদৃশ সমৃদ্ধিশালী না হইলেও মান্দ্রাজ সহর সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া স্বাস্থ্যকর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজে এমন কোন বড় নদী নাই যদ্দ্বারা অভ্যন্তরের বাণিজ্য দ্রব্য জাহাজে আমদানি বা রপ্তানি করা যায়। তজ্জন্য বাণিজ্যের সুবিধার্থে সমুদ্রকূলে ছোট ছোট খাল কাটা হইয়াছে ও দুইটা রেলওয়ে লাইন খোলা হইয়াছে। মান্দ্রাজ উপকূলে প্রায়ই ঝড় উঠিয়া থাকে, তাহাতে অনেক সময় নৌকাদি মারা যায়। ১৮৭০, ১৮৭২ ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের সাইক্লোনে অনেক বড় বড় জাহাজ ও নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে বিস্তর টাকার ক্ষতি হয়; তজ্জন্য পুরাতন হাইকোর্টের সম্মুখে মান্দ্রাজ বন্দর সমুদ্র বেষ্টন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে যে কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার সীমা নাই। এইরূপ সমুদ্র ঘেরা বন্দর, বোম্বাই বা করাচি প্রভৃতি অন্য কোনও স্থানে নাই, এইটী দেখিবার উপযুক্ত। জাহাজ ও নৌকাগুলি এই হারবার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আর তত ভয় থাকে না। তখন জাহাজে মাল আমদানি বা রপ্তানি হয়। জালি বোট ও মসুয়া (মেছুয়া) বোটের দ্বারা জাহাজে মাল বোঝাই বা খালাস করা হয়। ঐ সকল বোট নারিকেলের কাতাদ্বারা আম্র কাষ্ঠে নির্ম্মিত। আরোহীরা পোস্তার উপর দিয়া অনায়াসে উঠিতে ও নামিতে পারে। ঐ পোস্তা ১০০০ ফিট দীর্ঘ ও ৪০ ফিট প্রশস্ত। কিন্তু যখন সমুদ্রে ঝড়ের প্রবল বেগ আইসে তখন কাহার সাধ্য যে সেই সময়ে বোট লইয়া জাহাজে বা তীরে অগ্রসর হয়। সেই সময় দেশীয় কুলীরা তক্তায় নারিকেল-দড়ি বাঁধিয়া নৌকার মত করিয়া জাহাজে গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহাদের এই অসীম সাহস দেখিয়া ইংরাজেরা পর্য্যন্ত ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে।

তরঙ্গায়িত সমুদ্রের কূলে দণ্ডায়মান হইয়া হারবার (Harbour)এ জাহাজের ও বোটের গতিবিধি দেখিলে এবং অনন্ত সমুদ্রের লহরীক্রীড়া

দর্শন করিলে প্রাণে বিমল আনন্দ সঞ্চার হইতে থাকে। কিন্তু যখন গগনপ্রাঙ্গণে ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘমণ্ডলের গভীর গর্জ্জন, প্রবল ঝটিকার গোঁ গোঁ শব্দ, প্রচণ্ড মারুত ক্ষুভিত সমুদ্রের অস্থির কল্লোলধ্বনি, এককালে শ্রুতিগোচর হয়, তখন মনে হয়, জগদীশ্বর! এ কোন্ সৃষ্টিতে উপনীত হইলাম! প্রকৃতির ভাব যে কি ভয়ঙ্কর ও বিশাল এবং মানবের শক্তি যে কত ক্ষুদ্র তাহা যুগপৎ অন্তরে উদিত হইয়া আমাদের চিত্ত সেই অনন্ত-শক্তি ভগবানের দিকে প্রধাবিত হয়। এই সাগরের পার্শ্বদেশ দিয়া আমাদের ট্রেণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিল। ট্রেণে বসিয়া বসিয়া সমুদ্রের এই মহান দৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে যে অব্জার-ভেটারি আছে তাহার মেরিডিয়ন হইতে পূর্ব্বে ভারতের সমস্ত রেলওয়ের সময় নির্ণয় হইত। কিন্তু এক্ষণে জব্বলপুরের সময় রাখা হয়। মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার সময় ৩৩ মিনিটের তফাৎ; এবং জব্বলপুরের সময় ২৪ মিনিট তফাৎ।

ব্লাক টাউনে পোকাম নামক সুদীর্ঘ রাস্তার উপর বিস্তর দোকান মনোহারী দ্রব্যাবলীতে সজ্জীকৃত। এই রাস্তায় পুরাতন মান্দ্রাজ ব্যাঙ্ক ও অনেকগুলি গির্জ্জা আছে। এস্প্লানেড রাস্তায় পুরাতন লাইট হাউস অবস্থিত। হাইকোর্টের উপরে নির্ম্মিত একটী উচ্চ গৃহে এক্ষণে লাইট হাউসের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। সেণ্ট জর্জ্জ নামক দুর্গ মধ্যে ইংরাজদিগের ব্যারাক, অস্ত্রভবন, সেণ্টমেরীর গির্জ্জা ও কোম্পানির কএকটী অফিস আছে। ফোর্ট ও সমুদ্রের মধ্যে পূর্ব্বদিকে একটী মাত্র সুপ্রশস্ত রাস্তা। পশ্চিমদিক গোলাকার, তাহার চারিধারে খাল এবং খালের উপর টানা সেতু। এই দুর্গ হইতে যাত্রা করিয়া লর্ড ক্লাইভ টিপু সুলতানকে নিধন করিয়া শ্রীরঙ্গপট্টম্ অধিকার করেন।

মান্দ্রাজ দেখিতে প্রায় কলিকাতার মত কিন্তু অনেক রাস্তায় এখনও ড্রেণের বন্দোবস্ত না হওয়ায় বড়ই জঘন্য আকার ধারণ করিয়া

মান্দ্রাজ—হাইকোর্ট। (১৬৩ পৃঃ।)

Printed by K. V. Seyne & Bros.

রহিয়াছে। এখানে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট হাউস (লাট ভবন) মেমোরিয়াল হল, পাচ্চাপ্পা হল, সিনেট হাউস, চিপাক রাজভবন, কলেজ বাটী, সেক্রেটেরিয়ট্ বিল্ডিং, মান্দ্রাজ ক্লাব, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, নূতন হাইকোর্ট, মিউজিয়ম (যাদুঘর), নূতন আর্টস্কুল, পিপ্‌লস্ পার্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্যারেড্ গ্রাউণ্ড, বোটানিকেল গার্ডেন, মান্দ্রাজ সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নূতন হাইকোর্টের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

লাট্ ভবন—ফোর্টের অৰ্দ্ধ মাইল দক্ষিণে লাট ভবন। এই সুন্দর প্রাসাদের বৃহৎ প্রবেশ দ্বারে আরকটের নবাব আজিম জার ও তাঁহার দুই পুত্রের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। বড় কটকের উত্তর দিকে ভোজ গৃহ অবস্থিত। সুপ্রশস্ত প্রস্তরের সোপান দিয়া উপরের হলে যাইতে হয়। তাহাতে উপবিষ্টা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া, তৃতীয় জর্জ্জ, লর্ড কর্ণওয়ালিস, লর্ড কোনেমারা, লর্ড নেপিয়ার, সার আয়ার কুট, মার্কুইস ওয়েলেসলি, ডিউক অফ অয়েলিংটন, কুইন সার লোটী, সার টমাস মন্‌রো, লর্ড হারিস প্রভৃতি অনেক বড় লোকের প্রতিকৃতি আছে। লাট ভবনের অন্যান্য প্রকোষ্ঠ অপূর্ব্ব দ্রব্যাবলী ও নানবিধ মনোমুগ্ধকর চিত্রে সজ্জীকৃত। ডাইনিংরুমে লর্ড ক্লাইব, নবাব সুজা উদ্দৌলা ও নবাব উমদাতুল উমরার ছবি আছে।

হারবার হইতে মধ্য রাস্তা সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গের সম্মুখ দিয়া চিপক প্রাসাদ, কলেজ ও পাবলিক ওয়ার্কস বাটী হইয়া ত্রিপ্লিকেনদিকে গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া সমুদ্রকূলে বায়ু সেবনার্থ লাট বাহাদুর, কাউন্সেলের মেম্বরগণ, হাইকোর্টের জজ সকল, বড় বড় রাজ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য ইংরাজগণ এবং দেশীয় ধনাঢ্যগণ এই স্থানে আসিয়া থাকেন। ষ্টেশনের নিকটেই পিপলস্ পার্ক; ইহা দেখিতে অনেকটা কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের মত। এখানে ১৬টী কৃত্রিম হ্রদ ও ব্যাণ্ড বাজাইবার

ঘর আছে। এই উদ্যান ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সার চার্লস ট্রেভিলিয়াম প্রস্তুত করেন। পিপলস্ পার্ক ব্যতীত এখানে নেপিয়ার্স পার্ক, রবিনস্ পার্ক, ত্রিপ্লিকেন পার্ক ও চিপক পার্ক প্রভৃতি কতকগুলি সুন্দর পার্ক আছে। পিপলস্ পার্কের মধ্যস্থলে নূতন টাউনহল প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাও দেখিবার উপযুক্ত।

যাদুঘরে কলিকাতার মত নানা প্রকার পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, শম্বুক, পতঙ্গ প্রভৃতির আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নানা দেশের অস্ত্র শস্ত্র, তীর ধনুক, বন্দুক ও সকল সময়ের স্বর্ণ, রৌপ্য, ও তাম্রের মুদ্রা, পুরাতন পতাকা, ১৭৬২ সালের মানিল্লা হইতে আনীত দুইটী শিরস্ত্রাণ (একটী /৫ পাঁচ সের ও অপরটী /৭ সাত সের) কারমুল হইতে আনীত পিত্তলের অদ্ভুত কামান (কামান দেখিতে যেন একটী ব্যাঘ্র, চারি পা বিস্তার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। যশোবন্ত হোল-কারের বন্দুক, একটী খাঁচা, যাহাতে কাপ্তেন অনষ্ট্রুথার ৭ মাসকাল চীনদেশে বন্দী ছিলেন, সেই খাঁচা ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য মিউজিয়মে সজ্জিত রহিয়াছে। এই মিউজিয়মে যে পুস্তকালয় আছে তাহাতে সাত হাজারের উপর গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

ফোর্টের পশ্চিমে পাচ্চাপার কলেজ ও হল। এই দুইটী প্রাসাদ বদান্যবর পাচ্চাপা মুদালিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই দানশীল স্বনামখ্যাত হিন্দুকুল তিলক শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নানাবিধ সৎকার্য্যে প্রভূত অর্থ দান করিয়া যান। তিনি নানা স্থানে অন্যূন এক লক্ষ দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয় ও অমর হইয়া গিয়াছেন। ফোর্টের অর্দ্ধ মাইল দূরে জেল। রেলওয়ে ষ্টেশনের অপর পারে জেনারেল হাঁসপাতাল। ইহার পূর্ব্বভাগে মেডিকেল কলেজ। দেশীয় ও ইংরাজ রোগীদিগের জন্য প্রায় ৫০০ শয্যা আছে। জেনারেল হাঁসপাতালের নিকট মেমোরিয়াল হল। সিপাহী বিদ্রোহের হস্ত হইতে মান্দ্রাজ

রক্ষা পাইয়াছিল বলিয়া এই হল সাধারণের টাকায় প্রস্তুত হয়। এখানে শিক্ষা, দান, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক সভা আছে। আমোদ প্রমোদ বা উৎসবের জন্য এই হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না।

পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল দ্রষ্টব্য স্থান ব্যতীত কয়েকটী সুন্দর দেব-মন্দির আছে, তাহা প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর দর্শন করা উচিত। ১ম পার্থসারথি স্বামীর মন্দির, ২য় ঈশ্বর স্বামীর মন্দির, ৩য় লিঙ্গ শেটী, ৪র্থ থম্বুশেটী ষ্ট্রীটে ২টী মন্দির আছে। মান্দ্রাজে পূর্ব্বে আদৌ বাঙ্গালী ছিল না। এক্ষণে কতকগুলি দোকানদার ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কতকগুলি শিষ্য ও ২।৪টী কর্ম্মচারী মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

পার্থসারথি।

বৈষ্ণবদিগের জন্য পার্থসারথি স্বামীর মন্দির ও স্মার্ত্তদিগের জন্য ঈশ্বর স্বামীর মন্দির উপাসনা করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিপ্লিকেন নামক অংশে পার্থসারথি স্বামীর সুবৃহৎ মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরের সম্মুখে চতুষ্কোণ সুপ্রশস্ত ও সুগভীর তেপ্পন্‌কুলম নামক পুষ্করিণী। ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত, দেবতার পূজার ব্যবস্থাও মন্দ নহে। প্রতি শনিবারে মহা সমারোহে পূজা হইয়া থাকে। তজ্জন্য সেই দিবস বহু লোকের সমাগম হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরে ভগবানের মূর্ত্তি আছে।

ঈশ্বর স্বামী।

মাইলপুর নামক অংশে ঈশ্বর-স্বামীর মন্দির অবস্থিত। ইনি স্মার্ত্তদিগের ঠাকুর। মন্দিরের সম্মুখে তেপ্পন কুলম্ নামক পুষ্করিণী, ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। সিংহাসনোপরি মঞ্চের উপর উক্ত দেবতাকে বসাইয়া নি[illegible]যোগে উক্ত সরোবরের চতুর্দ্দিকে

বেড়াইতে থাকে। ইহাকে তেপ্পন উৎসব কহে। আষাঢ়ী শুক্ল দ্বিতীয়ায় রথযাত্রার দিন দেবতার রথোৎসব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ব্লাক টাউনে লিঙ্গশেটী ও থম্বুশেটী ষ্ট্রীটে দুইটী মন্দির আছে। তাহাও দেখিবার উপযুক্ত।

দক্ষিণ দেশের আচার ব্যবহার।

মান্দ্রাজে ত্রৈলঙ্গি ও তামিল দুই ভাষাই ব্যবহৃত হয়। এখান হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত তামিল দ্রাবিড়ী বা আরুই ভাষা প্রচলিত। এখানকার অধিবাসীরা এমন কি কুলীরা পর্য্যন্ত ইংরাজী বলিতে পারে। ভাষা শুদ্ধ হউক বা নাই হউক কলিকাতার চিনে বাজারের মত ক্রমাগত ইংরাজী বলিতে থাকে। বঙ্গবাসী বা বম্বেবাসীর ন্যায় শিক্ষাবিষয়ে ইহারা অনেক পশ্চাৎপদ। ইহাদের আকৃতি কৃষ্ণবর্ণ; ললাটদেশে চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক ঊর্দ্ধ ফোঁটা কাটিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট নহেন। তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা করেন এবং অনেকে বেদপাঠও করিতে জানেন। আচার্য্য, ব্রাহ্মণ-সন্তানদিগকে বিনা ব্যয়ে মণ্ডপে বসিয়া বেদ শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রায় অনেকেই সংস্কৃতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। ইঁহারা কখন মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ করেন না। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রোত্রীয়ন্দার অর্থাৎ শ্রুতি বা বেদপাঠ করিতেন বলিয়া হিন্দু রাজাদিগের নিকট হইতে নিষ্কর ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহাতেই এখনকার বংশধরগণের অনেকটা সুবিধা। এখানকার স্ত্রীলোকগণের অবরোধ প্রথা নাই। স্ত্রীলোকগণ ৯গজ পরিমাণ শাটী পরিধান করিয়া থাকে। ইহা রঙ্গিন রেশম ও সুতায় নির্ম্মিত, কোনটীতে জরির কাজও থাকে। শাটীর মূল্য ১০ টাকা হইতে ৭০।৮০ টাকা পর্য্যন্ত হয়। গরীব মহিলা-দিগেরও শাটী ৫।৬ টাকার কমে হয় না। ইহাদের শাটী পরিধানের নিয়মও বেশ পরিষ্কার। মহিলাগণ পুরুষদিগের মত কাছা দেয়, পরে

কাছার উপরে একফের ঘুরাইয়া বামদিকে কোঁচা রাখে। ' অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বামদিক দিয়া গাত্রে বেড় দেয়। এখানকার ভদ্রাভদ্র সকল স্ত্রীলোকই সর্ব্বদা টাইট জামা বা কাঁচুলি ব্যবহার করিয়া থাকে।

সধবা স্ত্রীলোকগণ সিন্দুরের পরিবর্ত্তে কপালে কুঙ্কুমের টিপ পরিয়া থাকে। তামিল স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ রমণীগণ ললাটে বিভূতি লাগাইয়া তাহার নিম্নে কুঙ্কুমের টিপ দেয়। বৈষ্ণব স্ত্রীলোকেরা ঊর্দ্ধে ১।০ ইঞ্চি ও প্রস্থে সওয়া তিন ৩।০ ইঞ্চি ফোঁটা পরিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বিধবাগণ বিভূতি ভ্রক্ষণ ও মাসান্তে মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন, শূদ্র বিধবারা মস্তক মুণ্ডন করে না। সধবারা মস্তকে কাপড় দেয় না, বিধবারা দিয়া থাকে। বঙ্গললনাদিগের ন্যায় ইহারা সৌখিন স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করে না। প্রায় রৌপ্যনির্ম্মিত মোটা মোটা গহনা ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহারা স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করে তাহারা প্রায়ই নিরেট সোণা ব্যবহার করে। পাদভূষণ আরও ভয়ানক। কাহার চরণদেশ হইতে শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে, কাহারও বা ঘণ্টিকা পংক্তিদ্বারা আকীর্ণ। সধবাগণ বামহস্তে লৌহবলয়ের পরিবর্ত্তে উভয় পদের মধ্য অঙ্গুলিতে ৩টা করিয়া রূপার বা কাঁসার কড়া পরিয়া থাকে। বিধবা হইলে সেগুলি জলে নিক্ষেপ করে। ব্রাহ্মণ কন্যাগণের ৮ হইতে ১২ বৎরের মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু পুষ্পবতী না হইলে শ্বশুরালয় গমন করে না। কিয়দ্দিবস গতে শাস্ত্র বিধানে গর্ভসংস্কার করিয়া ভর্ত্তৃশয্যায় গমন করে। এ প্রথা বাঙ্গালা দেশ হইতে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ পরিশ্রমশীলা ও নিজেরাই গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকে, দক্ষিণ দেশের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের জল গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণী দেবীরা কুপ বা জলাশয় হইতে নিজেরাই কলসী কক্ষে করিয়া জল আনয়ন করিয়া থাকেন। দাস দাসীর দ্বারা আনীত জলে হস্তপদ প্রক্ষালন করা হয় মাত্র।

এখানকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ৩ বার আহার করিয়া থাকে। প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য করিয়াই তিলক ধারণ পূর্ব্বক পান্তাভাত ঘোল বা চাটনির দ্বারা আহার করিয়া থাকে। পরে ১ গেলাস কাফি ভক্ষণ করিয়া থাকে। এদেশে প্রায় সকল স্থানেই চার পরিবর্ত্তে কাফি ব্যবহৃত হয়। বেলা ১টা হইতে ২টার মধ্যে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃকালের তিলক পুঁছিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন পূর্ব্বক নূতন করিয়া তিলকের টিপ ধারণ করেন। উক্ত তিলকদৃষ্টে বোধ হয় তাঁহার আহার হইয়াছে কিনা। সন্ধ্যার পর উক্ত তিলক প্রক্ষালন করিয়া বিভূতি মর্দ্দন করেন ও রাত্রি ৮টা হইতে ১০ টার মধ্যে ভোজন ক্রিয়া সমাপন করেন। বৈষ্ণবগণ তিলক পরিবর্ত্তন করেন না। সুতরাং ইহাঁদের তিলক দৃষ্টে আহার হইয়াছে কিনা বুঝা যায় না। আহারের সময় ইহারা বড় লঙ্কা ব্যবহার করে অনেকে লঙ্কা ভর্জ্জিত করিয়াও আহার করে। দক্ষিণ দেশে কোথাও সর্ষপ তৈল নাই। তিলের তৈলে সমস্ত ব্যঞ্জন রন্ধন হয়। ইহারা ভাতে, দালে ও প্রায় সকল তরকারিতেই ঘোল ও তেঁতুল ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ পলাণ্ডু, হিঙ্গু ও রসুন যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ষণ করে। শূদ্র বৈষ্ণবেরা ছাগ, কুক্কুট, মেষমাংস ও মৎস্য ভক্ষণ করে। এতদ্দেশে কুক্কুট মাংস ভোজনে কোন দোষ নাই। প্রায় প্রত্যেক বাটীতেই কুক্কুট বিচরণ করিতেছে দেখিলাম।

এদেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রত্যহ রুক্ষ স্নান করে। কেবল স্ত্রীলোকেরা প্রতি বৃহস্পতিবারে তৈল ও হরিদ্রা মাখিয়া থাকে। পুরুষেরা সপ্তাহে ১ দিন মাত্র তিল্র তৈল ব্যবহার করে। দক্ষিণ দেশের ব্রাহ্মণ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম স্মার্ত্ত, দ্বিতীয় লিঙ্গায়ৎ, তৃতীয় বৈষ্ণব, চতুর্থ মাধ্ব। স্মার্ত্তগণ বেদাধ্যায়ী, অদৃষ্টবাদী, শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী ও শিব উপাসক। ইঁহারা কপালে বিভূতির ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ

করেন। শিব উপাসক হইলেও তাঁহাদিগকে শৈব বলিলে অবমানিত বোধ করেন। শূদ্র শিবোপাসক হইলে শৈব নামে অভিহিত হয়। শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, কিন্তু তাহারা দ্বিজ নহে। দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা লিঙ্গায়ৎ নামে অভিহিত, ইহারা ধাতুলিঙ্গ গলায় ধারণ করিয়া থাকে। তাহারা লিঙ্গ ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করে না। বেদ, গীতা ও শঙ্করের মত মানিয়া চলে কিন্তু ভাগবত, মহাভারত ও রামায়ণ মানে না। পুরাণের মধ্যে কেবল লিঙ্গপুরাণই গ্রাহ্য। লিঙ্গায়ৎ ব্রাহ্মণগণ মৃত হইলে শব দাহ না করিয়া মঠে সমাধি দিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী আচার্য্য শ্রীরামানুজের মতের প্রবর্ত্তক। ইহারা ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন মন্দিরে প্রায় যায় না, এমন কি মহাদেবেরও পূজা করে না। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ, নিরামিষভোজী ; কিন্তু বৈষ্ণব শূদ্রেরা কুক্কুট মাংস পর্য্যন্ত ভোজন করে। ৪র্থ মাধ্ব, শ্রীমান্ মাধবাচার্য্য এই মতের প্রবর্ত্তক। ইহারা শালগ্রামের সেবা করিয়া থাকে ; ইহাদের মত দ্বৈত সিদ্ধান্ত। উক্ত চারি মতের ব্রাহ্মণ, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করে না, এমন কি আহারাদিও করে না।

যাহা হউক, আমরা মান্দ্রাজের প্রায় চতুর্দ্দিক ভ্রমণ শেষ করিয়া এগ্‌মোর ষ্টেশনে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। ছত্রবাটী হইতে যখন আমাদের মালপত্র একটা গরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিই, সেই সময় এক বৃদ্ধ মুসলমান আমার পকেট মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। বুড়া মানুষ বলিয়া বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পকেটে হস্তটী প্রবেশ করাইবামাত্র আমি তাহার মণিবন্ধ সজোরে ধরিলাম। তখন সেই বৃদ্ধ ক্রন্দন করিতে লাগিল, সুতরাং অব্যাহতি দিলাম। কিন্তু রাস্তার পথিকের হস্ত হইতে সে ব্যক্তি নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিল না ; অনেকেই দুই এক ঘা দিয়া তাহাকে বিদায় দিল।

ভাবিলাম সেই মুটের কথা এখন প্রত্যক্ষ হইল। যাহা হউক সেই গাড়ী মালপত্রসহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে আমরা মালপত্র নামাইয়া বাষ্পীয় যানের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, (এমন সময় বাটী হইতে পিতাঠাকুর মহাশয় প্রদত্ত একখানি পত্র (c/o Station Master, Egmore) পাইলাম। বাটীর কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্থির ও নিশ্চিন্তমনে প্লাটফরমে বেড়াইতে লাগিলাম)। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী চিঙ্গলপুত ষ্টেশন অভিমুখে চলিল। স্বদেশ হইতে বহুদূর আসিয়া স্বদেশবাসীর সঙ্গ কত মধুর তাহা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। বাঙ্গালীর অভাবে মান্দ্রাজবাসীর সঙ্গ বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। সহযাত্রিগণ পরস্পর গল্প গুজবের আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। বেলা ১২টার সময় গাড়ী চিঙ্গলপুত ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। এই স্থানে শ্রীপক্ষী তীর্থ আছে। ইহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চিঙ্গলপুত।

ইহা একটী জংসন ষ্টেশন। এখানে ডিষ্ট্রীক্ট জজ, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলের অধ্যক্ষ, মুন্সেফ্ প্রভৃতি বিচারকগণের আদালত ও কাছারি আছে। মান্দ্রাজ জেলার ইহা একটী সুন্দর নগর। ইহার চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখান হইতে একটী লাইন উত্তর-পশ্চিম দিকে অর্কোনাম নামক জংসন ষ্টেশনে মিশিয়াছে। এই লাইনের মধ্যে ভারতবিখ্যাত শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী নামক তীর্থ বিদ্যমান। চিঙ্গলপুত ষ্টেশনের ৬ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে পর্ব্বত শিখরোপরি বৈদ্যলিঙ্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত, ইহার অপর নাম শ্রীপক্ষী তীর্থ। ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক এবং পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যাত্রিগণ এই তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রধান অর্চ্চক দেবতার

ভোগের নিমিত্ত কিছু টাকা যাত্রীদের নিকট হইতে লইয়া ভোগ প্রস্তুত করেন। তৎপরে মধ্যাহ্নকালে কাকাতুয়ার স্থায় দুইটী শুক্লবর্ণের পক্ষী তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়; ৩টী পাত্রে তিন রকম দ্রব্য উহাদের জন্ম থাকে। ১ম পাত্রে তৈল, ২য় পাত্রে ইটের জল ও ৩য় পাত্রে পরিষ্কার জল রক্ষিত হয়। এই পক্ষী দুইটী প্রথমে তৈলপাত্রে মস্তক ডুবাইয়া ইটের জলে মস্তক ও দেহ পরিষ্কার করিতে থাকে, তৎপরে শুদ্ধ জলে স্নান করিয়া প্রধান অর্চ্চকের নিকট উপস্থিত হয়। অর্চ্চক মহাশয় ইহাদের জন্ম ভোগান্ন হস্তে করিয়া ধরিয়া থাকেন। তখন পক্ষী দুইটী হস্তস্থিত পাত্রের ভোগান্ন ৩ গ্রাস খাইয়া জল পান করে। আহারান্তে ইহারা তিন বার দেবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। প্রধান অর্চ্চক যাত্রিগণকে বলেন যে উহারা এক্ষণে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করিল। তৎপরে তথা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাশীতে গমন করিয়া রাত্রি যাপন করিবে। পুনরায় কল্য মধ্যাহ্নে এই স্থানে আসিয়া স্নানাহার করিবে। সুতরাং ইহারা পক্ষী নহে, পক্ষি-রূপধারী পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর। ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত চারি যুগ এইরূপ হইয়া আসিতেছে। সামান্ত পক্ষী হইলে কি চারি যুগ অমর হইয়া এই স্থানে প্রত্যহ যথাসময়ে আসিতে পারে! ভক্তগণ পক্ষিরূপধারী হর-পার্ব্বতীকে ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও স্তবস্তুতি করিয়া মানব জন্মে ঈশ্বর সাক্ষাৎলাভ হইল এই জ্ঞানে পুলকিত হইয়া কৃতার্থ জ্ঞান করেন। এখানে একটী কেল্লা উপত্যকার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। উত্তর-পূর্ব্বে ২ মাইল বিস্তীর্ণ একটী হ্রদ আছে।

মহাবলীপুর।

চিঙ্গলপুত হইতে ইহার দূরত্ব ২০ মাইল। এই স্থানে যাইবার দুইটী পথ আছে। ১ম চিঙ্গলপুত ষ্টেশনে নামিয়া ঝটকা (শকট)

যোগে ২০ মাইল যাইতে হয়। ২য় মান্দ্রাজের ৭ মাইল দূরে পাপাঙ্কোরী নামক ঘাটে নৌকায় উঠিয়া খাল দিয়া তিন মাইল জলপথে যাইতে হয়। বোটের ভাড়া যাতায়াতে ৭৲ টাকা লাগে। ১ম পথ অপেক্ষা ২য়টী সুগম, কারণ বোটে যাতায়াতে আরাম আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুদূর বলিয়া এই তীর্থ দর্শন আমাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ইহা অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ। প্রবাদ, কিস্কিন্ধ্যাধিপতি বালিরাজা এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনিই উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন বলিরাজার এই স্থানে বাটী ছিল। কোন্‌টী সত্য আর কোন্‌টী অসত্য তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

এইস্থানে ভগবান্ বিষ্ণুর স্থল-শয়ান মূর্ত্তি বিরাজিত। পুরাকালে পুণ্ডরীক ঋষি বহুদিবস ক্ষীরোদ সমুদ্রতীরে মহাবিষ্ণুর আরাধনা ও তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্থল-শয়ান মূর্ত্তিতে পুণ্ডরীককে দর্শন দিয়াছিলেন। সেই স্থান অবলম্বন করিয়া দৈত্যপতি বলিরাজ স্থল-শয়ান স্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মূল মন্দির ও মণ্ডপের গঠন অতি পুরাতন বলিয়া অনুমান হয়। এই মন্দিরের তিনটী গোপুর আছে। মন্দির মধ্যে প্রস্তরোপরি বিষ্ণুমূর্ত্তি শয়ানভাবে অবস্থিত আছেন। তজ্জন্য স্থল-শয়ান নাম হইয়াছে। এস্থানে শেষ পর্য্যঙ্ক নাই। মন্দির হইতে পূর্ব্বদিকে সাগর যাইবার পথের দক্ষিণে প্রস্তর বাঁধান বৃহৎ পুষ্করিণী ও বাম ভাগে মণ্ডপ আছে। এই সরোবরে তেপ্পকুল উৎসব হইয়া থাকে। তথা হইতে পূর্ব্বমুখে সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মান হইলে সাগরগর্ভে ভাঁটার সময় কতকগুলি মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হয়। কিংবদন্তী আছে যে মন্দিরের পূর্ব্বভাগে বহুদূরে সমুদ্র ছিল। পূর্ব্ব-উত্তর মন্‌সুনের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে তীরভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে উক্ত মন্দিরগুলি পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়াছে।

এই সকল মন্দির ভিন্ন পর্ব্বতোপরি একটী অসম্পূর্ণ মন্দির আছে। উহা তিন খণ্ড পাহাড় কাটিয়া মন্দিরাকৃতিতে পরিণত করা হইয়াছে। সাগরতটে পর্ব্বত খোদিত করিয়া কি চমৎকার গুহা ও মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার কিয়দ্দূরে দুইটী মনোহর মন্দির আছে। উভয় মন্দিরই একখণ্ড প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। প্রথমটীতে গণেশের মূর্ত্তি, দ্বিতীয়টীতে মহাবলি চক্রবর্ত্তীর মূর্ত্তি আছে। ইহার দক্ষিণ দেওয়ালে অষ্টভূজার মূর্ত্তি, বাম দেওয়ালে কূর্ম্মাবতারের মূর্ত্তি ও সম্মুখে বহু দেব দেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত। দীর্ঘে ৯ ফিট ও উর্দ্ধে ৪৩ ফিট দুইটী বৃহৎ হস্তী, কতকগুলি সিংহ, অনেকগুলি দেবদেবী, উর্দ্ধবাহু যোগী, অর্দ্ধ-নাগনারী, গোপিকা ও মারুতি প্রভৃতি নানাবিধ মূর্ত্তি দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতোপরি শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের মূর্ত্তি, হনুমান্ ও গোপিকাগণের গাভীদোহন মূর্ত্তি আছে। এই পাহাড়টী দূর হইতে দেখিলে বৃহৎ মনুষ্যাকৃতি বলিয়া বোধ হয়। অনেকে বলেন যে উহা বলিরাজার মূর্ত্তি। এইস্থানে অনেকগুলি মন্দির ও রথ থাকা প্রযুক্ত ইংরাজগণ মহাবলীপুরকে (Seven Pagodas) সপ্ত মন্দির কহিয়া থাকে।

কাঞ্চীপুর।

সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া বাটী প্রত্যাগমন কালীন আমরা এই পুণ্য-ভূমি দর্শন করিয়াছিলাম। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন কাশী মোক্ষদায়ক তীর্থ, দাক্ষিণাত্যে তেমনই কাঞ্চীপুর। ইহা অতি প্রাচীন সহর। কাঞ্চীপুরম্ সংস্কৃত নাম ইহার অর্থ স্বর্ণময় সহর। আর্কোনম্ লাইনে চিঙ্গলপুত হইতে ৩টী ষ্টেশন পরে এই কাঞ্চীপুর (Conjeeveram) ষ্টেশন। কাঞ্চীপুর দুই অংশে বিভক্ত। ১ম শিবকাঞ্চী, ২য় বিষ্ণুকাঞ্চী, শিবকাঞ্চীতে শিবমন্দির ও শৈবগণের প্রাধান্য এবং বিষ্ণুকাঞ্চীতে

বিষ্ণুমন্দির ও বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য। শুনা যায় পূর্ব্বে এখানে দশ সহস্র শিবলিঙ্গ ও এক সহস্র মন্দির ছিল। আজকাল কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কিছুই নাই বলিলে চলে। শিবকাঞ্চীর দেবতার নাম একাম্বরনাথ এবং বিষ্ণুকাঞ্চীর দেবতার নাম শ্রীবরদারাজস্বামী। আমরা এই Conjeeveram ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র বিস্তর পাণ্ডা আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল। শিবকাঞ্চী ষ্টেশন হইতে ১ মাইল, এবং বিষ্ণুকাঞ্চী শিবকাঞ্চী হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থলপুরাণ মতে বারাণসী, রামেশ্বর ও শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষাও কাঞ্চীপুর পুণ্যতীর্থ। এস্থানের পশু পক্ষিগণও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। প্রলয়কালে ইহা মহাদেবের ত্রিশূলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। অন্যান্য মতেও ইহা সাতটী মোক্ষ-দায়িকা তীর্থের অন্যতম। যথা—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

শিবকাঞ্চীর পাণ্ডা ও বিষ্ণুকাঞ্চীর পাণ্ডা স্বতন্ত্র। বিষ্ণুকাঞ্চী বহুদূর বলিয়া অগ্রে তথায় যাইতে মনঃস্থ করিলাম। তদনুসারে বিষ্ণুকাঞ্চীর একজন পাণ্ডা ঠিক করিয়া দুইখানি গো-যানে আমরা পাণ্ডা সমভিব্যা-হারে তথায় যাইতে লাগিলাম। পাণ্ডার নাম বরদাচারী। সকালে ৮৷৷০টার সময় গো-যানে গমন করিয়া বেলা প্রায় ১০টার সময় তথায় পৌঁছিলাম। কাঞ্চীপুর বেশ সহর। এখনও "নগরেষু কাঞ্চী" নামের সার্থকতা করিতেছে। পথ পরিষ্কৃত ও বাজার সুপ্রশস্ত। রাস্তার দুইপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকেই ঘর বাড়ী ও স্থানে স্থানে বিপণী। এখানে বিস্তর ব্রাহ্মণ ও তাঁতির বাস। একসময়ে কাঞ্চীপুর মহা সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এক্ষণে তাহার তুলনায় কিছুই নাই। এখানে মিউনিসিপালিটির কৃপায় সহরে সর্ব্বত্র
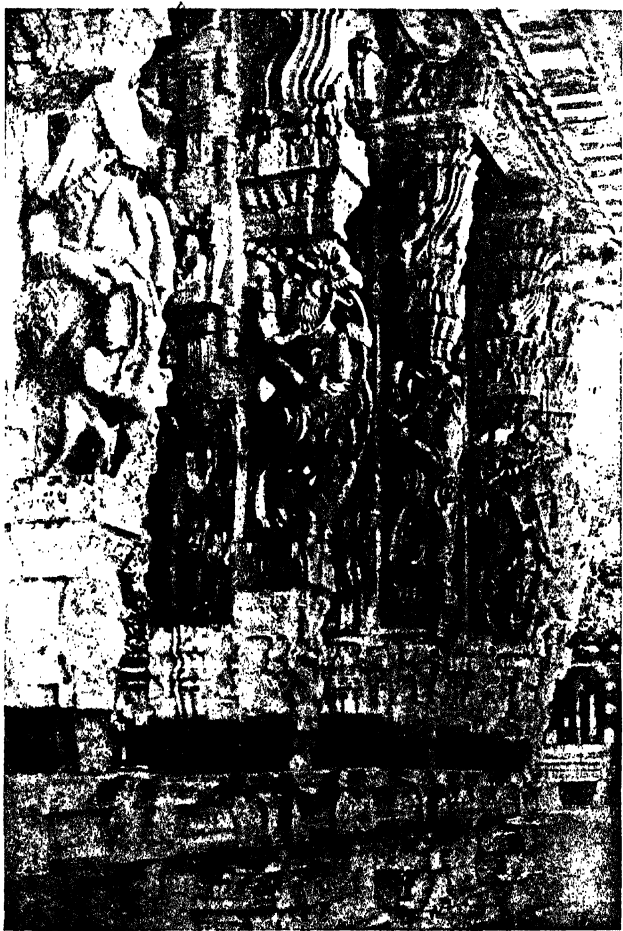
কাঞ্চীপুর শতস্তম্ভ। (১৭৫ পৃঃ।)

Printed by K. V. Seyne & Bros.

কলের জল সরবরাহ হইয়া থাকে। আমাদের যে বাসাবাটী পাণ্ডা-ঠাকুর ঠিক করিয়া দিলেন তাহাতে একটী জলের কল ছিল। কলের জল নির্ম্মল ও সুমিষ্ট। এই জলে আমরা স্নান করিয়া পাণ্ডার সহিত সকলে দেবদর্শনে চলিলাম। দেবতার ভোগ ও প্রসাদাদির বন্দোবস্ত পাণ্ডাঠাকুরই করিলেন।

বিষ্ণুকাঞ্চী।

বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদারাজ স্বামীর সুন্দর ও সুবৃহৎ মন্দির এবং মুনিজনমনোলোভা অপূর্ব্ব দিব্য-মূর্ত্তির বিগ্রহ আছেন। শিবকাঞ্চীর মন্দির অপেক্ষা এই মন্দির আড়ম্বরে ও সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ। সম্ভবতঃ শ্রীরামানুজাচার্য্য এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের ইহা শ্রেষ্ঠ স্থান। আমরা গোপুর পার হইয়া মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণভূমি প্রাপ্ত হইলাম। সেই প্রাঙ্গণের বামদিকে একটী শতস্তম্ভযুক্ত নাটমন্দির বা মণ্ডপ বিরাজিত। প্রত্যেক স্তম্ভে এমনি সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট সিংহাদির মূর্ত্তি আছে যে দেখিলে বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। এই মণ্ডপের মধ্যস্থলে কূর্ম্মোপরি পদ্মাসন অবস্থিত; তদুপরি ভগবান্ বিষ্ণুর ভোগমূর্ত্তি উৎসব সময়ে স্থাপিত হয়। এই স্তম্ভগুলির কিয়দংশ ফটো তুলিয়া একটী প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ইহা দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে কি সুন্দর শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। ইহার পূর্ব্ব ধারে .টী সুন্দর দীর্ঘিকা বিদ্যমান, ইহার নাম কোটীতীর্থ।

এই দীর্ঘিকায় হস্তপদ প্রক্ষালনান্তর মস্তকে কিঞ্চিৎ তীর্থবারি নিক্ষেপ করিয়া পাণ্ডার সহিত মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণভূমি ও দ্বিতীয় প্রাকার অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় মহলের সম্মুখে ভগবান্ শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এই মন্দিরের

পশ্চাৎভাগে বরদারাজস্বামীর ভোগমূর্ত্তি ও অন্যান্য কতিপয় দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। তৎপরে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ বা বিস্তৃত হলের মধ্যে উপনীত হইলাম। তখন বেলা প্রায় ১২টা। ইহার সম্মুখে মূল মন্দির। ইহারই মধ্যে শ্রীশ্রীবরদাস্বামী বা বিষ্ণুকাঞ্চীপুরাধীশ্বর। সেই সময় দেবতার দ্বার রুদ্ধ ছিল। ভগবৎ দর্শনের জন্য প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা তথায় অপেক্ষা করিতে হইল।

তদ্দেশীয় কয়েক জন ব্রাহ্মণের সহিত সেই সময় আমাদের আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তামিল ও সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন আর কিছু বুঝেন না। সুতরাং কথাবার্ত্তা সমস্ত সংস্কৃত ভাষাতেই হইতে লাগিল। শেষে আমাদের বেদ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়া বেদগান করিতে বলিলেন; কিন্তু আমরা বেদ শাস্ত্রে অজ্ঞ, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম যে আমাদের দেশে ইংরাজী বিদ্যা প্রবিষ্ট হইয়া বেদশিক্ষা একবারে লোপ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়া আমাদের সমভিব্যাহারী পুরোহিত মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন "আপনি ত ইংরাজী পড়েন নাই, তবে বেদ শিক্ষা করেন নাই কেন? আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণই বাল্যকাল হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকে। শুনিয়াছি কাশীতে সমধিক বেদচর্চ্চা হয়, ইহা কি সত্য?" পুরোহিত মহাশয় বলিলেন কাশীর সকলেই বেদ জানেন না তবে যে সকল হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদশিক্ষা করেন তাহার সংখ্যা অতি অল্প। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছাত্র বেদাধ্যায়ন করিতেছে ইহা খুব কমই দৃষ্ট হয়। ইহা শুনিয়া সেই কাঞ্চীপুরের দেবসদৃশ ব্রাহ্মণগণ কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন ছি, ছি! বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এমন অধঃপাতে গিয়াছে? সেই সময় যদি আমি বলি যে শত করা ৫ জনও সন্ধ্যাহ্নিক করেন না, তাহা হইলে আমাদের আরও মুখোজ্জ্বল হইত। বাস্তবিকই আমরা ইংরাজী বিদ্যা প্রভাবে এমনই ঘৃণ্য, জঘণ্য ও

ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হইয়াছি। যাহা হউক আমি তাঁহাদের বেদগান করিতে বলিলাম। তাঁহারা সমস্বরে সুর করিয়া যখন বেদ গান করিতে লাগিলেন তখন শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল, মনপ্রাণ যেন কিয়ৎক্ষণের জন্য স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। আহা কি সুন্দর! আমরা পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হেলায় কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া কাচের প্রলোভনে মোহিত হইয়াছি। ধিক্ আমাদিগকে!

শ্রীবরদারাজ স্বামী।

কিয়ৎক্ষণ পরেই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হইল। আহা কি দেখিলাম! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান্ ব্রহ্মণ্যদেব চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দিব্য মণিময় কিরীট ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। কণ্ঠাভরণ ও নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রাজবেশে শ্রীবরদারাজ স্বামী যেন হাস্য করিতেছেন। অতি সুন্দর ও সৌম্য মূর্ত্তি। দেবদর্শন করিয়া ক্লেশকর জীবন যেন ভগবৎ প্রেমে মোহিত হইল, প্রাণ ভরিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিতে লাগিলাম। এই সময় তাঁহার কর্পূরারতি হইতে লাগিল। দীপালোকে তাঁহার সুবর্ণ বদনখানি সুন্দররূপে দর্শন করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করিলাম। করজোড়ে ভগবানের চরণবন্দনা করিতে লাগিলাম। বলিলাম, হে প্রভু জগতের নাথ! আজ আমাদের যেমন চিত্তপ্রসন্নতা লাভ হইল, তদ্রূপ যেন আমরা চিরদিন এইরূপ প্রসন্নচিত্তে কালাতিপাত করিতে পারি এবং সংসারের সন্তাপাগ্নি যেন আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করিতে না পারে। হে নারায়ণ! হে মধুসূদন! হে বিপদ ভঞ্জন! যেন আসন্নকাল পর্য্যন্ত ত্বদীয় শ্রীচরণের সেবক হইয়া অন্তে ঐ চরণেই স্থান পাই। তৎপরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিম্নতলস্থ দেবী মহলে জগৎজননী লক্ষ্মীমূর্ত্তি দর্শন করিলাম।

বরদারাজ স্বামীর নিত্যপূজার প্রধান অঙ্গ পুষ্পাভিষেক। প্রতি শুক্রবারে জলধারার দ্বারা স্নান হইয়া থাকে। সেই সময়ে অর্চ্চক পুরুষসূক্ত পাঠ করেন। প্রথমে দেবতার আভরণ খুলিয়া তাঁহাকে তৈল মর্দ্দন করান হয়, তৎপরে তীর্থ সলিলে স্নান করাইয়া বস্ত্রদ্বারা গাত্র মুছাইয়া দেওয়া হয়। তখন বস্ত্র পরাইয়া যথাস্থানে অলঙ্কার সমূহ বিন্যস্ত করিলে পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এইরূপ সুন্দর সজ্জা প্রতি শুক্রবারে হইয়া থাকে। তজ্জন্য ইহাকে শুক্রবারের অভিষেক কহে। শুনিলাম অভিষেক দর্শনে পুণ্য অধিক। এইজন্য বিস্তর লোক অভিষেক দর্শনে আগমন করিয়া থাকেন। অভিষেকের পর ষোড়শ উপচারে পূজা ও অন্নব্যঞ্জনের ভোগ হইয়া থাকে। সেই ভোগ উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা পাইয়া থাকেন। পূজান্তে "মন্ত্রপুষ্প"নামে বেদমন্ত্র পাঠ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও কর্পূরারতি করিয়া পূজা সমাধা হইয়া থাকে; দেবীর পূজা প্রকরণ ইহাঁরই অনুকরণ। কাঞ্চীপুরে যজ্ঞ করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়, তজ্জন্য পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই স্থান মনোনীত করিয়া একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞস্থলের উত্তর দ্বার নারায়ণবন, পশ্চিমদ্বার বিরিঞ্চিপুর, পূর্ব্বদ্বার মহাবলীপুর এবং দক্ষিণদ্বার চিঙ্গলপুত।

এই মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ৩০০০ টাকার আয়ের কতকগুলি জমি আছে ও গবর্ণমেণ্ট হইতে ৯৯৬১ টাকা বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ আছে। এতদ্ভিন্ন উইল প্রদত্ত ধনের সুদ ২২৯০ টাকা; সর্ব্বশুদ্ধ ১৫২৫১ টাকা আয় আছে। দেবতার অলঙ্কারের মূল্য ১০৭০০০ টাকা। লর্ড ক্লাইভ্ শ্রীবরদারাজ স্বামীকে ৩৬৬১ টাকা মূল্যের একখানি কণ্ঠাভরণ প্রদান করেন, তাহা অদ্যাপি ভগবানের কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে। কলেক্টর প্লেস সাহেব ৩০৩২ টাকা মূল্যের একখানি অলঙ্কার এবং করনেল গারো সাহেব ৩৭১ টাকার চন্দ্রহার প্রদান করেন। বেঙ্কাদ্রী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ২৪০০০ টাকা মূল্যের মণিময় দিব্য কিরীট প্রদান

করেন। বরদারাজের মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শতস্তম্ভ মণ্ডপ বিদ্যমান। উক্ত মণ্ডপের স্তম্ভগুলি এক একখানি গ্রেনাইট প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। প্রত্যেক স্তম্ভেই বিষ্ণুর একটী করিয়া খোদিত মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বাহনমণ্ডপ ও কল্যাণমণ্ডপ শ্রেষ্ঠ।

আমরা বাহিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলাম একটী মাহুত সুন্দর হস্তী লইয়া বেড়াইতেছে। এটী শ্রীবরদারাজ স্বামীর বাহন। এইরূপ তাঁহার বিস্তর বাহন আছে। ভগবানের বাহনের মূল্য প্রায় ৩৪০০০ টাকা হইবে। তাঁহার এত বাহন যে বৈশাখ মাসে ১০ দিন ব্যাপিয়া যখন প্রধান উৎসব হয়, সেই সময় প্রত্যেক দিবসে বরদারাজ ভিন্ন ভিন্ন বাহনে শোভা যাত্রা করিয়া শিবকাঞ্চী সন্নিধানে গমন করেন। তাঁহার সহিত অন্যান্য দেবগণও গমন করিয়া থাকেন।

সহরের মধ্যে ছোট বড় ৭টী তীর্থ আছে। প্রত্যেকটী এক একটী বারের নামে অভিহিত। যেমন রবিতীর্থ, সোমতীর্থ, ইত্যাদি। যে বারের যে তীর্থ সেই বারে সেই তীর্থে স্নান করিতে হয়। রবিতীর্থে স্নান করিলে দেহ কাঞ্চনবর্ণ হয়। সোমতীর্থে স্নান করিলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। মঙ্গলতীর্থে স্নান করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। বুধতীর্থে মনোবেদনা দূর হয়, বৃহস্পতি তীর্থে মোক্ষলাভ, শুক্রতীর্থে জ্ঞানোদয় এবং শনিতীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

পাণ্ডাঠাকুর আমাদিগকে দেবদর্শন করাইয়া বাসায় সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তৎপরে আমাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভোগের টাকা দ্বারা ভোগ রন্ধন করিয়া শ্রীবরদারাজ স্বামীর মন্দিরে উৎসর্গ করতঃ সেই প্রসাদ আমাদের আহারের জন্য আনয়ন করিলেন। প্রভুর প্রসাদ পাইব এই আনন্দে সকলে পাতা লইয়া বসিলাম। পাণ্ডাঠাকুর পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আমরা সেই উপাদেয় পবিত্র অন্নপ্রসাদ সেবা করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রসাদ দেখিতে পলাওয়ের মত,

কিন্তু বড় ঝাল। তাহাতে প্রচুর ঘৃত, বাদাম ও তদ্দেশজাত দুই এক রকম মাটকড়াইয়ের মত পদার্থ ও কিস্‌মিস্ প্রভৃতি ছিল। লঙ্কা বর্জ্জিত হইলে রন্ধন অতি উপাদেয় হইত; কিন্তু দক্ষিণ দেশের প্রথা অনুসারে যথেষ্ট পরিমাণে লঙ্কা ও মরিচ দেওয়াতে যেন সব মিষ্টতা নষ্ট হইয়াছে। এ রন্ধন ও এ আহার্য্য দক্ষিণাত্যের পক্ষে উত্তম। এদেশের লঙ্কা খাইবার কথা শুনিলে পাঠক মহাশয়গণ অশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। প্রত্যেকে বোধ হয় প্রত্যহ ৵৫ পয়সার লঙ্কা খায়। আমাদের প্রসাদের রঙ্, ঠিক যেন মেজেণ্ডা রঙে রঞ্জিত। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন না, যে অন্ন ব্যঞ্জনের শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত এরূপ রঙ্ করা হইয়াছে। সুপক্ব লঙ্কা পুঞ্জের বর্ণে এইরূপ রাঙ্গা রঙ্গে রঞ্জিত। মুখে অর্পণ করিবামাত্র ঠিক যেন অগ্নিবৎ মনে হইতে লাগিল, শেষে দধি মিশ্রিত করিয়া কোন গতিকে কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। এইরূপ লঙ্কা প্রদত্ত না হইলে বস্তুতই প্রসাদ অমৃততুল্য হইত। যাহা হউক আমরা আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পাণ্ডার নিকট সুফল ও বিদায় লইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। গো-যানে চড়িয়া আমরা শিবকাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শিবকাঞ্চী।

আমরা বেলা প্রায় ৩টার সময় এই স্থানে পৌছিলাম। এই সময়ে মন্দিরটী মেরামত হইতেছিল। চতুর্দ্দিকেই বাঁশ দিয়া ঘেরা। শিবকাঞ্চীর দেবতার নাম একাম্রনাথ ও দেবীর নাম কামাক্ষীদেবী। দক্ষিণ দেশের প্রত্যেক মন্দির যেন একটা অদ্ভূত ব্যাপার। প্রায় অর্দ্ধ মাইল বা একটী গ্রাম জুড়িয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ ব্যাপার হইয়া থাকে। এই মন্দিরও তদ্রূপ প্রণালীতে নির্ম্মিত। মন্দিরটী একটী চতুষ্কোণ উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর মধ্যে অবস্থিত। প্রাচীরের

চারিদিকে চারিটী গোপুর। গোপুর অর্থে প্রবেশদ্বার বা ফটক; কিন্তু এ ফটক সামান্য ব্যাপার নহে। ইহা একটী প্রবেশদ্বারোপরি ক্রম-সূক্ষ্ম অতি উচ্চ চতুষ্কোণাকৃতি ১০।১৫ তল নহবত খানার মত অট্টালিকা বিশেষ এবং ইহার গাত্রে অসংখ্য দেবদেবীর খোদিত মূর্ত্তি বর্ত্তমান। প্রত্যেক তল নীচের তল অপেক্ষা পরিসরে ছোট, পরন্তু উচ্চতায় অল্প নহে। সর্ব্বোচ্চতলের উপর ৫।৭টী পিত্তলের কলস ঊর্দ্ধমুখে শোভা পাইতেছে। রাত্রিকালে এই গোপুরের সর্ব্বোচ্চভাগে আলোক প্রদত্ত হয়। দক্ষিণ দেশের প্রায় সমস্ত মন্দিরেরই এইরূপ গোপুর বা ফটক।

শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি।

গোপুর পার হইয়া সম্মুখে দেখি একটী উচ্চ বৃহৎ ধ্বজস্তম্ভ, পাথর দিয়া বাঁধান উঠান, তৎপরে একটী উচ্চ প্রাচীর, এই প্রাচীরের মধ্যে কামাক্ষী দেবীর মন্দির বিদ্যমান। বামদিকের উঠানের কোণে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত উৎসব-মণ্ডপ প্রায় শতাধিক স্তম্ভোপরি স্থাপিত। সম্মুখস্থ ধ্বজস্তম্ভ ঠিক বামদিকে রাখিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলে একটী প্রাঙ্গণ ভূমি পাওয়া যায়। এই মন্দির-প্রাঙ্গণে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সমাধি আছে। সমাধি গৃহটী ৮। ১০ হাতের অধিক নহে, দালান ও গৃহের ছাদে একটী গেরুয়া রঙ্গের পতাকা শোভা পাইতেছে। এই গৃহে শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ভগবান শঙ্করাচার্য্য জীবনের শেষভাগ একাম্রনাথের মন্দিরে অতিবাহিত করেন। ৩২ বৎসর বয়সে তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে কামাক্ষীদেবীর মন্দিরে তাঁহার সমাধি হয়। সেই সমাধির উপর এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহাঁর পাদদেশে ৬টী শিষ্যের মূর্ত্তি, ইহাঁরা দণ্ডহস্তে করযোড়ে দণ্ডায়মান। শঙ্করের কণ্ঠদেশে দুই ছড়া মালা, ও কর্ণে বড় বড় ছিদ্র করিয়া

তাহাতে বলয়াকার মোটা দুইটী মাকড়ী শোভা পাইতেছে। কপালে চন্দনের একটী বৃহৎ টিপ। পরিধানে গেরুয়া বসন। দক্ষিণ হস্তে একগাছি মোটা কঞ্চির দণ্ড। ইহাঁরও একটী ছোট পিত্তলের উৎসব-মূর্ত্তি আছে। প্রতিদিন শঙ্করাচার্য্যের পূজা, ভোগ ও আরত্রিক ক্রিয়াদি হইয়া থাকে এবং উৎসবকালে ঐ পিত্তল মূর্ত্তিটীর পূজা হইয়া থাকে।

৬০০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ, এন্, সিয়ং নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্তে কাঞ্চীপুরের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বৌদ্ধদিগের এইস্থান আবাসস্থান ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হইয়া শৈব-সম্প্রদায় স্থাপিত হয়।

একাম্বরনাথ।

শঙ্করাচার্য্যের মন্দিরটীকে ডানদিকে রাখিয়া প্রধান মন্দিরে যাইতে হয়। মন্দিরের চূড়া ও দেওয়ালে অতি সুন্দর কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু নিম্নভাগে বিশেষ কোন কারুকার্য্য নাই। শিবকাঞ্চীতে মহাদেব একাম্বরনাথের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ; মরুৎ ও ব্যোমের মধ্যে ক্ষিতিমূর্ত্তি বিরাজিত। তজ্জন্য লিঙ্গ মৃত্তিকায় নির্ম্মিত। অন্যান্য দেবালয়ের মত এখানে জলাভিষেক হয় না, কারণ তাহা হইলে মৃত্তিকা গলিয়া যাইবে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে পাঁচ স্থানে পাঁচ প্রকার শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। ১ম শিবকাঞ্চীতে ক্ষিতিমূর্ত্তি, ২য় জম্বুকেশ্বরে অপ্-মূর্ত্তি, ৩য় তিরুবন্নমলয়ে তেজ-মূর্ত্তি, ৪র্থ কালহস্তীতে বায়ু-মূর্ত্তি, ৫ম চিদম্বরমে ব্যোম বা আকাশমূর্ত্তি।

একাম্বরনাথের পূজা পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ তীর্থাভিষেক, দেবতার

গাত্রে জল দেওয়া হয় না। এই সময় নমকং ও চমকং নামে বেদমন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। তৎপরে বিষ্ণু-মন্দিরের প্রথামত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। এখানে প্রত্যহ বেদগান ও স্তোত্র পাঠ হইয়া থাকে। দেবীর মন্দিরে প্রতি শুক্রবারে জলাভিষেক হয়, অন্যবারে পুষ্পাভিষেক হয়। অভিষেকের সময় কাপড় খুলিয়া তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া তীর্থজলে স্নান করান হয়। তৎপরে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া নানাভরণে অলঙ্কৃত করিয়া পুষ্পমাল্যদ্বারা পরিশোভিত করা হয়। এই সময় কুঙ্কুমের তিলক ধারণ করাইয়া শ্রীসূক্ত ও ভূসূক্ত পাঠ করা হয়। তৎপরে আরতি করিয়া অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

একাম্বরনাথেরও ভোগমূর্ত্তি আছে। উৎসবের সময় উক্ত ভোগ-মূর্ত্তিকে মণি মুক্তাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া বাহকস্কন্ধে রথাভিমুখে আনয়ন করা হয়। সেই সময় ব্রাহ্মণগণ দেবতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেদগান করিতে করিতে অগ্রসর হন। তৎপরে রথে আরোহণ করাইয়া দেবতার রথযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসে পঞ্চদিবস ব্যাপিয়া উৎসব হয়। দশম দিবসে কামাক্ষী দেবীর ভোগমূর্ত্তিকে আনয়ন করিয়া একাম্বর নাথের ভোগমূর্ত্তির নিকট শয়ন করান হয়।

এই দেবালয়ের ব্যয়কারণ ১১০০ শত টাকা আয়ের কয়েক খানি গ্রাম ও নগদ ৭০৫৲ টাকা কলেক্টর সাহেবের নিকট হইতে বরাদ্দ আছে। এই দেবালয় কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় কখন সৈন্যনিবাস কখন বা হাঁসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইত। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের দরজার উপর অদ্যাবধি একটী গোলার দাগ রহিয়াছে।

আমরা বৈকালে একাম্বরনাথের মন্দিরে আসিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহার বিশেষরূপে অর্চনা করিবার সময় পাই নাই। কেবল মাত্র পুরোহিতদ্বারা তাঁহার সামান্য পূজা, কর্পূরারতি ও প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম। অন্ধকারগৃহে দীপালোকের সাহায্যে দেবদর্শন উত্তমরূপ

হইয়াছিল। দেবতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটী আম্রবৃক্ষ আছে, ইহা প্রায় ৪।৫ শত বৎসরের হইবে। এই বৃক্ষের চারিটী শাখায় কটু, তিক্ত, অম্ল ও মিষ্ট চারি প্রকার রসের আম্র হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঐ আম্রবৃক্ষে প্রত্যহ একটী করিয়া পাকা আম্র হইত, এবং সেই আম্রে দেবতার ভোগ দেওয়া হইত। সেই কারণে দেবতার আর একটী নাম একাম্রনাথ। আমরা বৃক্ষটীকে বিশেষ করিয়া দেখিলাম—বৃক্ষটী অতি প্রাচীন, কিন্তু আম্র দেখিতে পাইলাম না। এখন আর প্রত্যহ আম্র হয় না।

শিবকাঞ্চীতে একাম্রনাথের মন্দির ব্যতীত আরও কয়েকটী মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।" যথা—কৈলাসনাথ, বৈকুণ্ঠ পেরু-মল বিষ্ণুমন্দির। সময়াভাব প্রযুক্ত এইগুলির দর্শন আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। "বিদ্যাসুন্দর" পুস্তকে কবি ভারতচন্দ্র যে সুন্দরের বাটী কাঞ্চীপুর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন নিদর্শন এখানে পাওয়া গেল না। হয়ত সে এ কাঞ্চীপুর নহে, কিংবা বিদ্যাসুন্দর ঘটনাটা অলীকও হইতে পারে। কারণ কাঞ্চীপুরে সুন্দর সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না।

কাঞ্চীপুরের জোলাপাড়ায় বহুসংখ্যক জোলার বাস। তাহাদের বস্ত্রবয়ন উপজীবিকা, তাহারা দেশীয় রেশমী ধুতি, সাড়ী, দোপাট্টা, রুমাল এবং জরির কাজকরা চাদর ও পাগড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করে। রেসমী কাপড় ৩।৪ টাকা গজ এবং রুমালের মূল্য প্রত্যেক খানি ১৲ টাকা। শিবকাঞ্চীতেও আমাদের নিকট একজন পাণ্ডা জুটিয়াছিল। সেই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে করিয়া মন্দিরাদি দর্শন করাইয়াছিলেন, আসিবার কালীন তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া সকলে ষ্টেশনের দিকে আসিলাম। বিষ্ণুকাঞ্চীর পাণ্ডার তুলনায় ইহাঁর প্রাপ্য কিছুই হয় নাই, তথাপি ইনি অল্পেই সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের সহিত ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

এই স্থানে আমারা কাঞ্চীপুরের বর্ণনা সমাপ্ত করিলাম। তৎপরে South Indian Ry. লাইন দিয়া বিল্লপুরম্ গমন করিলে কালহস্তী, তিরুপতি, ভেলোর প্রভৃতি যে সকল দ্রষ্টব্য তীর্থ আছে, তাহাদের বিষয় বর্ণনা করিয়া সর্ব্বশেষে বিল্লপুরম্ বর্ণিত হইবে।

কালহস্তী।

(South Indian Ry. লাইনে) গুডুর হইতে ৪টী ষ্টেশন পরে কালহস্তী ষ্টেশন। এই ষ্টেশনের এক মাইল দূরে মন্দির ও রাজবাটী অবস্থিত। এখানে সুবর্ণমুখী নদী প্রবাহিত। ইহার দক্ষিণ তীরে কালহস্তী নগর। নৌকাযোগে নদী পার হইয়া যাইতে হয়। এইস্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম বায়ু-মূর্ত্তি বিদ্যমান। মন্দিরটী অতি পুরাতন; সম্মুখের গোপুর অতি উত্তম কারুকার্য্যবিশিষ্ঠ এবং বৃহৎ। এখানকার শিবমন্দিরই প্রধান তীর্থ। এই মন্দির কৈলাস নামক পর্ব্বতের পাদদেশে ও সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ ইহাকে দ্বিতীয় কাশী সদৃশ পুণ্যতীর্থ জ্ঞান করেন। কথিত আছে যে ব্রহ্মা এই স্থানে তপস্যা করিবার জন্য কৈলাস পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গ আনিয়া এই স্থানে স্থাপন করেন। তদবধি এই পর্ব্বত দক্ষিণ কৈলাস নামে অভিহিত হইয়াছে। ব্রহ্মা এইস্থানে স্বয়ং এই মন্দিরের মূল স্থাপন করেন। অন্যান্য অংশ বিজয়নগরের কৃষ্ণ রায়ালু ও চোলরাজা নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

কালহস্তী নামের একটী প্রবাদ আছে। এক নাগ ও এক হস্তী উভয়ে মহাদেবের আরাধনা করিত। নাগ মহাদেবের মস্তকে আপনার মণি রাখিয়া এবং হস্তী জলাভিষেক দ্বারা আরাধনা করিত। একদিন হস্তী জলাভিষেক করিতেছে, সেই জল নাগের গাত্রে কিঞ্চিৎ লাগাতে নাগ ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তীর শুণ্ডে দংশন করিল। হস্তী যন্ত্রণায়

অস্থির হইয়া ক্রোধে এমন জোরে নাগকে আঘাত করিল যে সেই আঘাতেই নাগরাজ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। কাল সর্পের বিষে হস্তীও মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মহাদেব তাহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি তাহাদের পুনরায় জীবন দান করিয়া তাহাদের নামে নিজ আলয়ের নাম রাখিলেন। কাল অর্থে সর্প এবং হস্তী এই উভয়ের নামে কালহস্তী নাম হইল। এই কারণে মন্দিরের সম্মুখে নাগ ও হস্তীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন একটী ঊর্ণ-নাভের মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিটী যে কেন তাহা বলিতে পারি না। মূল স্থানে শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি আছেন। এখানে বায়ু প্রবেশের কোন পথ নাই, সুতরাং গৃহটী অন্ধকার। তজ্জন্য মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দীপ জ্বলিতেছে। এখানে একটু বিশেষত্ব আছে। লিঙ্গের মাথার উপর যে দীপালোক ঝুলান আছে তাহা সর্ব্বদাই যেন বায়ুভরে দুলিতেছে। অন্যান্য প্রদীপ আদৌ আন্দোলিত হয় না। এই কারণে উক্ত লিঙ্গ বায়ুলিঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে। উপরের আলোক দুলিবার একটা কারণ আছে। নিম্নের আলোকের উত্তাপে উপরিস্থিত বায়ু আন্দোলিত হয় এবং তাহার সাহায্যে লিঙ্গের মস্তকোপরি প্রদীপ আপনা আপনি দুলিতে থাকে। স্বাভাবিক এই কারণ, কিন্তু কালহস্তীর হিন্দু অধিবাসিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে ইহা দেবতার মহিমা। শিবলিঙ্গ সাধারণতঃ যেরূপ দণ্ডগোলাকৃতি হয়, কালহস্তীর লিঙ্গ তদ্রূপ নহে, ইহাঁর আকৃতি চতুষ্কোণাকৃতি। ইহাঁর নিকট একটী লিঙ্গরূপী ব্যাধ মূর্ত্তি আছে, ইহার কারণ এই যে কন্নাপন নামে এক ব্যাধ প্রত্যহ আহার করিবার পূর্ব্বে আহার্য্য দ্রব্য মহাদেবকে অর্পণ করিয়া পশ্চাৎ প্রসাদ পাইত। একদিন ব্যাধের ধারণা হইল যে মহাদেবের একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছে তজ্জন্য তিনি দেখিতে পান না; এই বিবেচনা করিয়া আপন চক্ষু উৎপাটন করিয়া মহাদেবের একটী চক্ষে বসাইয়া দিল।

কিয়দ্দিবস পরে আবার তাহার ধারণা হইল যে মহাদেবের আর. একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছে এই বিবেচনা করিয়া মহাদেবের চক্ষুর স্থানে আপন পা রাখিয়া দুই হস্তে বাকী চক্ষু উৎপাটন করিয়া মহাদেবের চক্ষুতে বসাইয়া দিল। অদ্যাপি মহাদেবের চক্ষুতে ভক্ত ব্যাধের পদচিহ্ন দৃষ্ট হয়।

এখানকার দেবীর নাম জ্ঞানপ্রসন্না এবং অপর একটী দেবী মন্দির আছে তাহার নাম দুর্গামা। শিবমন্দিরের দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের পার্শ্বে আর একটী শিবমন্দির আছে তাহার নাম মণি-কুণ্ডেশ্বর স্বামী। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এই স্থানে মহাদেব মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করেন। তজ্জন্য মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগকে এই স্থানে আনা হয়। এই মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মন্দির আছে। ইহা পর্ব্বতের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের মূলস্থান দ্বিতলে এবং মন্দির গাত্রে নানা প্রকার মূর্ত্তি খোদিত আছে।

ব্রহ্মার মন্দিরের দক্ষিণে একটী প্রস্তরঘাটযুক্ত প্রশস্ত পুষ্করিণী আছে। ইহার সন্নিকটে পাহাড়ের উপর ভরদ্বাজ মুণির আশ্রম। তথায় তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যহ পূজা পাইতেছেন। এখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে বিয়ালিঙ্গকোণা নামক পাহাড়ে সহস্র লিঙ্গ মহাদেব আছেন।

কালহস্তীর জমীদার এক্ষণে রাজা উপাধিতে ভূষিত। শিবরাত্রির উৎসবের সময় রাজাবাহাদুর তাঁহার ঘোড়া এবং হাওদাযুক্ত হস্তী এবং আশাশোটা ও বর্ষাধারী বিস্তর পদাতিক প্রভৃতি পাঠাইয়া কালহস্তী-দেবের শোভাযাত্রা সম্পন্ন করেন। উৎসবের অষ্টম দিবসে দেবতার ভোগমূর্ত্তি রথে আরোহণ করিয়া নগর পরিভ্রমণ করেন, সেই দিবস উক্ত শোভাযাত্রা বাহির হয়। দেবতার অলঙ্কার ও আভরণাদির মূল্যও প্রায় লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে অনেক মণিমুক্তা অপহৃত হইয়াছে।

তিরুপতি—বালাজী।

কালহস্তী ষ্টেশনের ২টী ষ্টেশন পরেই তিরুপতি ষ্টেশন। প্রথম তিরুপতি ইষ্ট, তৎপরে তিরুপতি ওয়েষ্ট। শেষোক্ত ষ্টেশন হইতে দেব মন্দির প্রায় ১ মাইল দূর। ১ মাইল হাঁটিয়া পর্ব্বতে উঠিতে হয়। ছয়টী পর্ব্বত শৃঙ্গ পার হইয়া শ্রীব্যঙ্কট রমণাচলম্ বা শেষাচলম্ নামক সপ্তম শৃঙ্গে দেবমন্দির অবস্থিত। তিরুপতির অপর নাম বালাজী বা শ্রীব্যঙ্কটেশ্বর। পর্ব্বতের উপরে উঠিবার ৪টী পথ আছে। ১ম নিম্ন তিরুপতি হইতে উত্তরদিকে, ২য় চন্দ্রগিরির দিক হইতে পূর্ব্ব উত্তরাভিমুখে, ৩য়টী নাগাপট্টম হইতে পশ্চিমে, এবং ৪র্থ বালপট্ট হইতে পূর্ব্বদিকে। তন্মধ্যে নিম্ন তিরুপতির দিক হইতেই যাত্রীগণ উপরে উঠিয়া থাকেন। তিরুপতির পাহাড়ে যে ৭টী শৃঙ্গ আছে তাহার প্রত্যেকটী পুণ্যভূমি বলিয়া খ্যাত। পর্ব্বতে উঠিবার পূর্ব্বে সহরের ১ মাইল উত্তরে কপিলা তীর্থ নামক সরোবরে স্নান করিতে হয়। "তিরুপতি ইষ্ট" নামক ষ্টেশনের নিকট মোহান্ত বাস করেন। তিনিই এই মন্দিরের হর্ত্তাকর্ত্তা। দক্ষিণ ভারতে ইহা একটী প্রসিদ্ধ ধনশালী মন্দির, এবং প্রধান বৈষ্ণব তীর্থ। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিম হইতে এখানে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়; কিন্তু বঙ্গবাসীর নিকট ইহা অজ্ঞাত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে।

বরাহপুরাণে উল্লিখিত আছে, পূর্ব্বে ভগবান্ রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে বনবাস কালীন এইস্থানে আসিয়া স্বামী তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। উক্ত পুরাণে ৪১ অধ্যায়ে দেখা যায়, যে পাণ্ডবগণ বনবাস কালে এই পর্ব্বতে আসিয়া ১ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে তীর্থতটে ছিলেন তাহার নাম পাণ্ডবতীর্থ। এই পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঝরণা ও তাহার নিকট ছোট বড় জলাশয় আছে। তাহারা

সকলেই পুণ্য তীর্থ বলিয়া খ্যাত। ১ম স্বামীতীর্থ, ২য় বিয়ৎগঙ্গা বা আকাশ গঙ্গা, ৩য় পাপনাশিনী, ৪র্থ পাণ্ডবতীর্থ, ৫ম তুম্বীর কোণা, ৬ষ্ঠ কুমারবারিকা এবং ৭ম গোগর্ভ।

যাহা হউক এই তীর্থ যে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাত্রীগণ পর্ব্বতে উঠিবার পুর্ব্বে মানসিক করিয়া ব্যঙ্কটেশ কাঁটা কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া পর্ব্বতে উঠিতে থাকে। এই কাঁটা স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যে নির্ম্মিত হয়। পরে হাঁটিয়া তিরুমলয় পর্য্যন্ত গমন করিয়া স্বামীতীর্থে স্নান করে। তখন উক্ত কাঁটা খুলিয়া পড়ে। তৎপরে রুহিদাস কোবিলের পশ্চাতে এক বৃহৎ গোপুর আছে। তাহার নাম অলিপিলি। এই গোপুর পর্য্যন্ত প্রায় সকলে আসিতে পান, তৎপরে হিন্দু ব্যতীত অন্যজাতি গমন করিতে পান না। এমন কি ইতর শ্রেণীর শূদ্রগণও তথায় অগ্রসর হইতে পায় না। এই স্থান হইতে উপরে উঠিবার পাকা সিঁড়ি আরম্ভ। প্রায় সকলেই পদব্রজে গমন করেন। যাঁহারা উপরে উঠিতে অক্ষম তাঁহারা ডুলিতে চাপিয়া উঠিয়া থাকেন। এই সিঁড়ি প্রায় ১ মাইল উচ্চ, সমতল ভূমি হইতে প্রায় ১০০০ ফুট। সোপান শ্রেণীর উপরে বিশ্রাম জন্য স্থানে স্থানে মণ্ডপ আছে। পর্ব্বতোপরি যে স্থানে সোপান শেষ হইয়াছে তথায় একটী বৃহৎ গোপুর আছে। ইহার নাম গালিগোপুর। পর্ব্বতোপরি এই গোপুর দর্শন করিলে মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। ক্ষণেকের জন্য সংসার-ক্লেশ দূর হয় এবং উত্ত্যক্ত জীবন শান্তি লাভ করে। তখন মনে হয় এত শ্রম করিয়া যে উপরে উঠিলাম তাহা সার্থক হইল।

এই গোপুরের পশ্চাতে বৈকুণ্ঠ নামক কোবিল রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিদ্যমান। এই স্থানে বিশ্রামের স্থান আছে। যাত্রীগণ উপরে উঠিয়া ক্লান্ত হইলে এই স্থানে বিশ্রাম করেন। ইহার ঈশান কোণে বৈকুণ্ঠ গুহা। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন কালে অনুচরগণ এই

গুহাতে আশ্রয় লইয়াছিল। এই স্থান হইতে ব্যঙ্কটেশ মন্দিরে যাইবার পাকা রাস্তা আছে। এই স্থানটী তিরুমল গিরিস্থ সামান্য নগর এবং এই স্থানই স্বামীতীর্থ। এখানে যাত্রীদের থাকিবার অনেক গুলি ছত্র আছে। মহীসুর কোচীন ও কালহস্তীর রাজগণ এই সকল ছত্রবাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরের সম্মুখে রাস্তার উপরে কয়েক খানি দোকান আছে। তথায় পিত্তলের বাসন, ব্যঙ্কটেশ স্বামীর মূর্ত্তি ও আহারের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হয়। অপর দিকে উচ্চ জমির উপর মোহন্তের আখড়া। তৎপরে কারুকার্য্য বিশিষ্ট সহস্র-স্তম্ভমণ্ডপ। এইরূপে গোপুর ও মণ্ডপ সকল পার হইয়া শেষে মূল মন্দিরের প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। দেবালয়, ভিন্ন ভিন্ন তিনটী প্রাচীর দ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রাচীর ১৩৭ গজ লম্বা ও ৮৭ গজ প্রশস্ত; প্রবেশ দ্বারোপরি একটী সামান্য গোপুর আছে।

দেবালয়ের উপরের গম্বুজটী কলধৌত সুবর্ণ পত্রীদ্বারা মণ্ডিত, মূল স্থান অতি ক্ষুদ্র, তথায় বায়ুপ্রবেশের পথ নাই; তাহার মধ্যস্থলে ৭ ফুট উচ্চ প্রস্তরময় চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। দেবদর্শন কালীন কিছু প্রণামী দিতে হয়। দেবের প্রথমে দুগ্ধস্নান হইয়া থাকে, সেই সময় ১৩৲ টাকা দিলে দেবদর্শন হয়। এই সময় পুরুষসূক্ত বেদ পাঠ করিতে করিতে তৈল মর্দ্দন করাইয়া দুগ্ধ ও তীর্থবারিতে ভগবানের স্নান হইয়া থাকে। তৎপরে দিব্য আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া তুলসী ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া কর্পূরের আরত্রিক করা হয়। এই সময় দেবদর্শন করিলে ১৲ টাকা মাত্র দিতে হয়। বেলা ১২টা হইতে ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত অর্চ্চনা ও ভোগপ্রদান কার্য্য হইয়া থাকে। ইহার পর দেবদর্শনের আর টাকা লাগে না। জগন্নাথ-ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও প্রসাদ ভক্ষণে জাতিভেদ নাই। এখানকার প্রধান উৎসব আশ্বিন মাসে ১০ দিন ব্যাপিয়া সম্পন্ন হয়। উৎসবের

পঞ্চম দিবসে গরুড়োৎসব, দশম দিবসে নারায়ণ বনে পদ্মাবতীর সহিত কল্যানোৎসব হইয়া থাকে।

ব্যঙ্কটেশ স্বামীর মন্দিরের বহির্ভাগে স্বামী পুষ্করিণীতীরে একটী ছোট মন্দিরে বরাহ অবতারের মূর্ত্তি বিদ্যমান। এই সপ্তশৃঙ্গ প্রায় ৭ মাইল; সুতরাং ডুলি ভিন্ন পদব্রজে গমন বিশেষ কষ্টকর, কিন্তু কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসিলে চতুর্দ্দিকে শৈলমালার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলে মন স্বর্গীয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এই স্থানে তিরুমলয় শ্রেণীর গাত্রে কপিলতীর্থ নামে যে জলপ্রপাত আছে তাহার দৃশ্য কি মনোরম। বিশেষ বর্ষাকালের শোভা বর্ণনাতীত। এই স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১টী দেবালয় আছে। তন্মধ্যে গোবিন্দস্বামী ও রামস্বামীর দেবালয় প্রসিদ্ধ। শুনিলাম গোবিন্দস্বামী ব্যঙ্কটেশ স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইনি বিষ্ণুমূর্ত্তি ও শেষ শয্যায় অর্দ্ধশায়িত। রামস্বামীর মন্দিরের গোপুর অতি উচ্চ ও কারুকার্য্য বিশিষ্ট। পাঠকগণ ভাবুন এই সাত মাইল ব্যাপিয়া পর্ব্বতোপরি কি অদ্ভুত গোপুর ও দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংরাজেরা ইহাকে Seven Pagodas বলিয়া থাকে।

মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্য এই স্থানে আসিয়া ছিলেন, সেই সময় সকলেই ইহা শিবমন্দির বলিয়া জানিত; তৎপরে শ্রীরামানুজাচার্য্য ইহা বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করেন। প্রবাদ এই যে, এই স্থানে তিনি আসিয়া দেবমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিবাদ করেন—"এ মূর্ত্তি শিবের নহে, ইহা বিষ্ণুমূর্ত্তি।" এই কথা পাণ্ডাগণ অগ্রাহ্য করেন। তাহাতে শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন অদ্য মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকুক কল্য প্রাতে বিগ্রহ যে মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ হইবেন সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহার পূজা প্রচলিত হইবে। কথিত আছে যে মন্দিরের জল নির্গমনের পথ দ্বারা রামানুজস্বামী অণিমাসিদ্ধি সাহায্যে মক্ষিকারূপ ধারণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিগ্রহকে

বিষ্ণুমূর্ত্তিতে সজ্জিত করেন। পর দিবস প্রাতে দেখা গেল যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব বিষ্ণুমূর্ত্তি শোভা পাইতেছেন। সুতরাং রামানুজেরই জয় হইল। তদবধি এই মূর্ত্তি রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক পূজা পদ্ধতির অনুসারে পূজিত হইতেছেন। এক্ষণে তিরুপতি একটী প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ।

ভেলোর বা বেল্লুর।

তিরুপতি হইতে ৬টী ষ্টেশন পরে কাটপাডি জংসন, ইহারই পরবর্ত্তী ষ্টেশন ভেলোর (Vellore)। ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ও ইহাতে প্রায় ৪৫ হাজার লোকের বসতি। এখানকার দুর্গস্থিত দেবালয় দেখিবার উপযুক্ত। বোম্মিরেড্ডী নামক এক ভক্ত কর্ত্তৃক ১১৯৫ খৃঃ অব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইনি প্রথমে পশুপালক ছিলেন, শেষে বর্দ্ধিষ্ট হইয়া দেবতার অনুগ্রহে উক্ত মন্দির নির্ম্মাণে সমর্থ হন।

বোম্মিরেড্ডীর একটী গাভীর পাঁচটী বাঁট ছিল। এই গাভী প্রত্যহ দ্বীপোপরি একটী বল্মীক ঢিপির উপর গমন করিত, তথায় একটী পঞ্চমুখ বিশিষ্ট সর্প বাহির হইয়া উক্ত দুগ্ধ পান করিত। এদিকে গাভী বাটী আসিয়া আর দুগ্ধ দিত না। ইহার কারণ জানিবার জন্য বোম্মিরেড্ডী একদিন গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া উক্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেন। সেই রাত্রে মহাদেব স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিয়া বলেন যে নিকটস্থ পাহাড়ের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গুপ্ত ধন ও আমার লিঙ্গ আছে, তুমি উক্ত অর্থে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আমার প্রতিষ্ঠা করিবে। পরদিবস তিনি তথায় গমন করিয়া প্রভূত অর্থ ও শিবলিঙ্গ দেখিতে পান। তাহার সহিত একটী কুকুর ছিল সেটী একটী খর-গোসকে তাড়া করে। খরগোস প্রাণভয়ে পলাইয়া উক্ত বল্মীক ঢিপির উপর পরিভ্রমণ করিতে থাকে। তখন দৈববাণী হইল,

যে স্থান দিয়া খরগোস গিয়াছে সেই পরিমাণ স্থানে দেবমন্দির নির্ম্মাণ কর। বোম্মিরেড্ডী ভগবানের আদেশ মত উক্ত দেবমন্দির ৯ বৎসরে নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শিবমন্দির স্থাপন করিলেন। দেবতার নাম হইল জলকান্তীশ্বর মহাদেব।

এই মন্দির দেখিতে অনেকটা দুর্গের মত। স্থানীয় রাজার বংশধরগণ ১৫০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করেন। পরে বিজয় নগরের রাজা কৃষ্ণ রায়ালু উক্ত দুর্গ ও মন্দির অধিকার করিয়া শিবালয়ের কল্যাণ (বিবাহ) মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে রায়-বংশীয় রাজগণ তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের উচ্ছেদ করিয়া তথায় রাজত্ব করেন। ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে গোলকুণ্ডার বাদসাহ আবদুল্লা খাঁ ইহা অধিকার করেন। এইরূপ ক্রমাগত হিন্দু ও মুসলমানের জয়পরাজয়ে এমন সুন্দর ও পবিত্র মন্দির ক্রমে নষ্ট হইতে লাগিল, শেষে হিন্দুশাসন একেবারে লুপ্ত হইল। মুসলমানের অত্যাচারে জলকান্তীশ্বর মহাদেব একেবারে অন্তর্হিত হন।

শেষে ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজী উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়া দেবতার পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিগ্রহের দর্শন পান নাই। তদবধি উক্ত মন্দির লিঙ্গশূন্য হইয়া আছে। হাইদর আলির সময় উহা মহীসুর রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে শেষ মহীসুর যুদ্ধে ইহা ইংরাজদের দখলে আসে এবং সেই অবধি ইহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আছে। এই মন্দিরযুক্ত দুর্গমধ্যে ইংরাজ সৈন্যনিবাসের প্রধান আড্ডা ছিল। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে টিপু সুলতানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র কন্যা ও বেগমদিগকে এই স্থানে নজরবন্দি রাখা হয়। শেষে এই দেবালয় প্রাঙ্গণে কমিসরিয়েট গুদাম করা হইয়াছিল, তৎপরে মান্দ্রাজ গবর্ণর ডিউক অফ বকিংহম এই মন্দিরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তথা হইতে গুদাম:

উঠাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ দেন। সেই অবধি মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কৃত আছে।

এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সুগভীর প্রশস্ত গড়খাই। ইহা পালার নামক নদীর সহিত সংযুক্ত। মন্দিরের আকৃতি দক্ষিণ দেশীয় মন্দিরের মত। সম্মুখে সুবৃহৎ ও সুন্দর গোপুর আছে। মন্দিরের আভ্যন্তরিক স্তম্ভে এমন সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট পুত্তলিকা সকল খোদিত আছে যে দেখিলে মনে হয়, তৎকালের ভাস্করগণ কিরূপে ঐরূপ স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে ঐরূপ একটা স্তম্ভ প্রস্তুত করিতে বোধ হয় সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইবে, অথচ ঐরূপ সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট হইবে কি না সন্দেহ! গড়খাই দেবালয়ের মূলস্থানের সহিত যোগ থাকাতে মন্দি-রের প্রাঙ্গণেও মধ্যে মধ্যে জোয়ারের সময় জল আসে। এই মন্দির ও দুর্গ এত উত্তম ও সুদৃঢ় যে দক্ষিণ দেশের সমস্ত দুর্গ অপেক্ষা ইহা সুদৃঢ়তম। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর তজ্জন্য অনেক বড়লোক ও সাহেবগণ এই সহরে বাস করেন।

বিরিঞ্চিপুর।

মান্দ্রাজ হইতে যে লাইনটী আর্কোনম্ জংসন ও কাটপাডি জংসন পার হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ইরোড ও কৈয়ম্বটোর গিয়াছে, সেই লাইনে বিরিঞ্চিপুর অবস্থিত। ইহা কাটপাডি জংসন ষ্টেশনের পরে পালার নদীর দক্ষিণ তীরে বিরিঞ্চিপুরম্ নামে খ্যাত। এই ষ্টেশন হইতে সহর ও দেবালয় তিন মাইল দূরে দক্ষিণ দিকে বর্ত্তমান। এখানকার দেবতা শিবলিঙ্গ; ইনি অতিশয় জাগ্রত দেবতা, তজ্জন্য স্থানীয় লোকের ইহাঁর উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি কিছু অধিক। দেবতার নাম মুরগেধারীশ্বর। কাঞ্চীপুরে ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে শক্তিদেবী এই স্থানে আসিয়া বিরিঞ্চিপুরের দ্বার রক্ষা করেন। কিন্তু এস্থানে ব্রহ্মা বা শক্তির কোন মন্দির দেখিলাম না।

দক্ষিণ দেশে যত মন্দির দেখিলাম প্রায় সমস্তই শিবমন্দির। শক্তি মন্দির যাহা কিছু দেখা যায় তাহার প্রাধান্য নাই,—সে সমস্তই শিবমন্দিরের অধীন। রামানুজাচার্য্য বা তদীয় শিষ্যগণের চেষ্টায় কয়েকটী বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোথাও রাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখিলাম না। সেই ফুল্লেন্দীবরকান্তি ইন্দুবদন কলবেণু-বাদনপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিলাম না। কোথাও বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকাও দেখিলাম না। বৈষ্ণবদিগের মন্দিরে বিষ্ণু-মূর্ত্তি দেখিলাম; কিন্তু পার্শ্বে রাধাকৃষ্ণের মত লক্ষ্মীদেবীকেও দেখিলাম না। এই কারণে দাক্ষিণাত্যের দেবদর্শনে মনে ভক্তিভাবের উদ্রেক কম হয়। আমাদের শাস্ত্রে যত অসুর, রাক্ষস ও দানবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই দাক্ষিণাত্য; তজ্জন্য দাক্ষিণাত্যে কেবল শিব মন্দির। দৈত্য বা রাক্ষসগণ প্রায় শৈব। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও তদ্দক্ষিণের প্রায় সমস্ত স্থানই যে অসুরদের আবাস ভূমি ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ এইস্থানের অধিবাসী-গণের আকৃতি বা প্রকৃতি দেখিয়া তাহাদেরই বংশধর বলিয়া অনুমিত হয়। অধুনা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কৃপায় ইহারা কিছু কিছু ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সভ্য ও মনুষ্যপদ বাচ্য হইয়াছে মাত্র। নচেৎ সেই কুক্কুটাদির মাংস ভোজন, আণ্ডু মাণ্ডু করিয়া বাক্য উচ্চারণ, পরিধানেরও চমৎকার বসন ভূষণ। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপর জাতিরা অসুর বা রাক্ষসের বংশধর।

বিরিঞ্চিপুরের মন্দিরের গোপুর অতি উত্তম। ইহার ৪ দিকে ৪টী গোপুর আছে। বীর গম্ভীর রায়ার নামক জনৈক রাজা পূর্ব্বদিকের গোপুর ও শতস্তম্ভ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বেল্লুরের বোম্মিরেড্ডি ও তাঁহার পুত্রদ্বয় ৩টী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ধনপালু কোটী নামক জনৈক বণিক বাহির প্রকোষ্ঠের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই

সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। ধনপালু কোটী মরিচ বিক্রয় করিবার জন্য কাঞ্চীপুরে যাইতে যাইতে মানসিক করেন "যদি নির্ব্বিঘ্নে তথায় পৌঁছিতে পারি তাহা হইলে ১০ বস্তা মরিচ বিক্রয়লব্ধ অর্থে বিরিঞ্চিপুরের মন্দির সংস্কার করিয়া দিব। পথিমধ্যে একদল দস্যু আসিয়া মরিচ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলে মহাদেব অশ্বারূঢ় হইয়া সমস্ত রক্ষা করেন। তৎপরে বণিক কাঞ্চীপুরে পৌঁছিলে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয়। প্রতিজ্ঞাপালনে অনিচ্ছুক হওয়াতে উক্ত বণিক বস্তা খুলিয়া দেখেন যে সমস্ত মরিচ ছোলা হইয়া রহিয়াছে। তখন ঐ বণিক অনুতাপ করিয়া পুনরায় প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি বহিঃপ্রাচীর ও গোপুর নির্ম্মাণ করিয়া দিব! এইরূপ পুনঃ পুনঃ মানসিক করিলে দেখেন যে ছোলা আবার মরিচ হইয়াছে। তখন কালবিলম্ব না করিয়া বিরিঞ্চিপুরে প্রত্যাগমন করিয়া মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণের প্রাচীর নির্ম্মাণ ও দেবালয় সংস্কার করিয়া দেন।

মন্দিরের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে একটী তীর্থ আছে। তাহাতে বন্ধ্যাস্ত্রী ও ভূত প্রেত দ্বারা আক্রান্ত নরনারী স্নান করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। শতস্তম্ভ মণ্ডপে ভগবানের বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে। ইহাকে কল্যাণ উৎসব কহে। মন্দির এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত। মন্দিরের ব্যয় কারণ কোম্পানী বাহাদুর বাৎসরিক ১৬ শত টাকা দিয়া থাকেন। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। চৈত্র মাসে উৎসবের সময় বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

তিরুবন্নমলয়।

পূর্ব্বোক্ত ভেলোর হইতে ৫টী ষ্টেশন পরে তিরুবন্নমলয় ষ্টেশন। South Indian Ry. Lineএ ইহা একটী বড় ষ্টেশন। এখানে গাড়ী প্রায় ১০ মিনিট অপেক্ষা করে। তিরুবন্নমলয়ের সংস্কৃত নাম অরুণা-

চলম্। মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির তেজমূর্ত্তি এখানে বিরাজমান। ষ্টেশন হইতে তিরুবন্নমলয় সহর অর্দ্ধ মাইল মাত্র ও অরুণাচল পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। হিন্দুদিগের জন্য এখানে ৫টী ছত্রবাটী আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে ছোট খাট প্রায় আরও ৩০টী ছত্র আছে। এদেশে অনেক ইংরাজ বাস করেন; তাঁহারা ষ্টেশনের ২ মাইল দক্ষিণে প্রায়ই খরগোস ও সজারু শীকার করিয়া বেড়ান।

শিবলিঙ্গই এই স্থানের প্রধান দেবতা। দেবতার নাম তিরুবন্ন-মলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশ্বর। ইহাঁর দেবীর নাম অপীতকুচাম্বল বা উন্নমাল্লুই। দেব দেবীর ভোগমূর্ত্তি আছে। উৎসবের সময় ভোগমূর্ত্তির দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। মন্দিরটী গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহা অতি পুরাতন মন্দির বলিয়া অনুমান হয়। ইহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, বহির্দ্দিকে ৪টী প্রকাণ্ড গোপুর আছে। ইহা ৭টী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রথমটী উৎসবমণ্ডপ। এখানে ভোগমূর্ত্তি আনীত হইয়া মহা মহোৎসব হইয়া থাকে। বহুস্তম্ভ দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। ইহার পর পর ছয়টী প্রকোষ্ঠ আছে এইগুলি ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অন্ধকার হইতে অন্ধকারতম। এই কারণে দিবাভাগেও দীপ সাহায্যে প্রকোষ্ঠগুলি আলোকিত করা হয়। সপ্তম প্রকোষ্ঠ বা মূল-স্থানে অন্ধকার গৃহে শিবলিঙ্গের তেজমূর্ত্তি বিরাজমান। এই স্থানে বায়ু বা আলোক প্রবেশের কোন উপায় নাই। আলোকের সাহায্য ভিন্ন, দেবতা দেখিবার আশা বিড়ম্বনামাত্র। কেবল অন্ধকার—পূজক ভিন্ন যাত্রীদের তথায় গমন নিষিদ্ধ। তিনি আলোক লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে যাত্রীগণ সম্মুখস্থ বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেবদর্শন করেন। তৎপরে যাত্রীগণ ক্ষমতানুযায়ীক যেরূপ দক্ষিণা দিবেন তদ্রূপ তাঁহাদের নামে অষ্টোত্তর শত বা সহস্র নাম অর্চ্চনা, নারিকেল, সুপারি, পান, কদলী প্রভৃতির ভোগ ও কর্পূরারতি হইয়া থাকে। সেই সময়

বেদপাঠ হয়। এই মন্দিরে সুন্দর কারুকার্য্য-খোদিত বিস্তর আভ্যন্তরিক প্রকোষ্ঠ আছে। তন্মধ্যে যথায় গণেশজী থাকেন, সেই মন্দিরটী ও সহস্র স্তম্ভযুক্ত হল বা নাটমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিস্তৃত প্রাঙ্গণমধ্যে একটী ধ্বজ-স্তম্ভ বা সোণার তালগাছ আছে। গণেশ-মন্দিরের একটী প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

এইখানে বৎসরে দুইবার উৎসব হইয়া থাকে। প্রথম কার্ত্তিক মাসে ২য় চৈত্র মাসে। কার্ত্তিক মাসের উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় দুই তিন লক্ষ লোক সমবেত হয়। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্, পুলিশ ইনস্পেক্টর, কনষ্টেবল প্রভৃতি কোম্পানির কর্ম্মচারী ও বিস্তর সাহেব এই উৎসবে একত্রিত হন। মণ্ডপের ছাদের এক অংশ সাহেবগণ অধিকার করিয়া থাকেন। পুলিশ প্রহরীরা চতুর্দ্দিকে জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শান্তি স্থাপনের সহায়তা করে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বাহকস্কন্ধে ভোগমূর্ত্তিকে পরদাদ্বারা আবৃত করিয়া আনয়ন করিলে, মন্দিরের দ্বার হইতে একটী হাউই ছোড়া হয়। তখন মূলস্থানে মন্ত্রপূত করিয়া একটী পাত্রে কর্পূর প্রজ্বলিত করা হয়। হাউইটী উপরে উঠিলে, অমনি পর্ব্বতোপরি একটী আলোক জ্বলিয়া উঠে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরালোকে দেবতার আবরণ খুলিয়া দেওয়া হয়। পর্ব্বতের উপরে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে ১টী কুণ্ড আছে, তাহাতে ঘৃত-কর্পূর ও নব বস্ত্রাদি দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি আলোক লইয়া তথায় অপেক্ষা করে। নিম্ন হইতে যেমন হাউইটী উপরে উঠে অমনি সেই ব্যক্তি উপরের কুণ্ডস্থিত ঘৃত কর্পূর জ্বালিয়া দেয়। সেই আলোক বহুদূর হইতে দেখা যায়। অনেকে ঐ দিবস উপবাস থাকে। সেই আলোক দেখিয়া তাহারা জল গ্রহণ করে। এই উৎসবকে দীপম্ বলে।

এই স্থানে গৌতম মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া, স্থানীয় লোকেরা ইহাকে মহাতীর্থ জ্ঞান করে। মন্দিরে নিত্য যে ভোগ দেওয়া হয়

তিরুবঃমলয়-গণেশ মন্দির। (১৯৮ পৃঃ।)

সেই প্রসাদ আগন্তুক ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পূজারিগণ ভোজন করিয়া থাকেন। এখানে ৬০টী ব্রাহ্মণ কুমার বিনা ব্যয়ে বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে। মন্দিরের শোভাবর্দ্ধনার্থ ৫০টী দেব নর্ত্তকী আছে। মন্দিরের ব্যয় কারণ ইংরাজ রাজ-সরকার হইতে বাৎসরিক ৯০০০ টাকা বরাদ্দ আছে। এই টাকা দেবতার সেবায় যৎকিঞ্চিৎ খরচ হইয়া পূজক ও নর্ত্তকীগণের উদর পূরণার্থ খরচ করা হয়। পর্ব্বতের উপর একটী পুষ্করিণী আছে তাহাকে কুলাইপালতির্থম্ কহে। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতগাত্রে অনেকগুলি গুহা আছে। ষ্টেশনের পশ্চিমদিকে কিয়দ্দূরে স্বব্রহ্মণ্যস্বামীর একটী ছোট মন্দির আছে, কথিত আছে, তিনি মহাদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

তিরুবন্নমলয় হিন্দুদিগের মন্দির হইলেও ১৭৫৩ খৃঃ মার্টিজ আলি খাঁ এই মন্দির অবরোধ করেন। তৎপরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইহা ফরাসিদের হস্তগত হয়। ১৭৬০ খৃঃ কাপ্তেন ষ্টিফেন কর্ণাটের নবাবের পক্ষ অধিকার করেন। পরে ১৭৯০ খৃঃ টিপু সুলতান তাহার অধিকার ভুক্ত করিয়া লন। ১৭৯৩ খৃঃ টিপুর সহিত সন্ধি হওয়ায় ইহা ইংরাজদের হয়। তদবধি ইহা ইংরাজদের অধীনে আছে।

তিরুকোইলুর।

তিরুবন্নমলয় হইতে ৯টী ষ্টেশন পরে তিরুকোইলুর ষ্টেশন। ইহা একটী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মন্দির। ইহার গঠন প্রণালী তিরুবন্নমলয়ের শিবমন্দির অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য ক্ষোদিত—ইহারও ৪টী গোপুর আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান বিষ্ণু শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম হস্তে দণ্ডায়মান। কণ্ঠে ১০৮ শালগ্রাম শিলার মালা ও বক্ষে মহালক্ষ্মী বিরাজমানা। অদূরে পদ্মযোনি ব্রহ্মা—সনক, সনাতন প্রভৃতি ঋষিরা পূজা করিতেছেন। এই স্থানে আসিলে মনে হয় যেন যথার্থই বৈকুণ্ঠে আসিয়াছি।

এখানে মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন রথ, দোল প্রভৃতি উৎসব হয়। নিত্য বেদপাঠ ও দেবনর্ত্তকীর নৃত্য গীত হইয়া থাকে। প্রতি শুক্রবারে তাঁহার অভিষেক হয়। এ মন্দিরও গভর্ণমেণ্টের হস্তগত। মন্দিরের ব্যয় কারণ বাৎসরিক ১৮ শত টাকা মাত্র বরাদ্দ আছে।

তিরুকোইলুর সহর পেন্নার বা পিণাকিনী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইবার সময় এই নদী পার হইতে হয়। এখানে একটী ছত্র ও ব্রাহ্মণদিগের ৪টী হোটেল আছে। সহরের সুবারবে অর্থাৎ খুব নিকটস্থ গ্রামে কোইলুর নামক স্থানে গোপুর বিশিষ্ট একটী শিব মন্দির আছে। কোম্পানি বাহাদুর এক্ষণে উহা লবন রাখিবার গোলায় পরিণত করিয়াছেন। মন্দিরের এমনি অধঃপতন ও দুর্দ্দশা যে দেখিলে মনে স্বতই দুঃখ উপনীত হয়। মন্দিরটী নিতান্ত ছোট নহে, ইহাও ৮টী মণ্ডপে বিভক্ত। এখানকার পর্ব্বতগাত্রে ৩টী গুহা আছে। হরিকাণ্ডনালুর নামক গ্রামেও একটী শিব মন্দির আছে। মহাভারতে যে বাল্‌খিল্য মুনির বিষয় উল্লেখ আছে, স্থূল পুরাণ মতে এই স্থানেই তাঁহাদিগের তপস্যার স্থান ছিল। এই সকল ঋষিগণ দেবনুর নামক গ্রামের সন্নিকটে পিণাকিনী তটে তপস্যা করিতেন।

দেবমন্দির নির্ম্মাণের জন্য এই স্থানের পর্ব্বত কাটিয়া প্রস্তর সকল বিস্তর স্থানে রপ্তানি হয়। এখানে বিস্তর সাহেব বসতি করেন। সুপারি, ইক্ষু ও ধান্য এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় ও নানা স্থানে রপ্তানি হয়। তিরুকোইলুর সহরে আদালত থাকা প্রযুক্ত ডেপুটী কলেক্টর, জেলার মুন্সেফ্, সবরেজিষ্টার, সবমাজিষ্ট্রেট, সবইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ বাস করেন। প্রতি বুধবারে একটী বড় হাট হয়। যখন এখানে রেলওয়ে হয় নাই তখন এই সকল তীর্থে আসিবার কোন উপায় ছিল না। পদব্রজ ভিন্ন দুর্ভেদ্য শৈলমালা অতিক্রম করা

যানাদির কর্ম্ম নহে। তখন এই সকল তীর্থে আগমন করিলে দস্যু তস্করের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় থাকিত না; কিন্তু এখন ইংরাজরাজের কৃপায় ও বাষ্পীয় যানের সাহায্যে পরমসুখে নির্ব্বিঘ্নে এই সকল তীর্থে আসা যায়। এই স্থানে আসিলে ও রাস্তা ঘাট দেখিলে মনে হইবে না যে কোন কালে এই সকল স্থান দৈত্য বা অসুরের আলয় ছিল। ধন্য ইংরাজ! তোমার কৃপায় আজ আমরা সর্ব্বস্থানে নির্ভীকচিত্তে বেড়াইতেছি।

বিল্লপুরম্।

পূর্ব্বোক্ত তিরুকোইলুর হইতে ৩টী ষ্টেশন পরে বিল্লপুরম্ জংশন ষ্টেশন। এই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে ৪টী লাইন গিয়াছে। ১টী উত্তরে বরাবর মান্দ্রাজ গিয়াছে, ২য়টী উত্তর-পশ্চিম দিকে তিরুবন্নমলয়, ভেলোর, তিরুপতি প্রভৃতি ষ্টেশন দিয়া গুডুর জংশনে মিশিয়াছে, ৩য়টী দক্ষিণে মেড়ুরার দিকে গিয়াছে, এবং ৪র্থটী পূর্ব্বে সমুদ্রদিকে পণ্ডিচারীতে গিয়াছে। সুতরাং ইহা একটী প্রকাণ্ড জংসন ষ্টেশন। এখানে বিশেষ কোন দেবালয় না থাকা হেতু আমরা এই স্থানে নামি নাই। আমাদের গাড়ী এখানে প্রায় ২৫ মিনিট অপেক্ষা করিল। প্লাটফরমে নামিয়া বিচরণ করিতে করিতে ষ্টেশনের শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম। দক্ষিণ দেশে একটী বিশেষ অসুবিধা যে উত্তম খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না। সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এমন ষ্টেশনে একটীও খাবারওয়ালা আসিল না। কেবল একজন কদলী ও একজন কফী মাত্র বিক্রয় করিতে আসিল। যদি কলিকাতা হইতে কোন লোক এই সকল স্থানে গিয়া আমাদের দেশের মত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অতি অল্প দিনের মধ্যে যে ধনাঢ্য হয়, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এই ষ্টেশনে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃত্বাধীনে একটী

উত্তম হোটেল আছে। তথায় স্নানেরও বেশ বন্দোবস্ত দেখিলাম। স্নানের স্থানটী চতুর্দ্দিকে ঘেরা, তথায় কেবলমাত্র হিন্দুদিগের স্নান করিতে দেওয়া হয়। আহার করিলে প্রত্যেককে ।০ চারি আনা হিসাবে দিতে হয়। ষ্টেশনের কিয়দ্দূরে ২টী ছত্রবাটী আছে। এই স্থান হইতে ২॥০ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে তিরুবামালুর নামক গ্রামে একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নাই।

পণ্ডিচারী।

ফরাসীদিগের এই প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিশালী নগরী সমুদ্রতীরে অবস্থিত। ইহা করমণ্ডল উপকূলের প্রধান বন্দর। বিল্লপুরম্ ষ্টেশন হইতে ইহার ভাড়া ।০ চারি আনা মাত্র। একটি লহর দ্বারা পণ্ডিচারী সহর দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। মান্দ্রাজের মত ইহাও শ্বেতসহর ও কৃষ্ণসহর নামে অভিহিত। শ্বেতসহর সমুদ্রতীরবর্ত্তী, তথায় ফরাসি সাহেবগণ বাস করেন। আর কৃষ্ণসহরে দেশীয়েরা বাস করেন। এখানকার রাস্তা বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। পথের দুই ধারে নারিকেল বাগান, দেখিলে মনে অতিশয় আনন্দ হয়। স্থানটী অতি স্বাস্থ্যকর, তজ্জন্য অনেকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। সমুদ্রতীরে বেড়াইবার জন্য মনুষ্যচালিত এক প্রকার ঠেলা গাড়ীতে সকলে আরোহণ করিয়া থাকে। এই গাড়ীতে চড়িলে মনে যেন এক প্রকার নূতন আমোদ হয়। এই গাড়ীর নাম "পৌসিপৌসী"। ইহার ভাড়া দৈনিক ১৲ টাকা মাত্র। এখানে ফরাসি গবর্ণরের প্রাসাদ, ফরেন্ মিসন চার্চ, পেরিস্ চার্চ, দুটী পেগোডা, নূতন বাজার, ক্লকটাওর, বাতিঘর (Light House), টাউনহল, সমুদ্রগর্ত্তের পোস্তা, জেলখানা, হাঁসপাতাল, আর্টিজেন্ কূপ ও জেটী দেখিবার উপযুক্ত। সমুদ্রতীরে

পণ্ডিচারী।

(পৃঃ ২০৩)

ডিউপ্লে (Dupliex) সাহেবের দণ্ডায়মান প্রস্তরমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনি এক সময় ইংরাজদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

এখানে তামিল ও ফরাসি ভাষা প্রচলিত। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তজ্জন্ম আমাদের মত লোকের তথায় কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইলে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। এখানে সাহেবদিগের থাকিবার অনেক হোটেল আছে এবং হিন্দুদের বাসস্থানের জন্য কাল্‌বাই সদাশিব শেটীর ও তাঁহার ভ্রাতার ছত্রবাটী আছে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী ছত্রবাটী আছে। দক্ষিণ দেশের প্রত্যেক স্থানেই এইরূপ ছত্রবাটী থাকায় নবাগত ব্যক্তিগণের পক্ষে কতদূর যে সুবিধাজনক তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

সমুদ্রতীরে বিচ নামক রাস্তা অতি পরিপাটি ও প্রশস্ত। প্রভাত-মারুৎ ও সায়ংসমীর সেবনার্থ ঐ রাজপথে বসিবার বেঞ্চ সকল রহিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে সজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী শোভা পাইতেছে। পণ্ডিচারীর একটী প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

১৬৭২ খৃঃ ফরাসীগণ বিজয়নগরের রাজার নিকট হইতে এই পণ্ডিচারী সহর প্রথমে খরিদ করেন। ১৬৯৩ খৃঃ দিনামারেরা ফরাসিদের নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লয়। ছয় বৎসর পরে ফরাসিরা উহা পুনরায় প্রাপ্ত হয়। কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা ইহা তিন বার দখল করেন। ১৭৫১ খৃঃ সার আয়ার কুট্‌ পণ্ডিচারী অধিকার করিয়া দুর্গের সমস্ত প্রাচীর ভগ্ন করিয়া দেন। ১৭৬৩ খৃঃ সন্ধি হইলে ইংরাজেরা ইহা ফরাসিদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। তৎপরে ইহা তিন চার বার ইংরাজদের হস্তে পতিত হয়। শেষে ১৮১৬ খৃঃ হইতে ইহা ফরাসি-দিগের দখলে আছে। এখানে ফরাসি গবর্ণর আছেন, তিনি প্রায়ই সমুদ্রতীরে সদলবলে বায়ু সেবনে বহির্গত হন।

এখানে প্রায় ১৫০০০০ লোকের বসতি ও ৬০০০০০ লক্ষ টাকার

রাজস্ব আদায় হয়। পণ্ডিচারী সহরটী অতি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ সমৃদ্ধিশালী এবং রেল হওয়া অবধি এখানে মাল আমদানি বা রপ্তানির বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টিম নেভিগেসন্ কোম্পানির জাহাজ যাতায়াতে বাণিজ্যের সুবিধা আছে। এদেশে চিনের বাদাম প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বাদাম তৈল ও থইল চতুর্দ্দিকে রপ্তানি হয়। এখানে খোলা ভাটীর কর না থাকায় দেশী মদ বড় সস্তা, তজ্জন্য অনেকেই মদ্যপানে রত থাকে। ইহা ফরাসি রাজত্বের কলঙ্ক। চন্দননগরেও ঐ খোলা ভাটীর কলঙ্ক আছে। মদ্যপায়ীদের এই স্থান বেশ পছন্দজনক।

আর্টিজেন কূপ।

ইহার বিষয় একটু জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। উক্ত কূপ হইতে জল আপনা আপনি উপরে উঠিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে পৃথিবী স্তরে স্তরে নির্ম্মিত, যে স্তর সমতল নহে তাহার মধ্য দিয়া অল্প অল্প করিয়া জল নির্গত হয়, জলীয় পদার্থের সাধারণ গুণ সমতল, অর্থাৎ উপর ও নিম্নস্তরের মধ্য দিয়া যে জল নির্গত হয় তাহা সমতল না থাকিলে কোন নলদ্বারা উক্ত দুই স্তরের মধ্যে প্রয়োগ করিলে নলের ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধের জল নিম্নে আসিতে থাকে। ক্রমে নিম্নের জল পরিপূর্ণ হইয়া নলের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধমুখে পতিত হইতে থাকে। এই নিয়মে নিম্নের জল উপরে উঠিয়া থাকে। এখানে প্রায় আর্টিজেন কূপ ২০০ ফিট গভীর করা হয় এবং পূর্ব্বোক্ত জল অবস্থিত স্তরের সহিত লোহার পাইপ যোজনা করিয়া দিলে স্বভাবতই নলের ভিতর দিয়া উপরে উঠিতে থাকে, ইহাকেই আর্টিজেন কূপ বলে। এখানে অনেক বাগানবাটীতে, শেঠীর পুরাতন কলবাটীর প্রাঙ্গণে ও অন্যান্য স্থানে প্রায় ৪০টি অর্টিজেন কূপ আছে। পণ্ডিচারীর

৫ মাইল দূরে মুডিলিয়ার-পেট নামক স্থান হইতে অটিজেন কূপের জল ইষ্টক-নির্ম্মিত নল দিয়া সহরের সকল রাস্তায় প্রবাহিত করা হয়। এখানকার ইহাই (water supply scheme) জল সরবরাহ প্রণালী। বহুমূত্ররোগীর পক্ষে এ জল পরম উপকারী, কারণ এই জলে লৌহ-মিশ্রিত আছে। এই জলের জন্য ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া পণ্ডিচারী মহা স্বাস্থ্যকর স্থান।

বিল্লপুরম ষ্টেশন হইতে একটী শাখালাইন পণ্ডিচারীতে গিয়াছে কিন্তু প্রধান (Main Line) লাইনটী বরাবর দক্ষিণে মেডুরাভিমুখে গিয়াছে। আমাদের ট্রেণ মেডুরার দিকে যাইতে লাগিল। এখান হইতে মেডুরা পর্য্যন্ত অনেকগুলি তীর্থ বিদ্যমান। আমরা যাইবার সময় কতকগুলি ও প্রত্যাগমন কালীন কতকগুলি এইরূপে দুইবারে ঐ স্থানগুলি দর্শন করি। যেখানে মন্দির নাই তথায় অবতরণ করি নাই, কিন্তু সে স্থানগুলি ভ্রমণের পক্ষে উত্তম। এখানে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে নিম্নলিখিত দশটী প্রসিদ্ধ।

১ কডেলুর, ২ বৈদ্যেশ্বর, ৩ চিদম্বর, ৪ শিবালী, ৫ মায়া-ভরম্, ৬ কুম্ভকোণম্, ৭ তাঞ্জোর, ৮ নেগাপত্তন, ৯ ত্রিচিনাপল্লী, ১০ মেডুরা।

কডেলুর।

যদিচ ইহা তীর্থ নহে তথাচ ইহা সমুদ্র তীরবর্ত্তী সুন্দর সহর বলিয়া অনেকে এই স্থানে অবতরণ করেন। ১৬৮৩ খৃঃ ইংরাজেরা এইস্থানে প্রথম উপস্থিত হন। ১৭৫২ খৃঃ করমণ্ডলতীরে ইহা প্রধান বন্দর ছিল। এখানে জজ আদালত, কলেক্টারের কাছারি, জেলখানা, জিলাস্কুল, চার্চ্চ প্রভৃতি বিদ্যমান। সহরের মধ্যে যে সকল বাটী আছে তাহার গঠন অতি উত্তম। রাস্তাগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত, প্রশস্ত ও পরিষ্কার। সমুদ্রতীরে

সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গের ভগ্নাবশিষ্ট এবং তৎসম্মুখে ক্লাইব সাহেবের পুরাতন বাঙ্গালাবাটী আছে, ১৭৫৮ খৃঃ ফরাসীরা এই স্থান অধিকার করিয়া উক্ত দুর্গের অনেক স্থান নষ্ট করে। ১৭৮৫ খৃঃ ইহা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, সেই অবধি ইহা ইংরাজ শাসনাধীনে আছে। এখানে পড়লেশ্বর মহাদেবের একটী সামান্য মন্দির আছে। এস্থান দর্শন আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, কিন্তু যাঁহারা ভ্রমণ উপলক্ষে এই স্থানে আসিবেন তাঁহারা বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন।

বৈদ্যেশ্বর।

কডেলুর হইতে চারটী ষ্টেশন পরে কিইল (Kille) নামক ষ্টেশনে বৈদ্যেশ্বর। যদিচ ইহা একটী সামান্য পল্লীগ্রামমাত্র তত্রাচ এইস্থানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া এই স্থানের গৌরব বৃদ্ধি করেন ; তজ্জন্য ইহা একটী মহা তীর্থ স্থান। ষ্টেশন হইতে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটী দেবালয় আছে। মন্দিরটী বৃহৎ ও তিনটী প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের উত্তর-দিকস্থ মণ্ডপের এক পার্শ্বে একটী কূপ আছে। এই কূপেই জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়। মন্দিরের দক্ষিণে বৃহৎ তিপ্পকুল সরোবর। ইহার চতুর্দ্দিকে গ্রেনাইট প্রস্তর-মণ্ডিত ও সুন্দর চাঁদনিযুক্ত সোপানশ্রেণী। পশ্চিমে বহিঃপ্রকোষ্ঠে অষ্টোত্তর-শত বৃহৎ মণ্ডপ উত্তীর্ণ হইয়া "দেবসন্নিধি" মণ্ডপে আসিতে হয়। মন্দিরের বিগ্রহ পশ্চিম দিকে রহিয়াছেন। পাণ্ডারা মন্দির পার্শ্বস্থ কূপ দেখাইয়া জটায়ুর বিষয় বর্ণনা করে ও এই কূপকে জটায়ুতীর্থ কহে। এখানে জটায়ুর কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই, কিন্তু মন্দিরগাত্রে বিস্তর অশ্লীল ছবি আছে।

মন্দিরের আয় ৮০০০০ টাকা। প্রত্যহ ১।৹ মণ তণ্ডুলের অন্নভোগ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পূজার উপকরণ ও নিয়মিত অন্যান্য বন্দোবস্ত

অতি সুন্দর। বিস্তর অতিথি ঐ স্থানে প্রসাদ পাইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এখানে প্রচুর ধান্য জন্মিয়া থাকে। দুইটী হোটেল ও একটী ছত্র এইস্থানে আছে। ইহার পরবর্ত্তী বিখ্যাত ষ্টেশন চিদম্বরম্।

চিদম্বরম্।

ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রায় দেড় মাইল। দুই দিকে বিটপী শ্রেণী পরিশোভিত প্রশস্ত রাজপথ। সহরটী দেখিতে মন্দ নহে; মুন্সেফ, মেজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কাছারীবাটীও আছে। এই স্বনামখ্যাত চিদম্বরম্ অতি প্রাচীন তীর্থ। এখানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মুর্ত্তির ব্যোমমূর্ত্তি বিরাজমান। পূর্ব্বে কাঞ্চীপুরে ক্ষিতিমূর্ত্তি, কালহস্তীতে বায়ুমূর্ত্তি, তিরুবন্নমলয়ে তেজমূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে চিদম্বরমে ব্যোম্‌মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়া জম্বুকেশ্বরের অপমূর্ত্তির বিষয় উক্ত হইবে। আকাশ-রূপী মহাদেবের মন্দিরে কোন বিগ্রহ বা লিঙ্গ নাই। দেবালয়ের সম্মুখে একটী পর্দ্দা আছে, সেই পর্দ্দায় আকাশলিঙ্গ এই কথাটী লেখা আছে। যাত্রীগণ দেবদর্শন করিতে আসিলে অর্চ্চকেরা পর্দ্দা উঠাইয়া ধরেন, তখন কেবলমাত্র দেওয়াল দৃষ্ট হয়। কারণ ব্যোমরূপী লিঙ্গ মানব-চক্ষুর অগোচর। চিদম্বর অর্থে জ্ঞানাকাশ।

এই মন্দিরটী অতি বৃহৎ এবং প্রাচীন। প্রোফেসার ইষ্ট উইক বলেন ইহা ৫ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। ভ্যানেলসিয়া ও ফারগুসন বলেন ইহা রামেশ্বর বা তাঞ্জোরের মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন। প্রায় ১১৭ বিঘা জমির উপর উক্ত মন্দির বিদ্যমান। বিস্তারে ৬০ ফিট এবং দুইটী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ভিতরের প্রাচীরটী ২৮ ফিট উচ্চ, ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত এবং বাহিরের প্রাচীরটী ৩০ ফিট উচ্চ ও প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রথম প্রাচীরের চারটী প্রবেশদ্বার মাত্র আছে। দ্বিতীয় প্রাচীরে ৪টী অতি বৃহৎ গোপুর আছে। মন্দিরের চতুস্পার্শ্বের পথটী প্রায়

১০ ফিট প্রশস্ত বহিঃপ্রাকার ও মধ্যপ্রাকারের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গণে কতকগুলি উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ রহিয়াছে। উৎসবকালীন ঐ স্তম্ভের উপর আচ্ছাদন দিয়া নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে। মন্দিরের ভিতর চারিটী বড় বড় মণ্ডপ আছে। প্রথম চিৎসভা, ২য় কনকসভা, ৩য় দেবসভা ও ৪র্থ নৃত্যসভা, এতদ্ব্যতীত নটেশ্বর মহাদেবের একটী বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরের চূড়া স্বর্ণপাতদ্বারা আবৃত। ইহার সম্মুখের মণ্ডপটী রৌপ্যপাতদ্বারা আচ্ছাদিত। এই মহাদেবের সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে দুর্গার সহিত মহাদেব একপদে নৃত্য করিয়া দেবীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি নটেশ্বর নামে অভিহিত হইয়া নটমূর্ত্তিতে এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। মূর্ত্তি দেখিতে মনুষ্যের মত কেবল একপদে দণ্ডায়মান। ইঁহার অপর পদ ঊর্দ্ধে উঠাইয়া রাখিয়াছেন। মন্দিরের সম্মুখে দুইটী বৃহদাকার ঘণ্টা আছে। এই মন্দির আড়ম্বরে ও কারুকার্য্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আর একটী মন্দিরে শ্রীরঙ্গমের মত বিষ্ণুর শেষশায়ী মূর্ত্তি বিরাজমান। প্রাঙ্গণের অপর দিকে পিল্লিইয়ার নামক মন্দিরে বিঘ্নেশ্বর বা গণেশের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের অপর ধারে ১৫০×১০০ ফিট শিবগঙ্গা বা হেমতীর্থ নামক চতুর্দ্দিকে প্রস্তর মণ্ডিত একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার চারিকোণে চারিটী ও উত্তরদিকে চাঁদনিযুক্ত বাঁধা ঘাটের দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্রাকারের সুন্দর মন্দির আছে। সরোবরের চারিদিকেই বেড়াইবার নিমিত্ত প্রশস্ত পথ। বিষ্ণুকাঞ্চী ও রামেশ্বরের সরোবর অপেক্ষা ইহা অধিক সৌন্দর্য্যশালী। মন্দিরের সমস্ত প্রাঙ্গণভূমি গ্রেণাইট প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। মন্দিরের বহিঃ-প্রাকারের চারিদিকই প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষের ফল ফুলে সুশোভিত। শিবগঙ্গার পূর্ব্বদিকে সহস্রস্তম্ভ হল। এই সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ একটী বৃহৎ ব্যাপার। প্রত্যেক স্তম্ভ একটী বৃহৎ প্রস্তর হইতে

চিদম্বরম—মন্দির
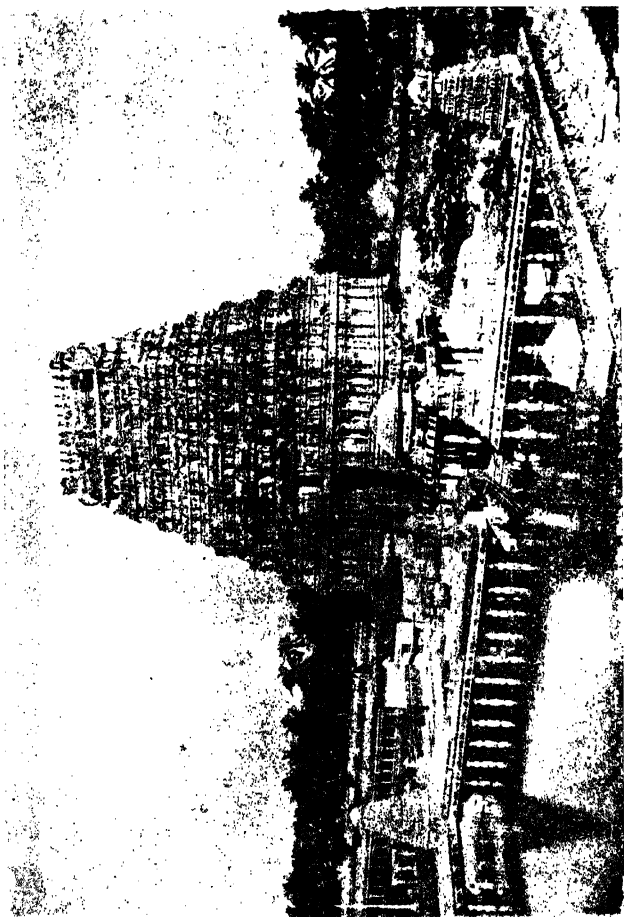
নির্ম্মিত। সরোবরের পশ্চিম পার্শ্বে কালিকাদেবীর মন্দির। মেকেঞ্জী সাহেবের মতে ৯৩৭ খৃঃ বিজয় রাজ আদিত্য বর্ম্মা নামক কোন রাজা কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। টেলার সাহেবের মতে দশম শতাব্দীতে বীরকোলরায়ের চোল রাজ কর্ত্তৃক কনকসভা নির্ম্মিত হয়। চিদম্বরমের মন্দির ও সমস্ত মণ্ডপ অপেক্ষা শিবদুর্গার এই কনক সভা আড়ম্বরে ও অতুল সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, নটেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও কারুকার্য্য বিশিষ্ট। সুতরাং চিদম্বরমের এই দুইটীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয়। এখানকার ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। কেবল প্রধান মূল মন্দিরেই কোন বিগ্রহ নাই। ১৭৮৫ খৃঃ কোন বিধবা ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্ব্বোক্ত গোপুর ৪টী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

যাঁহারা এই মন্দিরে পূজা ও বেদপাঠ করেন তাঁহারা দীক্ষিত ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। পূর্ব্বে এখানে ৩০০০ দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কথিত আছে কোন সময়ে ব্রহ্মা কাশীধামে একটী যজ্ঞ উপলক্ষে উক্ত ব্রাহ্মণদের তথায় লইয়া যান। চিদম্বরম্ দেবের আজ্ঞায় রাজা হিরণ্যবর্ণ পুনরায় ঐ ব্রাহ্মণদের কাশীধাম হইতে চিদম্বরমে আনয়ন করেন। ইঁহারা বলেন "আমরা সাক্ষাৎ ভগবান হইতে উৎপন্ন"। দেশীয় ব্রাহ্মণগণ হইতে ইঁহাদের সমাজ স্বতন্ত্র। চিদম্বরমের পাণ্ডাবৃত্তিই ইঁহাদের উপজীবিকা। বিবাহিত না হইলে পূজার অধিকারী হন না, তজ্জন্য পাঁচ ছয় বৎসরেই ইঁহাদের বিবাহ হয়। কুড়ি জন করিয়া ব্রাহ্মণের কুড়ি দিনের জন্য পালা পড়ে। ইঁহাদের কেশের একটু বৈচিত্র্য আছে। মালাবার দেশের ব্রাহ্মণগণের মত ইঁহারা মস্তকের সম্মুখভাগে বড় বড় চুল রাখেন, ঘাড় এবং জুল্পী কামাইয়া থাকেন।

এক্ষণে হিরণ্যবর্ণ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। স্থল-পুরাণের মতে পঞ্চম মনু বৃদ্ধাবস্থায় শ্বেতবর্ণ নামক পুত্রকে গৌড়দেশ অর্পণ

করেন। কিছু দিন পরে শ্বেতবর্ণের কুষ্ঠব্যাধি হয়। তিনি তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে কাঞ্চীপুরে আসেন। তথায় একটী ব্যাধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উক্ত ব্যাধ তাঁহাকে চিদম্বরমে ব্যাঘ্রপদ নামক ঋষির অলৌকিক শক্তির কথা বর্ণনা করে। শ্বেতবর্ণ তৎশ্রবণে চিদম্বরমে আসিয়া ব্যাঘ্রপদ ঋষির অনুসন্ধান করেন। ঋষিবর জঙ্গল মধ্যে একটী সামান্য মন্দিরে আকাশরূপী ভগবান শঙ্করদেবের উপাসনা করিতেন। শ্বেতবর্ণ এই স্থানে আসিয়া উক্ত ঋষির শরণাগত হইলেন। তিনি ঋষির আদেশে নিকটস্থ একটী জলাশয়ে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হইলেন এবং তাঁহার বর্ণ হিরণ্যবর্ণ হইল। তদবধি শ্বেতবর্ণের নাম হিরণ্যবর্ণ। তজ্জন্য তিনি আকাশরূপী মহাদেবের উৎকৃষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কেহ কেহ বলেন চিদম্বরমের মন্দির ব্রহ্মা-নির্ম্মিত ও হিরণ্যবর্ণ সংস্কারক মাত্র। যাহা হউক চিদম্বরমের মন্দির যে একটী প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত ব্যাপার তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইহা প্রত্যেক যাত্রীরই দর্শন করা উচিত।

শিবালী।

চিদম্বরমের একটী ষ্টেশন পরে শিবালী ষ্টেশন। ইহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য তীর্থ নহে বলিয়া আমরা এখানে নামি নাই। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে মন্দির অবস্থিত; ইহাও শিবমন্দির। দক্ষিণ দেশের প্রায় সকল স্থানেই শিবমন্দির। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোথাও রাধাকৃষ্ণের মন্দির নাই; পূর্ব্বে এই সকল স্থানে দৈত্য ও অসুরেরা বাস করিতেন এবং তাঁহাদের ইষ্টদেবতা মহাদেব। তজ্জন্যই দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল স্থানেই উচ্চ উচ্চ গোপুর বিশিষ্ট প্রকাণ্ড শিবমন্দির। বিষ্ণুমন্দির অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। যাহা হউক যাত্রীগণের সুবিধার নিমিত্ত সকল স্থানেই ছত্রবাটী আছে, ইহা বাস্তবিকই শ্লাঘার বিষয় ও বদান্যতার পরিচয়।

এখানকার মন্দিরে ব্রহ্মপুরীশ্বর নামে মহাদেব আছেন। স্বতন্ত্র মন্দিরে ত্রিপুরাসুন্দরী নামক দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। উভয় মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। নিত্যপূজায় ১৷৷০ মণ তণ্ডুলের অন্নভোগ হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে দশ দিনব্যাপী অশ্বোৎসব, আশ্বিন মাসে নবরাত্রোৎসব, মাঘ মাসে শিবরাত্রোৎসব ও চৈত্রমাসে দশ দিন ব্যাপী বসন্তোৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের সময় চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত যাত্রীগণের জনতার তরঙ্গ উঠিতে থাকে। ট্রেণে বসিয়াই মন্দিরের উচ্চ গোপুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। এদেশে মন্দিরের চূড়া অপেক্ষা গোপুর সকল অধিক উচ্চ। সমচতুষ্কোণ হইতে উর্দ্ধে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া ঠিক যেন একখানি রথের মত দেখায়। স্তরে স্তরে আট তল, দশ তল, পনের তল পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়া থাকে। দূর হইতে এই সকল গোপুর দেখিয়া, মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। গোপুরে নানাবিধ ভাস্করকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য থাকায় অতি মনোহর দেখায়। শিবালীতে প্রচুর পরিমাণে চীনের বাদাম উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এখানেও থাকিবার ছত্রবাটী আছে। শিবালী অতিক্রম করিয়া আমাদের ট্রেণ মায়াভরম্ নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

মায়াভরম্।

শিবালী হইতে দুইটী ষ্টেশন পরে মায়াভরম্ নামক জংসন ষ্টেশন। এখান হইতে একটী লাইন তাঞ্জোর অভিমুখে গিয়াছে। আর একটী ঠিক দক্ষিণে তিরুভালুর হইয়া আরাংটাঙ্গি নামক ষ্টেশনে গিয়াছে। আমরা প্রথমোক্ত লাইনে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী, হইয়া তাঞ্জোরে গিয়াছিলাম। শেষোক্ত লাইনে গমন করি নাই এবং ঐ লাইনে উল্লেখযোগ্য কোন মন্দি-রাদিও নাই। যাহা হউক এক্ষণে মায়াভরমের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ইহা কাবেরী নদীর উপর একটী শৈবতীর্থ। মন্দির মধ্যে ময়ূরনাথ

স্বামী নামক শিবলিঙ্গ আছেন। দেবীর নাম অভয়াম্বা, ইঁহার স্বতন্ত্র মন্দির। মন্দির হইতে কাবেরী নদী অর্দ্ধক্রোশ মাত্র। মায়াভরম্ ময়ূরবরম্ শব্দের অপভ্রংশ। ময়ূর=ময়ূরস্বামী এবং বরম্ অর্থে পুরম্। এখানে সর্ব্বদাই বসন্তমারুত প্রবাহিত হইতেছে। যেন চির বসন্ত বিরাজমান। মায়াবরম্ সহরটী অতি পুরাতন, রাস্তাসকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেকেই এখানে আসিয়া বাস করেন। আহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী অতিসুলভ ও সুপ্রতুল। সকল প্রকার শস্য ও ফল সর্ব্বদাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিবাসীগণও বেশ অবস্থাপন্ন; এখানে অনেকগুলি ধনী আয়ার ও আয়ঙ্গায় ব্রাহ্মণ বাস করেন সুতরাং ইহা যেন লক্ষ্মীপুরী। অনেকের মতে মায়াবরম্ শব্দের অর্থ লক্ষ্মীপুরম্। আগন্তুকের জন্য সহরে পাঁচটী ছত্রবাটী আছে। নটকোটা শ্রেষ্ঠীদিগের যে দুইটী ছত্র আছে তাহাতে ব্রাহ্মণগণকে বিনা মুল্যে ভোজন করান হয়।

ময়ূরনাথ স্বামীর মন্দির অতি বৃহৎ, ইহা তিনটী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বিগ্রহ লিঙ্গাকৃতি, ইহার ১৮০০০৲ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি, স্বর্ণ ও মণিমুক্তার আভরণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত খট্টাঙ্গ আছে। প্রতিদিন ১॥০ মণ তণ্ডুলের অন্ন ভোগ হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের পনর দিন ও কার্ত্তিক মাসে সমস্ত মাসব্যাপী দেবতার উৎসব হয়। সেই সময় ত্রিশ চল্লিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে, ইহার পার্শ্বে দেবী অভয়াম্বার মন্দির। এই মন্দিরের আয়তনও নিতান্ত কম নহে। ইহাঁর পূজাপদ্ধতি ময়ূরনাথ স্বামীর মত।

এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে "তিরুইন্দুলু" নামক স্থানে "পেরুমল রঙ্গনাথের" বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির। ইহাও কাবেরী নদীর উপর অবস্থিত। বিগ্রহ-বিষ্ণুমূর্ত্তি, তিনি অনন্তশয্যায় শায়িত আছেন। কথিত আছে ত্রিচিনাপল্লীর শ্রীরঙ্গমূর্ত্তি "আদিরঙ্গম্" নামে অভিহিত। কুম্ভকোণমে "মধ্যরঙ্গম্" এবং এই তিরুইন্দুলুতে "অন্তরঙ্গম্" এই তিন মূর্ত্তিই শেষ

পর্য্যঙ্কে শায়িত আছেন। মূর্ত্তির আকৃতি ত্রিচিনাপল্লীর শ্রীরঙ্গমের চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। মন্দিরটী চারিটী বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রথম প্রাচীরের উপর বৃহৎ গোপুর এবং সম্মুখে ইন্দুসরোবর; মন্দিরটী সাতটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, মূলস্থানে "পেরুমল রঙ্গনাথ স্বামী" বিরাজ করিতেছেন। দেবীর নাম "পেরুমল নায়িকা" ইহার মন্দির পৃথক্। দেবীমন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ মণ্ডপে দেব দেবীর নানা চিত্র অঙ্কিত আছে, কোথাও দেবাসুরের যুদ্ধ হইতেছে, কোথাও গণেশ জননী কৈলাসে বিহার করিতেছেন, ইত্যাদি পৌরাণিক চিত্র সকল শোভা পাইতেছে। দেবতার আয় ভূসম্পত্তি হইতে ৭০০০ টাকা ও কলেক্টরি হইতে ২০০০ টাকা বার্ষিক বন্দোবস্ত আছে। দেবতার উৎসব জ্যৈষ্ঠ মাসে পনর দিন হয়, ইহার নাম "তিরুপবিত্র উৎসব"। শ্রাবণ মাসে দশ দিনব্যাপী "আড়িপুর" উৎসব। আশ্বিন মাসে নয় দিনব্যাপী নবরাত্রোৎসব, কার্ত্তিক মাসে এগারদিনব্যাপী বৈকুণ্ঠ-একাদশী উৎসব। মাঘ মাসে সমস্ত মাসব্যাপী মাঘোৎসব হইয়া থাকে। এই সময় প্রত্যহ বিগ্রহকে কাবেরী সঙ্গমে লইয়া যাইয়া স্নান করান হয়। ফাল্গুন মাসে তেইশ দিন ব্যাপী "অধ্যয়ন উৎসব" এবং চৈত্র মাসে দশদিনব্যাপী বসন্তোৎসব হইয়া থাকে। নব-রাত্রোৎসবের সময় রামায়ণ এবং অধ্যয়ন উৎসবের সময় মহাভারত ও বিষ্ণু সম্বন্ধীয় পুরাণ সকল পাঠ হইয়া থাকে।

কাবেরী নদী।

ইহা গঙ্গার মত পুণ্যতোয়া, প্রত্যহ পূজাকালীন জলশুদ্ধির সময় ইহার নাম উল্লেখ করিতে হয়। কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণ দেশের প্রায় সকলেই কাবেরীতে স্নান করিতে আসেন। রেলযাত্রীর সংখ্যা সেই সময় প্রায় পঞ্চাশ হাজার হইয়া থাকে। কারণ তুলারাশিতে বৃহস্পতি

গমন করিলে মায়াবরমের কাবেরী ঘাটে পুষ্করযোগ হইয়া থাকে। প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই যোগ হয়। যেমন গঙ্গার স্থানে স্থানে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে তাহাকে কুম্ভমেলা কহে। স্নানের সুবিধার জন্য কাবেরী নদীর উভয় তীরেই গ্রেনাইট প্রস্তরমণ্ডিত সুন্দর সোপান শোভা পাইতেছে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে উভয় তীরেই এই পুণ্য-সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক লোক সকল স্নান করিয়া থাকে।

পুষ্কর যোগ।

"মেষে চ গঙ্গা বৃষভে চ নর্ম্মদা যুগ্মে চ বাণী যমুনা কুলীরে।
গোদাবরী সিংহগতে চ কৃষ্ণা কন্যাগতে জীব ইতি ক্রমেণ॥
কাবেরী তৌল্যা মলিতাম্রপর্ণী ভীমাখ্য নদ্যা ইতি চাপ পুষ্করঃ।
মৃগে চ ভদ্রা ঘটসিন্ধু নদ্যা বাচস্পতৌ মীনগ'ত পিনাকিণী॥"

অস্যার্থঃ—বৃহস্পতি মেষ রাশিতে গমন করিলে গঙ্গায়, বৃষরাশিতে নর্ম্মদায়, মিথুনে সরস্বতী, কর্কটে যমুনায়, সিংহগত হইলে গোদাবরী, কন্যাস্থ হইলে কৃষ্ণায়, তুলায় গমন করিলে কাবেরীতে, বৃশ্চিকস্থ হইলে তাম্রপর্ণীতে, ধনুঃস্থ হইলে ভীমাতে; মকর গত হইলে তুঙ্গভদ্রায়, কুম্ভে যাইলে সিন্ধু নদীতে এবং মীন রাশিতে পিনাকিণী নদীর পুষ্কর যোগ হইয়া থাকে।

যাহা হউক আমরা এই পবিত্র নদীতে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ ও প্রীত হইয়াছিলাম। কাবেরী নদী দেখিতে অনেকটা গঙ্গার মত, কিন্তু অনেক স্থানে চড়া পড়িয়া ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। ইহা মহীশূর প্রদেশের পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া চারিটী ধারাতে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের গঙ্গার তীরভূমির ন্যায় কাবেরীর উভয় তীরে শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র, ধান্য শীষের দোলায়মান গুচ্ছরাশি, নারিকেলের নিকুঞ্জ

কানন, তালবৃক্ষের শ্রেণীপুঞ্জ, গুবাক ও ফলভরাবনত কদলী বৃক্ষ যেন প্রকৃতির ভূষণ স্বরূপ হইয়া রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে। মনে হইল যেন আবার বাঙ্গালা দেশে উপনীত হইয়াছি। মধ্যে মধ্যে বংশ গুল্ম ও আম্রবৃক্ষের নিবিড় ছায়া, রাখালগণের সেই বংশীবাদন, বটচ্ছায়ায় ক্রীড়াপর বালকগণের সাহ্লাদধ্বনি, বৃক্ষোপরি নানাজাতীয় বিহঙ্গমের কলধ্বনিতে হৃদয় আনন্দনীরে নিমগ্ন হয়। নীরস দাক্ষিণাত্যে আসিয়া আবার যে স্বদেশের দৃশ্য দেখিব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই পুণ্যতোয়া কাবেরী নদী কুম্ভকোণম্ সহরের উপর দিয়াও প্রবাহিত, সুতরাং যখন আমরা তথায় ছিলাম তখনও এই কাবেরী নদীতে স্নান করিয়াছিলাম। যাহা হউক আমরা "মায়াভরম" হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া "কুম্ভকোণম্" যাইবার জন্য বাষ্পীয় যানে আরোহন করিলাম। চারিটী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া বেলা বারটার সময় তথায় পৌঁছিলাম।

কুম্ভকোণম্।

মায়াভরম্ অপেক্ষা কুম্ভকোণম্ বেশ সুন্দর সহর। ষ্টেশন হইতে সহর এক মাইল মাত্র। গোযানে যাইতে যাইতে সহরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। রাস্তায় স্থানে স্থানে থিয়েটারের প্লাকার্ড মারা রহিয়াছে। কলিকাতায় যেমন পার্শী থিয়েটার কোং গাড়িতে বসিয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া বিজ্ঞাপন বিতরণ করে, সেখানেও তাহা দেখিলাম। জন কোলাহলে রাস্তাগুলি পরিপূর্ণ। সহরটী অতি বৃহৎ ও বহু প্রজা বিশিষ্ট বলিয়া মনে হইল। উৎসবের সময় এখানে প্রায় চারি লক্ষ লোকের সমবেত হয়। কুম্ভকোণমে ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য অতি প্রবল। ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা প্রায় শতকরা ২৫ জন। এখানে বেদাধ্যয়ন ও বিশেষরূপে সংস্কৃত চর্চ্চা হয়। উত্তরে যেমন কাশী, দক্ষিণে তেমন কুম্ভকোণম্। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এখানে যে কলেজ আছে তাহা

অতি প্রসিদ্ধ এবং ইংরাজেরা ইহাকে "Indian Cambridge" কহে। কলেজ বাটী কাবেরী নদীর উপর স্থিত। ইহার প্রাঙ্গণভূমি অতি বৃহৎ ও নানাবিধ বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত। ইহার গঠন প্রণালী মান্দ্রাজের "প্রেসিডেন্সী কলেজ"—বাটী সদৃশ। মান্দ্রাজ বিভাগে অন্য কোন জেলায় এরূপ প্রসিদ্ধ কলেজ বাটী নাই। এখানে বি, এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়।

ক্রমে আমরা কাবেরী তীরস্থ এক ছত্র বাটীতে উপনীত হইলাম। কাবেরী বাসা হইতে ২।১ মিনিটের পথ মাত্র। বাসায় দ্রব্যগুলি রাখিয়া কাবেরী নদীতে স্নানার্থ গমন করিলাম। তখন ইহার তীরে তদ্দেশীয় দুইটী মহিলা বস্ত্র ধৌত করিতেছিল। আমার চশমাটী সোপানে রাখিয়া নদীতে অবতরণ করিলাম, তৎপরে স্নানাহ্নিক সমাধা করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে চসমার কথা মনে পড়িল। দ্রুতপদে নদী তীরে উপনীত হইয়া দেখিলাম যেখানকার জিনিস সেই স্থানেই আছে। কি আশ্চর্য্য কেহই তাহাতে লোভ প্রকাশ করে নাই, বিশেষতঃ সেটী স্বর্ণ নির্ম্মিত। মেয়ে দুটী তাহাদের তামিল ভাষাতে ব্যক্ত করিল "আমরা আপনাদের বাসা জানিলে চশমাটী দিয়া আসিতাম। যাহা হউক আপনার জিনিস যে পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন ইহাতে আমরা বড় সুখী হইলাম।" আহা কি সৌজন্যতা! এমন সুন্দর ও নির্লোভ দেশ দেখি নাই। চশমা যে পুনরায় প্রাপ্ত হইব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা হউক চশমাটী প্রাপ্ত হইয়া যেন পুনরায় চক্ষু পাইলাম।

চশমাটী লইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলাম। তখন বেলা প্রায় ২টা, তজ্জন্য সে সময় আর দেবদর্শন ঘটিল না। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর একজন পাণ্ডা আসিয়া জুটিল। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া দেবদর্শনে লইয়া গেলেন। কুম্ভকোণমে ১৬টী মন্দির আছে ৪টী বিষ্ণুমন্দির ও ১২টী শিবমন্দির, তন্মধ্যে ৬টী মন্দির প্রসিদ্ধ।

কুম্ভকোণম্।

(২১৭ পৃঃ)

১ম কুম্ভেশ্বর স্বামী, ২য় সোমেশ্বর স্বামী, ৩য় নাগেশ্বর স্বামী ৪র্থ শার্ঙ্গপাণি স্বামী, ৫ম চক্রপাণি স্বামী, ৬ষ্ঠ রাম স্বামী। আমরা সর্ব্বপ্রথমে কুম্ভেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হইলাম। প্রথম গোপুরম্ পার হইয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া একটী বাজার দেখিতে পাইলাম। এখানে (German Silver) জার্ম্মাণ সিল্‌ভার নির্ম্মিত সিন্দুর কৌটা, ঝিনুক বাটী ও খেলনা প্রভৃতি বড় সুন্দর। আমি দেখিয়া আর লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কতকগুলি ক্রয় করিলাম। এখানে অসময়ের সজনা খাড়া, কতকগুলি ফল ও তরিতরকারী সুলভ দেখিয়া তাহাও ক্রয় করিলাম। তৎপরে ভিতরের প্রাঙ্গণে উপনীত হইয়া সম্মুখস্থ মন্দিরাভ্যন্তরে কুম্ভেশ্বর স্বামীর লিঙ্গ মূর্ত্তি দেখিলাম। যদিচ ইহা শিবমন্দির তথাপি দেবতার উৎসবের জন্য ৫ খানি রথ রহিয়াছে দেখিলাম। প্রাঙ্গণভূমি দীর্ঘপ্রস্থে ৮৩×৫৫ ফিট, গোপুরম্ উচ্চতায় ১২৮ ফিট্ এবং গোপুরম্ হইতে মন্দির পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বে স্তম্ভ শোভিত লম্বা রাস্তাটী ৩৩০ ফিট এবং বিস্তারে ১৫ ফিট্। এই রাস্তা দিয়া বরাবর ভিতরে যাইয়া শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম। দেবতার অনেকগুলি রৌপ্য নির্ম্মিত পাল্কী ঘোড়া, হস্তী প্রভৃতি যান আছে।

আমরা কুম্ভেশ্বর স্বামীর মন্দির দর্শন করিয়া অনতিদুরস্থ শার্ঙ্গপাণি স্বামীর গোপুরম্ সম্মুখে উপনীত হইলাম। এই গোপুরটী উচ্চতায় ১৪৭ ফিট এবং কুম্ভেশ্বর স্বামীর মন্দির অপেক্ষা সুন্দর ভাস্কর কার্য্য খোদিত। গোপুরম গাত্রে ছোট ছোট এত পুত্তলিকা শোভা পাইতেছে এবং সে গুলির এমন সুন্দর গঠন যে তাহাদিগকে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। এই গোপুরমের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল পাঠকগণ ইহা দর্শন করিয়া কতকটা জ্ঞান উপলব্ধি করুন। পশ্চাৎভাগে আরও ৫টী গোপুরম্ আছে কিন্তু সেগুলি ইহা অপেক্ষা ছোট। ইহার অভ্যন্তরে গমন করিয়া ২খানি বড় বড় কাষ্ঠনির্ম্মিত রথ দেখিলাম। দেবতা

বিষ্ণুমূর্ত্তি, ইনি শেষ শয্যায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। বামহস্তে শার্ঙ্গধৃত শেষনাগ পঞ্চ ফণা বিস্তার করিয়া ভগবানের মস্তক রক্ষা করিতেছে। ইহাঁর নিকট শ্রীরাম লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান এবং তৎপার্শ্বে মা জানকী দণ্ডায়মানা। মন্দিরাভ্যন্তরে এই অপরূপ দেবমূর্ত্তি গুলি দর্শন করিয়া যথার্থই মনে ভক্তি ও প্রীতি আনয়ন করিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে মায়াভরমে (তিরুইন্দুলুতে) অন্তরঙ্গম্, কুম্ভকোণমে মধ্যরঙ্গম্ এবং ত্রিচিনাপল্লীতে—"আদিরঙ্গম্।" এই তিন দেবতাই দেখিতে প্রায় একরূপ ও শেষ পর্য্যঙ্কে শয়ান। সুতরাং এই কুম্ভকোণমের শার্ঙ্গপাণি "মধ্যরঙ্গম্" নামে অভিহিত।

দক্ষিণ দেশের ক্রমাগত শিবমন্দির ও উচ্চ উচ্চ গোপুরম্ দর্শন করিয়া ও পাণ্ডাগণের নীরস ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া যেন আমাদের তীর্থবিকার হইয়াছিল। মনে মনে ভাবিতাম মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি দর্শন করিবার সময় মনে কেমন একটা প্রেমভাব আসিত, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে আসিয়া সে প্রেম হারাইলাম কেন? পুরীর জগন্নাথ ও শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শন করিবার পর যখন ক্রমাগত ছোট ও বড় নানা প্রকার শিবমন্দির দেখিতে লাগিলাম তখন বাস্তবিকই এই স্থানগুলিকে নীরস ও প্রেমহীন তীর্থ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। জোর করিয়া কি ভক্তি আসে? এক জিনিষ কি ক্রমাগত ভাল লাগে, পাঠকগণ আমাকে যাহাই বুঝুন আমি কিন্তু সত্য কথাই বলিতেছি। এত দিন ধরিয়া শিবমন্দির দেখিয়া আমার তীর্থ দর্শনের পিপাসা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছিল, এক্ষণে সেই প্রেমপিপাসা এই বিষ্ণুমন্দিরে আসিয়া আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অধিকন্তু শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও মা জানকীকে দেখিয়া মনে হইল, মা! তোমার জন্যই সেতু এবং সেই সেতু দেখিতেই আমরা যাইতেছি। হায়! আরও কতদিন পরে সেই বাসনাকল্পিত

সেতু দেখিব! এবং কতদিনেই বা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত প্রভু রামেশ্বরকে দর্শন করিব! যাহা হউক অদ্য এখানে প্রভু শার্ঙ্গপাণি আমার হৃদয়ে প্রেম সিঞ্চন করিয়া দিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটস্থ রামস্বামী দর্শন করিবার নিমিত্ত মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। আসিবার সময় মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে প্রস্তর নির্ম্মিত "পোতামরাই" নামক এক সরোবর দেখিলাম। শার্ঙ্গপাণি স্বামীর মন্দির সহরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত।

রামস্বামীর মন্দির—যদিচ ইহার গোপুর ছোট তথাপি সৌন্দর্য্যে ও কারুকার্য্য গুণে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। একখানি বৃহৎ প্রস্তর কাটিয়া এক একটী থাম প্রস্তুত হইয়াছে। এবং তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু ও শ্রীরাম-চন্দ্রের বিস্তর খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে রামস্বামীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান, মন্দির সম্মুখে ধ্বজস্তম্ভ (Flag-staff) দণ্ডায়মান। তাঞ্জোরের নায়ক-বংশীয় শিবাপ্পা নায়কের পৌত্র রঘুনাথ নায়ক অষ্টাদশশত খৃঃ অব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

চক্রপাণি স্বামীর মন্দির কাবেরী নদীর উপর অবস্থিত। ইহার গোপুরম্ পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দিরের মত। অভ্যন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু দণ্ডায়মান মূর্ত্তিতে বিরাজিত। ইহার নিকটে একটী মহামোক্ষম্ নামক সরোবর আছে, দক্ষিণ ভারতে ইহা একটী পবিত্র ও প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এই সরোবরের চতুর্দ্দিকেই প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী শোভা পাইতেছে। উপরে ছোট ছোট মন্দির দ্বারা চারিদিক বেষ্টিত। ফেব্রুয়ারী মাসে প্রত্যেক বৎসর এখানে মেলা হইয়া থাকে; এবং প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে মহামোক্ষ নামক মুক্তিস্নান হইয়া থাকে। বার বৎসর অন্তর বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে গমন করিলে এই যোগ হয়। এই সময় এখানে প্রায় ৫০০০০০ যাত্রী স্নান করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকেন।

সোমেশ্বর স্বামী ও নাগেশ্বর স্বামীর মন্দির কিছু ছোট, ইহাদেরও গোপুর ও কারুকার্য্যময় মন্দির আছে। আমরা বৈকালে দেবদর্শনে বহির্গত হইয়া একটী একটী করিয়া ছয়টী মন্দিরের দর্শন শেষ করিলাম। কিন্তু কুম্ভেশ্বর স্বামীর মত একটীও সুন্দর ও সুবৃহৎ মন্দির নহে। কুম্ভেশ্বর সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। স্থল পুরাণমতে প্রলয়ের সময় এক ঘড়া অমৃত সুমেরুপর্ব্বতের গাত্রে সিকায় করিয়া ঝুলান ছিল। ক্রমে জল বাড়িয়া সিকার উপর পর্য্যন্ত উঠিল। তখন কলসী জলে ভাসিতে ভাসিতে দক্ষিণ দেশে আসে। প্রলয়ান্তে জল শুষ্ক হইলে এই স্থানে কলসী পতিত হইয়া ইহার কাণার এক অংশ ভাঙ্গিয়া অমৃত গড়াইতে থাকে। তখন মহাদেব তথায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক অমৃত পান করিয়া কুম্ভেশ্বর নাম গ্রহণ করিলেন। কুম্ভের কাণা ভাঙ্গিয়া ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম "কুম্ভকোণম্" হইয়াছে।

তাঞ্জোর।

রামেশ্বর দর্শন করিয়া বাটী প্রত্যাগমন কালীন আমরা এইস্থানে আসিয়াছিলাম। সেদিন পূর্ণিমা সন্ধ্যার পর গাড়ী তাঞ্জোরে পৌঁছিল। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রালোকে সহরের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। রাস্তাগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী ছত্র পাইলাম। সমস্ত দিন প্রভু সত্যনারায়ণের উদ্দেশে উপবাসী ছিলাম। ছত্রবাটীতে একটী সুন্দর কূপ ছিল। সেই কূপোদকে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া সত্যনারায়ণের পূজার উদ্যোগ করিলাম। সঙ্গে পুরোহিত মহাশয় ছিলেন, তিনি সত্য-নারায়ণের কথা পাঠ করিলেন। পূজান্তে কিঞ্চিৎ জল যোগ করিয়া সুস্থ হইলাম। রাত্রে আর দেবদর্শনে বহির্গত হইলাম না সুতরাং,
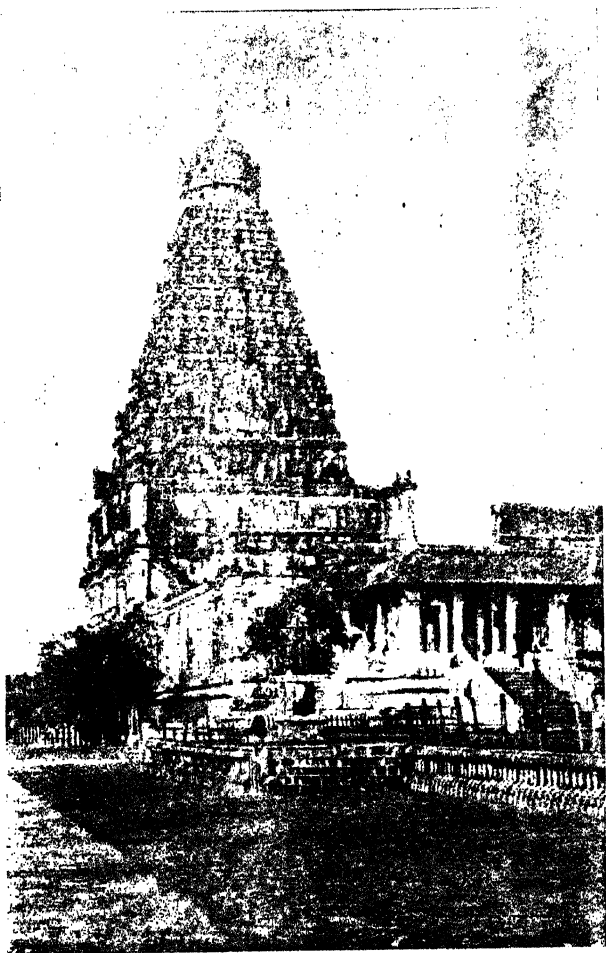
তাঞ্জোরের মন্দির।

(পৃঃ ২২১)

শয়নের যোগাড় করিলাম। ছত্রবাটার ম্যানেজার আসিয়া বলিলেন আপনারা এ ছত্র বাটিতে আসিয়া ভাল করেন নাই, কারণ এখানে ভয়ানক ছারপোকা, এখান হইতে কিয়দ্দূরে একটী ছত্রবাটী আছে সেই স্থানে গমন করুন, নচেৎ রাত্রে ছারপোকার জ্বালায় নিদ্রা হইবে না। সহযাত্রীদের অন্যছত্রে যাইবার আর কাহারও ইচ্ছা হইল না। অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে সুতরাং সেই স্থানেই সকলে শয্যা বিস্তার করিলেন। সমস্তদিন অনশনে ও অত্যন্ত ক্লেশে আমিও শয্যাশায়ী হইলাম। তখন রাত্রি প্রায় ১১টা।

ঘণ্টা খানেক পরেই ছারপোকার দংশনে সকলেই অস্থির হইয়া উঠিলাম। ছত্রবাটীতে একটী বৃহৎ লণ্ঠনে আলোক জ্বলিতেছিল। সেই দীপালোকে শয্যারদিকে চাহিয়া দেখি পিপীলিকা শ্রেণীবৎ ছারপোকা সকল দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রথমে আমার পিপীলিকা বলিয়াই ভ্রম হইয়াছিল, শেষে দেখি সেগুলি যথার্থই ছারপোকা। আমাদের দেশের ছারপোকা অতি ভীরু, কারণ তাহারা প্রাণভয়ে ক্ষুদ্র গর্ত্তে নিজদেহ লুকাইত রাখে, সুবিধা পাইলে দংশন করিয়াই পলায়ন করে। কিন্তু এদেশের এই নির্ভীক শোণিত পিপাসু ক্ষুদ্র কীটগুলিকে স্বাধীনভাবে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম। একটা দুইটা করিয়া কয়টার প্রাণসংহার করিব? তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিছানায়, গাত্র বস্ত্রে এমনকি মস্তকের কেশে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া দংশন করিতে করিতে অস্থির করিয়া তুলিল। সুতরাং বাধ্য হইয়া রণে প্রবৃত্ত হইলাম, এমন সময় উপরের চাল হইতে ঝুপঝাপ করিয়া কতকগুলি ছারপোকা পড়িতে লাগিল তাহাদের আক্রমণে আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিলাম না, সুতরাং রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলাম। এরূপ ছারপোকা কখনও দেখিনাই এবং আর কেহ দেখিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না।

আমাদের সহযাত্রী দুটী বাবু ও কয়েকটী স্ত্রীলোক সেই ছত্রে বসিয়া বসিয়া কোন গতিকে নিশা অতিবাহিত করিলেন। কেবল পুরোহিত মহাশয় ও আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ষ্টেশনে যাইয়া কম্বল বিছাইয়া দুইজনে শয়ন করিয়া রহিলাম। প্রভাতে পুনরায় ছত্রবাটীতে আসিলাম, তথায় যাইয়া সহযাত্রীদের সারানিশি জাগরণের কথা শুনিলাম। আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া ম্যানেজার মহাশয় হাস্য করিতে লাগিলেন—বলিলেন কেন অন্য ছত্রে গমন করিলেন না; আমরা তাঁহার কথায় আর কোন জবাব না দিয়া তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলাম। ছত্রবাটীর কূপোদকে সকলে স্নান করিয়া তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দির দর্শনে বহির্গত হইলাম। সঙ্গে কোন পাণ্ডা নাই। সুতরাং পথের দুই একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া অনতিদূরস্থ মন্দির সন্নিকটে উপনীত হইলাম। এখানে কোন পাণ্ডার আমদানি দেখিলাম না। পাণ্ডা আছে কি না তাহাও জানিনা, আমরা নিজেরাই মন্দির সম্মুখীন হইলাম।

মন্দির একটী দুর্গমধ্যে অবস্থিত সুতরাং চতুর্দ্দিকে গড় কাটা রহিয়াছে। সময়ে সময়ে এই গড়ের চতুর্দ্দিক জলে পূর্ণ থাকে। আমরা এই গড়ের চতুর্দ্দিক শুষ্ক দেখিলাম। স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ মাত্র জল আছে। এই গড় অতি গভীর ও প্রশস্ত। মন্দিরে যাইবার জন্য ইহার উপর একটী সেতু আছে। সেই সেতুর উপর দিয়া আমরা গমন করিলাম; দূর হইতেই মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হয়। আমরা সেই চূড়া দেখিয়াই এই স্থানে সহজে আসিয়া পৌঁছিলাম।

তাঞ্জোরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নামে দুইটি দুর্গ আছে, কিন্তু এই দুটী দুর্গই এত নিকট ও এরূপভাবে পরস্পর সংলগ্ন যে ইহাকে একটী দুর্গ বলিলেই হয়। ক্ষুদ্র দুর্গ মধ্যে প্রধান দেবালয় ও সোয়ার্ট গির্জ্জা এবং বৃহৎ দুর্গে রাজ প্রাসাদ অবস্থিত। ৯০ ফিট্ উচ্চ বৃহৎ গোপুর

তাঞ্জোর—বৃহদীশ্বরের ষাঁড়। (পৃঃ ২২২)

অতিক্রম করিয়া দেবালয় যাইতে হয়। তাহার পর ১৭০ ফিট দীর্ঘ পথ তৎপরে আবার দ্বিতীয় গোপুর দেখিলাম ইহা উচ্চে ৬০ ফিট মাত্র, ছোট গোপুর পার হইয়া একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণভূমি প্রাপ্ত হইলাম। ইহা দীর্ঘে ও প্রস্থে ৮০০ × ৪১৫ ফিট্ এবং সমস্ত প্রস্তর মণ্ডিত। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিমে ও মূল মন্দিরের সম্মুখে রেলিং শোভিত প্রস্তর গ্রথিত বেদীর উপর একটি প্রকাণ্ড নন্দী মূর্ত্তি বা শিববাহন বৃষভ-দেব চরণ মুড়িয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে। এই ষাঁড় একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহা দীর্ঘে ১৬ ফিট এবং উচ্চে ১২ ফিট এই বৃহৎ ষাঁড় দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। বিশেষ এক খণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া আরও বিস্মিত হইলাম। ইহার সম্মুখে বৃহদেশ্বর বা বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। ইহার মধ্যস্থিত মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি ও পূর্ব্বোক্ত নন্দী মুর্ত্তি একটী গ্রেনাইট প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিরূপে যে এই বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড আনীত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। শুদ্ধ নন্দী মুর্ত্তিই ওজনে ২৫ টন। এই বৃহদেশ্বর মন্দিরের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

নন্দীর দক্ষিণভাগে পার্ব্বতীর মন্দির। দেবীর নাম পেরিয়ানায়া-গিরাম্মল, ইহার সম্মুখস্থ বৃহদেশ্বর মন্দিরের পশ্চাতে শিবগঙ্গা নামক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ইহার উপর মিশনরি সাহেবদিগের এক গির্জ্জা আছে। ইহারই নাম সোয়ার্ট গির্জ্জা। পূর্ব্বে এখানে ইংরাজ সৈন্ত থাকিবার সেনা নিবাস হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা তহশীলদার ও ট্রেজারি কাছারিরূপে পরিণত হইয়াছে। শিব গঙ্গার জল স্বচ্ছ না হইলেও অতি সুমিষ্ট।

মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিম উত্তর কোণে সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দির। ইহা ছোট হইলেও ইহার গঠন প্রণালী অতি উত্তম। সুব্রহ্মণ্য কোভিল অর্থাৎ দেব সেনাপতি কার্ত্তিক। ডাঃ বার্ণেসের মতে দাক্ষিণাত্যে

এই মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বৃহৎ ও বিখ্যাত। নন্দী মূর্ত্তির পশ্চিমধারে তিন সারি থামের উপর বারাণ্ডা, তাহারপর ৭৫×৭০ ফিট দুইটী দালান, তাহার পর ৫৬×৫৬ ফিট আর একটী প্রাঙ্গণ। এই সমস্ত স্থানের উপর, সুবিস্তৃত বিমানের ২০০ ফিট উচ্চ চূড়া শোভা পাইতেছে। বিজয় নগরের অন্যতম রাজা কৃষ্ণ রায়ই এই সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। চোলচরিত্র নামক গ্রন্থে জানা যায় যে এই বৃহৎ মন্দিরগুলির নির্ম্মাণ কার্য্য ১২ বৎসরে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কাঞ্চীপুর নিবাসী সোমবর্ণ নামক কোন ভাস্কর কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। এক সময়ে এই মন্দিরের কত সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে সংস্কার অভাবে ও রৌদ্র বৃষ্টির অনুগ্রহে যেন কৃষ্ণবর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং ভুবনেশ্বর মন্দিরের মত ইহা চর্ম্মচর্চ্চিকার বিহার ক্ষেত্র হইয়াছে। দুর্গন্ধে তথায় তিষ্ঠান ভার, মন্দির দেখিয়া যেমন প্রীত হইয়াছিলাম, চর্ম্মচর্চ্চিকা ও দেবতার পূজার বন্দোবস্ত দেখিয়া তদ্রূপ ক্ষুণ্ণমনে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পূজা পদ্ধতি অন্যান্য শিব মন্দির সদৃশ, কিন্তু আর সে আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্য নাই, এক্ষণে কেবল নিয়ম রক্ষা হইতেছে মাত্র। পূজার বন্দোবস্ত যেমনই হউক না কেন, কতকগুলি দেব নর্ত্তকী কিন্তু আছে। তাহাদের পূজা ষোড়শউপচারে হইয়া থাকে। উৎসবের সময় ইহারা নৃত্য করিয়া থাকে কিন্তু প্রত্যহ নৃত্য করে না। বামদিকে-গণপতির মন্দির আছে।

বৃহৎ দুর্গ মধ্যে রাজ প্রাসাদ অবস্থিত। ইহার মণ্ডপ অতি উচ্চ। প্রাসাদ মধ্যে রাজা সরবোজীর মর্ব্বেল প্রস্তরের নির্ম্মিত একটী মূর্ত্তি আছে, দেয়ালের একস্থানে লর্ড পিগটের ফটোগ্রাফ আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য রাজগণের প্রতিকৃতি আছে। সরস্বতী মহলে একটী লাইব্রেরী আছে। তাহাতে প্রায় ১৮০০০ হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে ৮০০০ তাল পত্র লিখিত। ভারতের অন্য কোন লাইব্রেরীতে এত

অধিক তালপত্র লিখিত পুস্তক নাই। মহারাষ্ট্র দরবারহল নামক অন্য প্রকোষ্ঠে শিবজীর বৃহৎ মূর্ত্তি আছে; তাঁহার বাম পার্শ্বে দেওয়ান ও দক্ষিণে সেক্রেটারীর মূর্ত্তি বিরাজিত। অস্ত্রগৃহে নানা প্রকার আশ্চর্য্য-জনক অস্ত্র সকল আছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত হাতলযুক্ত তরবারি, কামান, পিস্তল, বন্দুক, ও হস্তীর উপর সুবর্ণ নির্ম্মিত হাওদা, নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি আছে। এই গৃহটী দেখিতে অতি সুন্দর। রাজার সিংহাসন কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। কেবল কারুকার্য্য খচিত একখানি চেয়ারমাত্র তথায় রহিয়াছে। শিবগঙ্গা সরোবরের নিকটস্থ গির্জ্জার মধ্যে পাদ্রি সোয়ার্টের মৃত্যু সময়ের দৃশ্য আছে। বৃদ্ধ পাদ্রি সোয়ার্ট (Rev. Schwertz) রাজা সরফোজীর (শরভজীর) গুরু ছিলেন। শ্বেত মার্ব্বেল প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃদ্ধ পাদরী মৃত্যুশয্যায় শয়ান বামে তাঁহার প্রিয় শিষ্য রাজা সরফোজী দুই জন রক্ষক সহ দণ্ডায়-মান। দক্ষিণে পাদ্রি কোলনার ও পাদদেশে চারিটী বালক দণ্ডায়মান। এই সমস্ত মূর্ত্তি ভাস্করবিদ্যায় অদ্বিতীয় ফ্লাক্সম্যান সাহেব নির্ম্মাণ করেন।

তাঞ্জোরের রাজা তুল জাজীর পুত্র না থাকায় মৃত্যুকালে শরভজী (সরফোজী) নামক কোন আত্মীয়ের পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৭৮৭ খৃঃ রাজা তুলজাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর সিংহের হস্তে ৯ বৎসর বয়স্ক সরফোজীকে সমর্পণ করিয়া যান। কিন্তু অমর সিংহ রাজ্যলোভ সম্বরণ করিতে না পারায় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন যে, "রাজা তুলজাজীর দত্তক গ্রহণ শাস্ত্রানুসারে ঠিক হয় নাই। কারণ শরভজী তাঁহার পিতার একমাত্র সন্তান, অধিকন্তু তুলজাজী দত্তক গ্রহণের সময় সজ্ঞান ছিলেন না"। এই আবেদনে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঞ্জোরের পণ্ডিতগণের নিকট মত চাহিলে, তাঁহারাও

তুলজাজীর দত্তক গ্রহণ ঠিক হয় নাই বলিয়া মত দেন। মাদ্রাজ গভর্ণর ডাইরেক্টরগণের সহিত একমত হইয়া অমর সিংহকে রাজ্য দেন। এই সম্বন্ধে এক সন্ধিপত্র হয় তাহাতে অমর সিংহ স্বাক্ষর করেন যে তুল-জাজীর বিধবা পত্নীকে তিনি বাৎসরিক ৩০০০ স্বর্ণ মুদ্রা ও দত্তকপুত্র সরফোজীকে বাৎসরিক ১১০০০ স্বর্ণমুদ্রা দিবেন।

জর্ম্মণ পাদ্রি সোয়ার্ট রাজা তুল জাজীর পরম বন্ধু ছিলেন, তিনি রাজার মৃত্যুর পর বালক সরফোজীর সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন। কিয়দ্দিবস পরে পাদ্রি সাহেব জানিলেন যে বালকের প্রতি অত্যাচার হইতেছে। তখন তিনি রাজার বিধবা পত্নী ও বালককে মাদ্রাজে আনয়ন করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসকে সমস্ত বিষয় অবগত করান। তৎপরে এই দত্তক গ্রহণ ঠিক হইয়াছে কিনা তাহা পুনর্ব্বিচারের জন্ম গভর্ণরকে অনুরোধ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস কাশী ও অন্যান্যস্থানের পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে মত লইয়া দেখেন যে দত্তক গ্রহণে কোন দোষ হয় নাই। তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস এই বিষয় বিলাতে লিখিয়া পাঠান। বিলাতের হোম গভর্ণমেণ্ট অনেক বিবেচনা করিয়া সর-ফোজীকে রাজ্য প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন। মার্কুইস্ অফ্ ওয়েলেস্‌লি এই অনুমতি পত্র লইয়া আসেন। পাদরী সাহেবের চেষ্টায় সরফোজী ১৭৯৮ খৃঃ জুন মাসে তঞ্জাবুর রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা অমরসিংহ বাৎসরিক ২৫০০০ পেগোডা (স্বর্ণমুদ্রা) পাইবেন, এই স্থির হইল।

এদিকে রাজকার্য্যে শরফোজীর অভিজ্ঞতা না থাকায় মাদ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল তাহার অছিস্বরূপ হইয়া রাজ্যশাসন করেন। শেষে স্থির হইল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার রাজ্যশাসন করিবেন, রাজা দুর্গের মধ্যে থাকিয়া বাৎসরিক ১০০০০০ লক্ষ পেগোডা (স্বর্ণমুদ্রা) পাইবেন এবং সমস্ত আয়ের পঞ্চমাংশের এক অংশ পাইবেন। রাজা
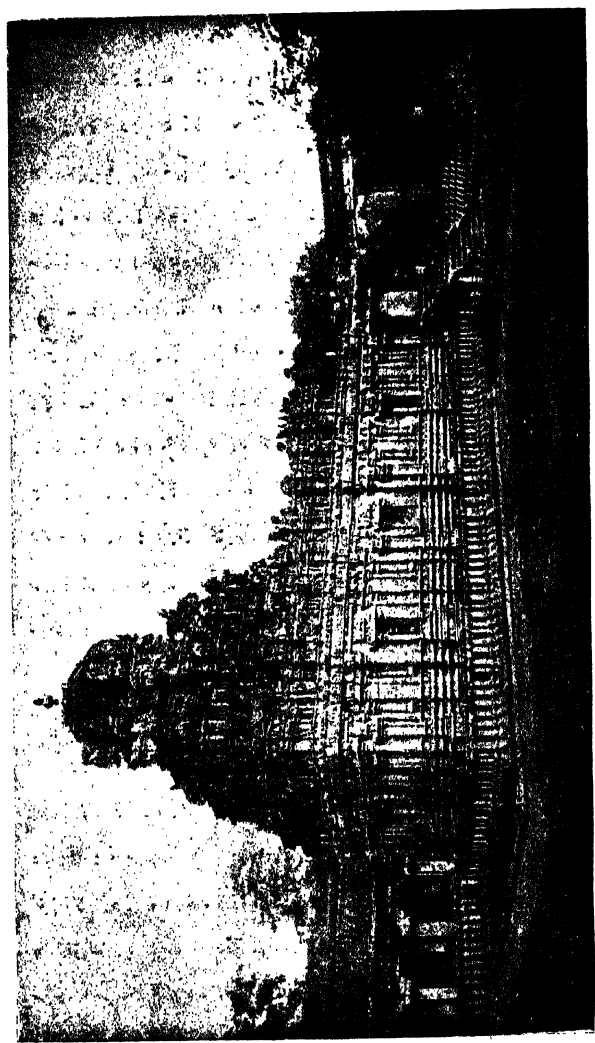
তাঞ্জোর—সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দির। (২২৭ পৃঃ।)

Printed by K. V. Seyne & Bros.

সরফোজীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং H. H. ও C. I. E. উপাধি ও ২১টী তোপে সম্মানিত ছিলেন। ১৮৩২ খৃঃ তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র (দ্বিতীয়) শিবজী ঐ হিসাবে বৃত্তি ও সম্মান ভোগ করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ পরলোক গমন করেন। তাঁহার কোন পুত্র না থাকায় বংশ লোপ হয় এবং দত্তকপুত্র লইলেও মার্কুইস্ অফ ডেলহৌসী তাহা স্বীকার করেন নাই, সুতরাং তাঞ্জোর-রাজ্য সেই সময় হইতে ইংরাজদের সম্পূর্ণ দখলে আসিল।

বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে যে অনুশাসন খোদা আছে সেই অনুশাসন সাহায্যে ডাক্তার বুরনেল (Dr. Burnell) চোলরাজদিগের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঞ্জোর প্রথমে চোলরাজদিগের রাজধানী ছিল। রাজা নরেন্দ্র চোল ১০২৩ খৃঃ হইতে ১০৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে ৪ জন রাজার পর ১০৮০ খৃঃ কুলুতুঙ্গ চোলরাজ দেবসেবার নিমিত্ত দেবোত্তর ও অনেক ভূসম্পত্তি দান করেন। সম্ভবতঃ তিনিই বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই হিসাবে বৃদ্ধেশ্বরের মন্দির ৮০০ বৎসরের অধিক হইবে। পরে শিবজীর ভ্রাতা বেঙ্কজী তাঞ্জোর দখল করিয়া তথায় মহারাষ্ট্রবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৫৮ খৃঃ ফরাসি গভর্ণর লালী সাহেব মহারাষ্ট্রীয় নৃপতির নিকট হইতে তাঞ্জোর আক্রমণ করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৭৭৬ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয় রাজা তুলজাজীকে তাঞ্জোর পুনরায় প্রদান করা হয়। তাঁহারই দত্তকপুত্র শরফোজীর বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৫৫ খৃঃ হইতে তাঞ্জোর ইংরাজদিগের দখলে আসে।

তাঞ্জোরে বহুসংখ্যক নদী নালা ও খাল প্রবাহিত। তাঞ্জোর বেশ সমৃদ্ধিশালী ও বহুসংখ্যক লোকের বসবাসপূর্ণ সুন্দর সহর। ইহা কাবেরী নদীর ব-দ্বীপের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। এখানকার সিল্কের

কাজ করা বস্ত্রাদি, তামার দ্রব্য, কাষ্ঠনির্ম্মিত চেয়ার, টেবিল, বড় বড় গালিচা ও সুন্দর সুন্দর কার্পেট প্রভৃতি আদরের সহিত সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন জহরতের অলঙ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রোটেষ্টাণ্ট পাদ্রিগণ এই তাঞ্জোরেই খৃষ্টধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন। এখানে সব্-ম্যাজিষ্ট্রেট্, রেজিষ্ট্রার, মুন্‌সেফ্, প্রভৃতির আদালত আছে। এখানকার জমী বাঙ্গালা দেশের মত উর্ব্বরা; ধান্য, নারিকেল, আম্র, তেঁতুল ও নানাবিধ ফল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

তাঞ্জাবুরমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থে তাঞ্জোরের উৎপত্তি বিষয় বর্ণিত আছে যে, তন্‌জান্ নামে কোন রাক্ষস এই স্থানে অনবরত দৌরাত্ম্য ও সকল লোকের প্রতি অত্যাচার করিত। এই দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকে ভগবান্ বিষ্ণু বধ করেন; সে মৃত্যুকালে প্রার্থনা করে যে তাহার নামে যেন এই নগর হয়। "তথাস্তু" বলিয়া ভগবান্ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। সেই রাক্ষসের নামানুসারে ইহা তাঞ্জাবুর বা তাঞ্জোর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাঞ্জোরে আমরা এক রাত্রি থাকিয়া পরদিবস মন্দিরাদি দেখিয়া প্রস্থান করি।

নেগাপত্তম্।

তাঞ্জোর হইতে যে লাইনটী বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে সমুদ্রের দিকে গিয়াছে, তাহার শেষ ষ্টেশন নেগাপত্তম্ বা নাগপত্তন্। ইহা তাঞ্জোর হইতে ৪৮ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে দিনেমারদিগের রাজধানী ছিল। শতাধিক বর্ষ হইতে ইহা ইংরাজদিগের দখলে আছে। ইহা বহু প্রজাবিশিষ্ট পুরাতন বন্দর। এখানে লুব্বায় নামক এক প্রকার জাতি আছে, তাহারা হিন্দু ও আরব জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারা অতি সাহসী, পরিশ্রমী ও ধূর্ত্ত এবং সংখ্যায় প্রায় শতকরা ২০ জন এই জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। অধি-

বাসীর সংখ্যা প্রায় ৫৮০০০। নাগপত্তন্ বন্দর তিন ভাগে বিভক্ত। উত্তর ভাগের নাম কাদামবাদী, মধ্যভাগের নাম ভেলিপ্পালিয়ম এবং দক্ষিণ ভাগের নাম শুদ্ধ নাগপত্তন্ বা সর্পপুরী। এখানে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে প্রধান রাজবর্ত্ম হলাণ্ড ষ্ট্রীট, সেণ্টপিটার্স চার্চ্চ দিনামারদিগের সমাধি-স্তম্ভ, সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোংর লোকোমোটিভ ওয়ার্কসপ্ ও চিপষ্টোর এবং সমুদ্রতীরে নাগোদ নামক স্থানে কাদের উলিয়ার সৈয়দ তাহার পুত্র ও পুত্রবধূর ৩টী প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির (মস্ক) দর্শনযোগ্য। এই মস্কের আয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

পেরুমল স্বামীর মন্দির ব্যতীত বিশেষ কোন দর্শনযোগ্য তীর্থ না থাকায় আমরা এখানে অবতরণ করি নাই। উক্ত মন্দিরটী অতি প্রাচীন ও গ্রেনাইট প্রস্তর-নির্ম্মিত। পেরুমলস্বামীর উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পুরাকালে ব্রহ্মা দক্ষিণাম্বুধিতটে মহাবিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে এই স্থানে দর্শন দিয়াছিলেন। তজ্জন্য ব্রহ্মা এই স্থানে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। স্থানীয় লোকেরা এই কারণে ইহাকে তীর্থস্থান কহে। এখান হইতে কিয়দ্দূরে কায়ারোহণ স্বামী নামক শিবমন্দির আছে। দেবীর নাম নীলায়তাক্ষী। এই মন্দিরের কারুকার্য্য অতি উত্তম। প্রত্যেক স্তম্ভে পূর্ণায়তন সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুর মূর্ত্তি এবং মুনি ঋষি ও দেবদেবীর ক্ষোদিত মূর্ত্তি আছে। ইহার সম্মুখের গোপুরটী অসম্পূর্ণ। নটকোটার শ্রেষ্ঠীরা বহু অর্থব্যয়ে ইহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

পশ্চিম দক্ষিণ মন্‌সুন্‌বায়ু বহিবার সময় নাগপত্তন হইতে দেশীয় পোত সকল বঙ্গোপসাগরের অন্যান্য বন্দরে যাতায়াত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে রেল হয় নাই তখন অধিকাংশ যাত্রী এই নাগপত্তন হইতে ষ্টীমারে আরোহণ করিত। এখন রেল হওয়ায় এস্থানের আর আদর নাই। এখনও বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেসন

এবং এসিয়াটিক কোংর ষ্টীমার নিয়মিতরূপে এখানে যাতায়াত করে। ১৬০ খানি নৌকা মাল বোঝাই ও খালাস করিবার জন্য উপস্থিত থাকে। সমুদ্রের বাতিঘর (Light House) একটী দেখিবার জিনিষ। প্রায় ১৪ মাইল দূর হইতে ইহার আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিচিনাপল্লী।

বেলা ৭টার সময় আমরা ত্রিচিনাপল্লী নামক বৃহৎ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার আমাদের টিকেট দেখিয়া একটু গোলযোগ করিলেন, বলিলেন এ টিকেটে প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে আসা উচিৎ ছিল কেন আপনারা ডাকগাড়ীতে আসিলেন? এই কথা লইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত বচসা হইল। তৎপরে তিনি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। এই স্থানে বলিয়া রাখি এদিকের গাড়ীতে Inter Class নাই। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখি কতকগুলি গো-যান ও দুইটী অশ্বযান যাত্রী লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ষ্টেশন হইতে শ্রীরঙ্গমের মন্দির ৫ মাইল, সুতরাং গাড়ী চাই। ঘোড়ার গাড়ীতে আমাদের সকলকে ধরিবে না বলিয়া এবং বহুসুলভ হেতু ২ খানি গরুরগাড়ী ভাড়া করিলাম। ভাড়া ১৵০ আনা হইল। গো-যানে বসিয়া সহরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা ১০টার সময় কাবেরী নদীর ব-দ্বীপস্থ শ্রীরঙ্গমজীর মন্দির সান্নিকটস্থ বাসাবাটী পাইলাম।

ত্রিচিনাপল্লীর রাস্তা ঘাট অনেকটা শ্রীরামপুরের মত। অদূরে পর্ব্বতপুঞ্জ মেঘমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। একটী পর্ব্বত-শিখরে গণেশের শুভ্র মন্দির শোভা পাইতেছিল। গাড়ী হইতে এই চূড়াচ্ছাব সন্দর্শন করিয়া মনে অপূর্ব্ব আনন্দ হইতে লাগিল। এখানকার বিগ্রহ দেখিবার জন্য আর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম না। কারণ তাহা সময়সাপেক্ষ। সময়ের অল্পতাহেতু দূর হইতে এই মন্দির

শ্রীরঙ্গমের গোপুরম্ (পৃঃ ২২১)
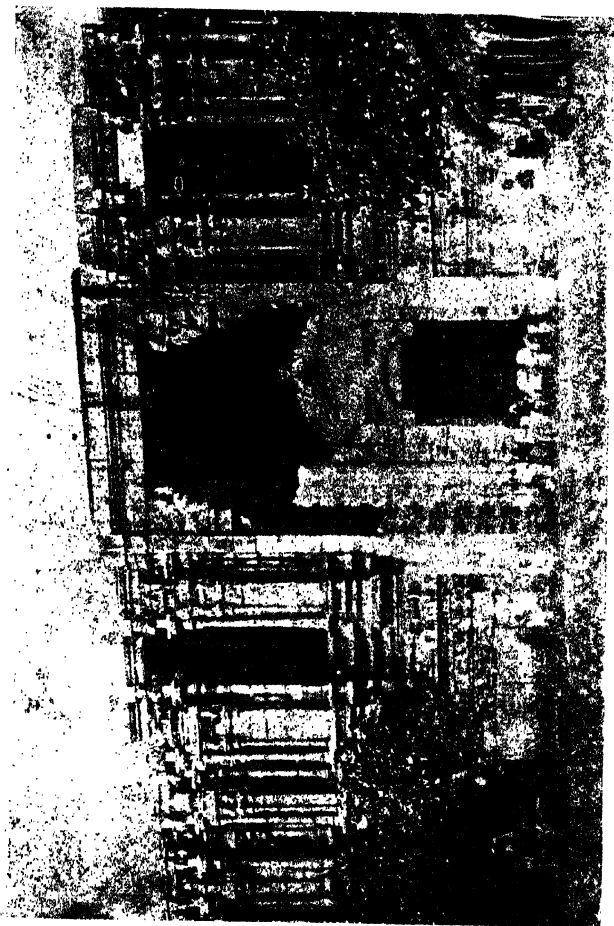
দর্শন করিলাম ও ভগবান্‌কে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। এই মন্দির দেখিতে দেখিতে কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদের গাড়ী কাবেরী নদীর সেতুর উপর আসিল। তাহার উপর দিয়া গাড়ী যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কাবেরী নদীর খাল দৃষ্ট হইল। অতঃপর ৫।৭ মিনিট পরে শ্রীরঙ্গমের বৃহৎ গোপুর সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বাটীতে আশ্রয় লইলাম। ভাড়া দৈনিক ।॰ চারি আনা ধার্য্য হইল। যদিচ তথায় অনেক ছত্রবাটী আছে, সেগুলি একটু দূরে বলিয়া আর তথায় যাইলাম না। বাসায় বস্ত্রাদি রাখিয়া কাবেরী নদীতে স্নান করিতে গমন করিলাম। সেই সময় একজন পাণ্ডা আসিয়া জুটিল। বাসা হইতে কাবেরী নদী প্রায় অর্দ্ধ মাইল। চাঁদনী ও সোপানযুক্ত সুন্দর ঘাটে আমরা উপনীত হইলাম। কাবেরী নদীতে নারিকেল ভেট করিয়া স্নান করিলাম। নারিকেলের মূল্য ও দক্ষিণা স্বরূপ পাণ্ডাঠাকুর প্রত্যেকের নিকট হইতে ৵॰ আনা করিয়া আদায় করিলেন। স্নানান্তে বাসায় আসিয়া আমরা পাণ্ডার সহিত দেবদর্শনে বহির্গত হইলাম।

বাসার পার্শ্বেই শ্রীরঙ্গমজীর মন্দির, মন্দিরের সম্মুখেই বৃহৎ গোপুর। ইহার একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। এই ছবির দক্ষিণদিকে যে একটী চালা দৃষ্ট হইতেছে, উহার অভ্যন্তরে আমাদের বাসা হইয়াছিল। বাসাটী ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত, কিন্তু রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারণের জন্য সম্মুখে ঐরূপ একটী চালা ছিল; যাহা হউক বাসা হইতে নির্গত হইয়া গোপুরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। সম্মুখের এই গোপুরটী অসম্পূর্ণ বলিয়া গম্বুজের উপরের প্রাচীর ছাদবিহীন ও ভগ্নাবস্থাপন্ন, কিন্তু ইহা উচ্চে ৪॰ ফিট্। ইহা উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ঊর্দ্ধে উঠিবার একটী ছোট সোপান আছে তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। এই প্রাচীরে যে গোপুর আছে তাহার দরজা দীর্ঘে ২১ ফিট্ এবং প্রস্থে ৬ ফিট্। এই

দরজার ছাদ ঢাকিবার জন্য ১৬ খান শ্লেট পাথর আছে। তন্মধ্যে সর্ব্ব-বৃহৎটী ৩৩ ফিট্ দীর্ঘ, প্রস্থে ৫ ফিট্ এবং গভীর ৭ ইঞ্চি। সর্ব্ব ছোট-খানি দীর্ঘে ৩১ ফিট, প্রস্থে ৫ ফিট এবং গভীর ৫ ফিট ১০ ইঞ্চি। একবার ভাবিয়া দেখুন এক একখানি কত বড় পাথর কিরূপে খনি হইতে এই স্থানে আনীত হইয়াছিল।

যাহা হউক এই যে প্রথম প্রাচীরটীর বিষয় বর্ণিত হইল, এইরূপ ৭টী প্রাকার এই মন্দিরে বিদ্যমান। ইহার মধ্যে অতিথিশালা ধর্ম্মশালা, দোকান ও বসতবাটী আছে। ছয়টী দ্বার পার হইয়া শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরে যাইতে হয়। হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতি চতুর্থদ্বার অতিক্রম করিতে পারে না। সমস্ত মন্দিরটী চতুর্দ্দিকের সীমা লইয়া প্রায় ১ মাইল। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত স্থান দেখিতে প্রায় সমস্ত দিবাভাগ অতীত হয়। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টী গোপুর আছে। এরূপ বৃহৎ মন্দির ভারতে আর নাই। মন্দিরাভ্যন্তরে সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী ও সুবন্দোবস্তপূর্ণ মণ্ডপগুলি দেখিলে ও মন্দিরের মহীয়সী মূর্ত্তি চিন্তা করিলে মনে একপ্রকার গম্ভীরভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এই মন্দিরের ঐশ্বর্য্য ও পরম রমনীয় দৃশ্য ও নানালঙ্কার বিভূষিত ভগবান্ শ্রীরঙ্গজী যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহার জীবন বৃথা। এক একটী প্রাকার কত বড় এবং তাহার মধ্যে কত ঘর বাড়ী ও কত দোকান, বাজার, হাট প্রভৃতি আছে তাহা একবার পাঠ করুন। এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ও অদ্ভুত মন্দির মনুষ্যজীবনে প্রত্যেকেরই দর্শন করা উচিত।

প্রথম প্রাকার ও গোপুর পার হইয়া একটী রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাস্তাটীতে বহুলোকের বসতবাটী আছে। হিসাবে জানা যায় যে এখানে ১০১২ ঘর গৃহস্থ ও অন্যান্য লোকের বাস আছে। এই প্রাকারটী দীর্ঘে ৩০৭২ ফিট প্রস্থে ২৫২১ ফিট এবং উচ্চে ৪০ ফিট। দ্বিতীয় প্রাকার দীর্ঘে ২১০৮ ফিট এবং প্রস্থে ১৮৪৬ ফিট, ইহারও

চারি ধারে ৭১৬ ঘর গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ৮০ ঘর ব্যবসায়ী গৃহস্থ লোকের বাস। তৃতীয় প্রাকার দীর্ঘে ১৬৫৩ এবং প্রস্থে ১২৭০ ফিট। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ রাস্তায় ২১১ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ও কতকগুলি দোকান আছে। চতুর্থ প্রাকার দীর্ঘে ১২৩৫ ফিট এবং প্রস্থে ৮৪৯ ফিট। ইহাতে ৩টী গোপুর আছে। পূর্ব্বদিকের গোপুরটীর গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর, ইহা ১৪৬॥ ফিট উচ্চ। ইহার মধ্যে শতস্তম্ভ মণ্ডপ আছে। মাঘমাসে বৈকুণ্ঠ-একাদশী উপলক্ষে শ্রীরঙ্গনাথের ভোগমূর্ত্তি এই মণ্ডপে আনীত হয়। এই স্থানে অনেক পতিত জমি আছে। উৎসবের সময় এই জমির উপর ৩।৪ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া (Pendal) আটচালা প্রস্তুত করা হয়। এই প্রাকারের বহির্দ্দেশে একটী রাস্তা আছে, উহার দুই পার্শ্বে দোকান ও ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান আছে।

পঞ্চম প্রাকার দীর্ঘে ৭৬৭ ফিট ও প্রস্থে ৫০৩ ফিট। এই প্রাকার হইতে সপ্তম প্রাকার পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছ ও অহিন্দুগণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ষষ্ঠ প্রাকার ৪২৬ × ২৯৫ ফিট এবং সপ্তম প্রাকার ২৪০ × ১৮১ ফিট। সুতরাং প্রথম প্রাকার হইতে শেষ প্রাকার পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়াছে। মূল মন্দিরটী ছোট কিন্তু ইহার ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। সপ্তম দ্বারের পর সুবর্ণ কলস শোভিত শ্রীরঙ্গনাথের মূল মন্দির। ইহার অভ্যন্তরে দেওয়ালে শেষ-পর্য্যঙ্কে ভগবান শ্রীরঙ্গজী শয়ন করিয়া আছেন। ইহার নিম্নে সুন্দর সিংহাসনে নানালঙ্কারভূষিত শ্রীরঙ্গজীর সুন্দর বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। দেওয়ালের মূর্ত্তি উজ্জ্বল কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং তিনি শয়ন করিয়া আছেন, কিন্তু নিম্নের বিগ্রহটী দণ্ডায়মান। সম্ভবত ইনি ভোগমূর্ত্তি। শ্রীরঙ্গজীর চিত্র প্রদত্ত হইল। ইহা দেখিলেই ঠাকুরের অধিষ্ঠান বুঝিতে পারিবে। দেবতার বলয় ও পদক বহুমূল্য হীরক, পান্না ও চুনিদ্বারা গঠিত। শুদ্ধ পদকখানির মূল্য ৩৫,০০০ টাকা। তদ্ভিন্ন বহুমূল্য

হীরকখচিত অঙ্গুরী, পাদাভরণ, কণ্ঠাভরণ, মুকুট ও অন্যান্য অলঙ্কার আছে। দেবতার সম্মুখে প্রকাণ্ড গরুড় মূর্ত্তি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া যেন ভগবানের স্তুতি করিতেছে। মন্দির সম্মুখে সুন্দর সোণার তালগাছ বা সুবর্ণ স্তম্ভ (Flag staff) শোভা পাইতেছে। এখানে শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি,

শ্রীরঙ্গজীর মূর্ত্তি।

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। গরুড়ের এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর কখনও কোথাও দেখি নাই, দেখিলে মনে ভক্তি ও প্রীতির উদয় হয়। ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখিয়া যতটা ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল, গরুড়ের মূর্ত্তি দেখিয়া সে ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল।

শ্রীরঙ্গমের মন্দিরেরস্তম্ভ

যেন আজ সপ্ত প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়াছি। আহা প্রভু শ্রীরঙ্গনাথজী, আপনার চরণে কোটী কোটী প্রণাম, আজ আমরা যথার্থই ধন্য হইলাম।

এই মন্দিরের আভ্যন্তরিক স্তম্ভ সকল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এরূপ মনোহর ও প্রকাণ্ড স্তম্ভ অন্য কোথাও দেখি নাই। প্রত্যেক স্তম্ভে অশ্বারোহী যোদ্ধৃগণ উন্মুক্ত কৃপাণে সজ্জিত হইয়া বৃহৎ অশ্বোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার উপরে একটী প্রকাণ্ড উচ্চ স্তম্ভ একখানি প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত হইয়া উর্দ্ধে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদুপরি কারুকার্য্যশোভিত মণ্ডপের ছাদ রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ স্তম্ভ যে কত তাহার ইয়ত্তা নাই। কতদিনে এবং কিরূপে যে এই অদ্ভুত স্তম্ভ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ধন্য শিল্পী! ধন্য তাহার নিপুণতা! আর ধন্য সেই ধনকুবের, যাঁহার অর্থ এবং উদ্যোগে এই অদ্ভুত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটী এত বড় যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্বস্থান দেখিতে এক সপ্তাহেও শেষ হয় না। সাধারণ ভাবে দেখিতেও সমস্ত দিন সময় লাগে। এমন বৃহৎ ব্যাপার আর কোথাও দেখি নাই। মন্দিরের তৃতীয় প্রাকারে যে সকল দোকান আছে তথায় শ্রীরঙ্গজীর প্রতিমূর্ত্তি সুন্দর রাংতার পাতের উপর নির্ম্মিত হইয়া ২।৪ পয়সায় বিক্রীত হইতেছে। আমরা কতকগুলি ঐ ছবি ক্রয় করিলাম। এই মন্দিরে একটী সুন্দর পুষ্করিণী দেখিলাম, তাহার তীরে একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে। সেটী দেখিতে ঠিক পুরীর সিদ্ধ বকুলের মত। শ্রীরঙ্গজীর মন্দির দেখিয়া যখন বাহিরে আসি তখন এই অপরূপ মন্দিরের একটী প্রতিকৃতি (photo) লইবার জন্য photographerএর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও photographer পাইলাম না। শেষে প্রথম প্রাকারের পরেই যে রাস্তাটী গিয়াছে সেই রাস্তায়, অল্প ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ একটী

ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তিনি আমাকে দ্বিতলোপরি একটী উকিলের বাসায় লইয়া গেলেন। ঘরটী বেশ সাজান ও পুস্তকের বহু আলমারিতে পরিপূর্ণ। তথায় যাইবামাত্র ৩।৪টী ভদ্রলোক সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে বসিবার জন্য একখানি চেয়ার দিলেন। আমি তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মন্দিরের ফটোর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে T. K. Balasubrahmanya Aiyar, B. A. মহাশয় বলিলেন "You can get it at the Station." বাস্তবিকই তাঁহার কথামত আমি প্রত্যাগমনকালে ষ্টেশনে অনেক স্থানের প্রতিকৃতি পাইয়াছিলাম। এই বৎসর আমাদের দেশে স্বদেশীর তুমুল আন্দোলন; সেই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহারা আমাকে পাইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিলাম।

তৎপরে আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল স্থানেই শিবমন্দির; বিষ্ণুমন্দিরের সংখ্যা অল্প ইহার কারণ কি? তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন যে, এখানকার প্রায় সকলেই শৈব, কেবল শ্রীরামানুজাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করাতে অনেকে বৈষ্ণব হন; এবং তদবধি স্থানে স্থানে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; নচেৎ পূর্ব্বে সমস্তই শিবমন্দির ছিল। তখন আমি রামানুজাচার্য্য সম্বন্ধে দুই চারিটী প্রশ্ন করাতে তাঁহারা তাঁহার জীবনচরিত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্য চরিত।

ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ শ্রীরামানুজাচার্য্য খৃঃ ১০১৭ অব্দে চিঙ্গলপুত জেলার অন্তর্গত শ্রীপরম্বদুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কেশব সমাজী। তিনি হারিতাসা গোত্রোদ্ভব, যজুর্ব্বেদী এবং আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রাবলম্বী ছিলেন। তিনি ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত

নিজ পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করেন। তৎপরে পিতার মৃত্যু হইলে কাঞ্চীপুরে গমন করিয়া যাদবপ্রকাশ মিশ্রের নিকট বেদশিক্ষা সম্পন্ন করেন। তৎপরে শ্রীরঙ্গমে পুনরায় আসিয়া মহাপূর্ণাচার্য্যের নিকট বেদাঙ্গ পাঠ করেন। এই সময় চিঙ্গলপুত জেলার অন্তর্গত মধুরন্তক গ্রামে তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

রামানুজাচার্য্য বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন করিয়া তিরুপতিতে আসিয়া বেঙ্কট গিরিস্থ বিয়ৎগঙ্গা তীর্থের ধারে তপস্যা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি শ্রীরঙ্গমে ও কাঞ্চীপুরে আসিয়া বিগ্রহের পূজাপদ্ধতি সংস্কার পূর্ব্বক নিজ মত প্রচার করিয়া অনেককে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মহিসূরের অন্তর্গত মেলকোট নামক স্থানে বল্লাল নামা জৈন রাজার কন্যাকে ব্রহ্মদৈত্য পাইয়াছিল। তিনি অনেক যাগ যজ্ঞ ও চিকিৎসা করিয়াও স্বীয় কন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। তখন রাজা অতিশয় দুঃখিতচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীরামানুজাচার্য্য তথায় গমন করিয়া নিজ ব্রহ্মশক্তি দ্বারা ব্রহ্মদৈত্যকে দূর করিয়া দেন। ইহা দেখিয়া রাজা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ করেন। তদবধি রাজা ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ সকলেই জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তখন রামানুজাচার্য্য তথাকার জৈনমন্দির ভগ্ন করিয়া সেই স্থানে নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্যাপি সেই স্থান তেজনারায়ণপুর নামে অভিহিত। ইহা বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ, ও শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

রামানুজাচার্য্য যখন দেখিলেন তাঁহার মত অনেক স্থানে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন তিনি ভারতের অন্যান্য স্থানে আপন মত প্রচারের জন্য বহির্গত হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে তিরুপতি,*

* এই গ্রন্থের ১৯১ পৃষ্ঠায় তিরুপতির (বালাজীর) বিষয় দ্রষ্টব্য।

তৎপরে তথা হইতে মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বস্থানে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া গুজরাটে গির্ণার পর্ব্বতে দত্তাত্রেয়ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া দ্বারকায় গমন করেন। তথা হইতে মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে গমন করেন। হরিদ্বারে অবস্থান কালে তথা হইতে বদরিকাশ্রমে ও কাশ্মীরে শ্রীনগরস্থ শারদাপীঠে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তের সকল স্থানে গমন করিয়া সাগরদ্বীপে কপিলাশ্রমে যাইয়া সাগরসঙ্গমে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। তৎপরে তথা হইতে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেলার সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জীবনের অবশিষ্টকাল তথায় থাকিয়া ১২০ বৎসর বয়সে মোক্ষলাভ করেন। শ্রীরামানুজের ভক্তি ও ক্ষমতাপূর্ণ জীবনচরিত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ত্রিচিনাপল্লীর অপর নাম ত্রিশিরাপল্লী। পুরাকালে ত্রিশিরা নামে এক রাক্ষস এই স্থানের পর্ব্বত গুহায় বাস করিত, তখন ইহার চারিদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত রাক্ষসের ভয়ে তথায় কেহ যাইতে পারিত না। শেষে সুরবদিত্তান নামক একজন বীরপুরুষ ত্রিশিরা রাক্ষসকে বধ করেন। তদবধি উক্ত রাক্ষসের নামানুসারে ত্রিশিরাপল্লী নাম হইয়াছে। এক্ষণে ইংরাজেরা উক্ত নামের অপভ্রংশ ত্রিচিনাপল্লী আখ্যায় আনয়ন করিয়াছেন। বীরপুরুষ সুরবদিত্তান উক্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া আপন রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক রাজত্ব করেন। ইনি কাবেরী নদীর উত্তর তীরে সুব্রহ্মণ্য নামে অদ্যাপি পূজা পাইতেছেন।

খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পঞ্চ শতাব্দী হইতে চোল রাজগণ ত্রিচিনাপল্লীতে রাজত্ব করেন। তৎপরে কত হিন্দুরাজার হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া শেষে ইহা মুসলমানদের হস্তে পতিত হয়। মুসলমানগণের হস্ত হইতে ক্রমে ফরাসীদের হস্তে, শেষে ১৮০১ খৃঃ ৩১শে জুলাই তারিখে ইহা

ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। তদবধি ইহা তাঁহাদের দখলে আছে। ত্রিচিনাপল্লী ইংরাজদিগের অধিকৃত হইবার সময় হইতে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। চারিদিকে সুপ্রশস্ত রাস্তা ও রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি সারি রোপিত বৃক্ষ পথিকের আতপতাপ দূর করিতেছে।

এখানে জেলার জজ, কলেক্টর, মুন্‌সেফ্, ডাক্তার, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ অবস্থিতি করেন। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের প্রধান আঁফিস এক্ষণে এইস্থানে। ত্রিচিনাপল্লী দুইভাগে বিভক্ত। একটী ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট, অপরটী সহর; এই দুই স্থানেই ষ্টেশন আছে। আসিবার সময় আমরা ফোর্ট ষ্টেশনে উঠিয়াছিলাম। এখানকার চুরুট সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সকলকার মুখেই একটী করিয়া দেশী চুরুট দেখিলাম। এখানে তামাক পাওয়া যায় না। এমন কি, সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেই তামাকের প্রচলন নাই, সকলেই স্বদেশী চুরুটের ধূমপানে অভ্যস্ত। যাঁহারা তাম্রকূটসেবী তাঁহারা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে যেন তামাক সংগ্রহ করিয়া আসেন নচেৎ তাঁহাদের অদৃষ্টেও ঐ চুরুট।

ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট নামক স্থানে পূর্ব্বে দুর্গ ছিল, এক্ষণে তথায় আর প্রাচীন দুর্গ নাই। সহরের উত্তরে পাহাড় তাহার উপরে একটী শিব মন্দির আছে। শিখরদেশে উঠিবার পথের উপর চাঁদনি। তথায় স্ত্রীপুরুষের বহুসংখ্যক মূর্ত্তি আছে। মন্দিরে পার্ব্বতী, গণেশ ও স্কন্দের বিগ্রহ আছে। পর্ব্বদিনে ঐ সকল বিগ্রহকে মহা সমারোহে সহর প্রদক্ষিণ করান হয়। মন্দিরের সম্মুখে রৌপ্য মণ্ডিত একটি বৃহদাকার নন্দীকেশ্বর বৃষের মূর্ত্তি আছে। পর্ব্বতটী ২৩৬ ফিট উচ্চ, সহরের দক্ষিণে ১০০ ফিট উচ্চ স্বর্ণ পাহাড় (Golden Rock), ইহারই তলদেশে জেলখানা। নবাবের বাটীতে এক্ষণে আদালত ও আফিস হইতেছে। এখানকার জেলখানার ন্যায় বৃহৎ জেলখানা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে

নাই। ফোর্টের উত্তরে কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। তাহার নাম ফ্রেঞ্চ রকস্। কাবেরী নদীর পরই একটী খাল আছে। ঐ খালের অপর পারে সেরিঙ্গম দ্বীপ। ৩২টী খিলানের সেতু দ্বারা এই দ্বীপটী সংলগ্ন। ইহা ১৭ মাইল দীর্ঘ এবং ১½ মাইল বিস্তৃত। এখান হইতে আরও উত্তরে গমন করিলে কেবল মনোরম পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিচিনাপল্লী এক্ষণে বেশ সমৃদ্ধিশালী সহর। এখানকার ব্রাহ্মণগণ বড় নিষ্ঠাবান্ ও সৎস্বভাবাপন্ন। এখানে চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া আমরা সন্ধ্যার সময় জম্বুকেশ্বর দর্শন করিতে গমন করিলাম।

জম্বুকেশ্বর।

শ্রীরঙ্গম্ দর্শনাদি করিয়া ষ্টেশনে যাইবার পথে অপরাহ্নে আমরা জম্বুকেশ্বর দর্শন করি। ইহা শ্রীরঙ্গম হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এখানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম অপমূর্ত্তি বিরাজমান। এই মন্দিরটীও নিতান্ত ছোট নহে। মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম ; উচ্চ উচ্চ স্তম্ভ, ছাদ, মেজে, দেওয়াল প্রভৃতি সকল স্থানেই সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রস্তর সকল কর্ত্তিত হইতেছে ও চতুর্দ্দিকেই বংশদণ্ডের ভারা বাঁধা। তাহার মধ্য দিয়া মস্তক অবনত করিয়া কোন প্রকারে মূল মন্দিরে পৌঁছিলাম। মূল মন্দিরের বহির্ভাগে একটী ক্ষুদ্র কূপ হইতে সর্ব্বদাই অল্প অল্প জল উত্থিত হইতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে যথায় শিবলিঙ্গ অবস্থিত, সেইস্থান ও মন্দিরের মেজে কূপের জল অপেক্ষা এক ফুট নিম্ন। সুতরাং মন্দিরের মেজে সর্ব্বদাই জলমগ্ন রহিয়াছে। এইস্থানে আপনা আপনি জল উঠিতেছে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া পড়েন এবং অনেকেই ইহা বিশ্বাস করিয়া বলেন যে ভগবান্ জলরূপী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। কিন্তু এই কূপটী আর্টিজেন কূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাহা হউক আমরা এই জম্বুকেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া প্রীত হইলাম। আমরা দেব সন্নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র পূজারি মহাশয় তথায় আসিয়া দক্ষিণাদি গ্রহণ করিলেন। অপরাহ্ণ সময় বলিয়া তাঁহার আর অর্চ্চনাদি করা হইল না, কেবল দর্শন ও প্রণাম করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। মন্দির পার্শ্বে একটী পুরাতন জম্বুক বৃক্ষ আছে। ইহার তলদেশে ভগবান্ দেবাদিদেব তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম জম্বুকেশ্বর হইয়াছে। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী অতি উত্তম। ইহার ৪টী উচ্চ প্রাকার আছে। প্রথম প্রাকার দৈর্ঘ্যে ১২৩ ফিট এবং প্রস্থে ১২৬ ও ৩০ ফিট উচ্চ। দ্বিতীয় প্রাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থে ২০৬ × ১৯৭ এবং ৩৫ ফিট উচ্চ। ইহার প্রবেশদ্বারে ৬৫ ফিট উচ্চ গোপুর ও প্রাঙ্গণে কয়েকটী মণ্ডপ আছে। ৩য় প্রাকার ৭১৫ × ৬০০ ফিট ও ৩০ ফিট উচ্চ। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে ২টী দরজা আছে এবং দরজার উপরে উচ্চ গোপুর আছে। একটী ৭৩ ফিট অপরটী ১০০ ফিট উচ্চ। এই প্রাকারের প্রাঙ্গণে একটী পুষ্করিণী ও নারিকেলের বাগান আছে। ৪র্থ প্রাকারটী ২৪৩৬ ফিট দীর্ঘ এবং ১৪৯৩ ফিট প্রস্থ এবং ৩৫ ফিট উচ্চ। ইহার প্রাঙ্গণ মধ্যে সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ বিদ্যমান। স্তম্ভগুলির কয়েকটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন সর্ব্বসমেত ৯৩৮টী স্তম্ভ গণিয়া পাওয়া যায়।

পাঠক মহোদয়গণ, একবার মন্দিরের বিষয় চিন্তা করুন। কি অদ্ভুত ব্যাপার! কত অর্থ ব্যয়ে ও কত বৎসরে এই বিশাল ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা যদি সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানে আসিতাম তাহা হইলে মন্দিরের মহান্ ব্যাপার দেখিয়া একবারে আশ্চর্য্য হইয়া পড়িতাম। কিন্তু শ্রীরঙ্গমের মন্দির দেখাতে ততদূর আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। ত্রিচিনাপল্লীর শ্রীরঙ্গম ও জম্বুকেশ্বরের এই অদ্ভুত দুইটী মন্দির যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহার জীবন বৃথা।

এই মন্দিরের অনেক স্তম্ভে অনুশাসন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটীর তারিখ ১৪০০ শালিবাহন শক। সেই হিসাবে এই মন্দির ৪০০ বৎসর নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ডাক্তার ফারগুসন সাহেবের মতে ইহা ১৬০৩ খৃঃ হইয়াছে। কিন্তু ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ শ্রীরামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গমে বিষ্ণুপূজা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে কোন রাজগণ দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। আমাদের মতে ইহা আরও অধিক দিনের, কারণ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই স্থানে আসিয়া শ্রীরঙ্গমের পূজা করিয়াছিলেন এবং জম্বুকেশ্বরও দর্শন করিয়াছিলেন। মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে ভূসম্পত্তি আছে তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিয়া বাৎসরিক ৯০৫০ টাকা প্রদান করেন। মন্দিরের সম্মুখে কয়েকটী শীলকরা কলস আছে। যাত্রিগণ যথাসাধ্য তাহাতে দান করিয়া থাকে। সেই টাকা মন্দিরের পূজার কারণ ব্যয় হইয়া থাকে। অর্চ্চনার সময় যে দক্ষিণা দেওয়া হয় তাহা অর্চ্চকেরা লইয়া থাকেন। এই সকল দেশে পাণ্ডার কোন জুলুম নাই, যাহার যাহা ইচ্ছা দিতে পারেন। মন্দিরের বারাণ্ডায় রামায়ণের অনেক চিত্র দেখিয়া প্রীত হইলাম। যাহা হউক আমরা জলমগ্ন অপ্-মূর্ত্তি পার্ব্বতী-পতি জম্বুকেশ্বর মহাদেবকে দর্শনাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় সকলে ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট নামক ষ্টেশনে পৌছিলাম।

মেডুরা।

রাত্রি প্রায় ৮৷৷০ ঘটিকার সময় আমাদের গাড়ী ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া মেডুরাভিমুখে চলিল। গাড়ীতে বড়ই ভীড় সুতরাং একটুও শয়নের স্থান সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। চন্দ্রালোকের সাহায্যে প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

গুবাক নারিকেল ও সারি সারি তালবৃক্ষ ঐ স্থানের রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বংশগুল্ম ও আম্রকাননের ঘনচ্ছায়া নিবিড় অরণ্যের আকার ধারণ করিয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে চাষ করিবার বিস্তীর্ণ মাঠ, কোথাও বা দুচারিখানি পর্ণ কুটীর দৃষ্ট হইল। আমাদের চলন্ত ট্রেণের শব্দে সারমেয় জাতীয় পশু সকল পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপ দেখিতে দেখিতে রাত্রি ৩টার সময় আমরা মেডুরা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

মেডরা একটী জংসন ষ্টেশন। প্রধান লাইন বরাবর টিউটীকরিন গিয়াছে। আর একটী লাইন রামেশ্বর যাইবার জন্য পাম্বাম্ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহা ভাগৈ নদীর দক্ষিণ তীরে সংস্থাপিত। মেডুরাকে স্থানীয় লোকেরা মধুরাপুরী কহে। ইহা অতি সুন্দর সহর। সহরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও পথগুলি অতি প্রশস্ত। ষ্টেশনের সম্মুখেই একটী ছত্রবাটী আছে। ইহার নাম মঙ্গলমল ছত্রম্। রাত্রি ৩টার সময় ছত্রবাটী বন্ধ, সুতরাং ইহার মধ্যে আর স্থান পাইলাম না। বহির্দ্দেশে বারাণ্ডাযুক্ত লম্বা রক ছিল আমরা সেইস্থানে দ্রব্যাদি রাখিলাম। গাড়ীর কষ্টে ও অনিদ্রায় সকলে শীঘ্রই নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিলাম। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ছত্রবাটীর ভিতরে একটী কামরা দখল করিলাম। ইহার প্রত্যেক কামরা ৴০ বড় কামরা হইলে ८০ হিসাবে প্রতিদিন ভাড়া লাগে। দক্ষিণ দেশে যতগুলি ছত্রে বাসা লইয়াছিলাম, কিন্তু এই স্থান ছাড়া আর কোথাও ভাড়া লাগে নাই। এটী ষ্টেশনের ঠিক সম্মুখে এবং এক মিনিটের পথ বলিয়া সকলে এই স্থানেই বাসা লইয়া থাকে। এই বাসাতে একদল বাঙ্গালী যাত্রী দেখিলাম। এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মুখ দেখি নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল আমরা। এক্ষণে দেশের লোক দেখিয়া তাঁহার সহিত

আলাপ করিলাম। তাঁহারা সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া সিংহল ভ্রমণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা বেলা ১০টার গাড়ীতে কলিকাতা যাত্রা করিবেন; সুতরাং এই অল্প সময়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সিংহলের গল্প হইল। স্ত্রীপুরুষে তাঁহারা ৫জন মাত্র এবং বেশ অবস্থাপন্ন।

আমরা ছত্রবাটীর কামরাতে দ্রব্যাদি রাখিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলাম। প্রাঙ্গণে ২টী জলের কল আছে তাহাতে অনবরত জল পড়িতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই জলে স্নান কার্য্য সমাপন করিলাম। তৎপরে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া বাজার করিতে গমন করিলাম। বাজারে ফলমূল তরিতরকারি এবং কলাপাতা প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইতে দেখিলাম। মৎস্য বা মাংস বিক্রয় হইতে দেখিলাম না। এখানকার অধিবাসী প্রায় সকলেই নিরামিষ ভোজী। মুসলমান ও নিকৃষ্ট শ্রেণী হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র বাজারে মৎস্য বা মাংস বিক্রয় হয়। এখানে ন্যাসপাতি পয়সায় ২।৩টী করিয়া পাওয়া যায়। আমি ছত্রের সম্মুখে একটি ফলবিক্রয়কারিণীর নিকট হইতে ঠিক একটী ছোট বেলের মত বড় একটী ন্যাসপাতি ৫ এক পয়সা দিয়া ক্রয় করিলাম। সেটী সুন্দরেশ্বর দেবের পূজায় প্রদান করিয়াছিলাম। বাজার হইতে আহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী সমস্ত যোগাড় করিয়া বাসায় আসিলাম। বাসার নিকটেই কাষ্ঠ পাইলাম। কেবল কোথাও হাঁড়ী পাইলাম না। মহামুস্কিলে পড়িলাম, শেষে প্রায় এক মাইল পথ হাঁটিয়া একটী দোকানে হাঁড়ী মিলিল। এক আনা দিয়া একটী ছোট হাঁড়ী কিনিলাম। এদেশে পাই চলে, পয়সা একটু ঘসা হইলে কেহই লয় না। এখানে চতুর্দ্দিকে ছাঁচিপাণ বিক্রয় হইতেছে। দেশীপাণ আদৌ মিলে না। আমি হাঁড়ী ও পাণ লইয়া বাসায় রাখিয়া দেব দর্শনে চলিলাম।

এখানকার দেবতা সুন্দরেশ্বর স্বামী (শিবলিঙ্গ) ও মীনাক্ষী দেবী। এরূপ সুন্দর প্রাচীন ও প্রকাণ্ড মন্দির দক্ষিণ ভারতে আর নাই।

মথুরার গণেশ।

বৃহদায়তন এরূপ অদ্ভুত মন্দির জগতে আছে কিনা সন্দেহ। কি অদ্ভুত ব্যাপার! বাসা হইতে মন্দির প্রায় অর্দ্ধ মাইল। পথিমধ্যে একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণী দেখিলাম। তৎপরে মন্দির সম্মুখীন হইয়া দূর হইতে প্রকাণ্ড গোপুর দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। এই মন্দিরে ৯টী গোপুর আছে। তন্মধ্যে প্রধান গোপুর ১৫২ ফিট উচ্চ। দেবালয়ের প্রাকার উত্তর দক্ষিণে ৮৩৭ ফিট এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭৪৪ ফিট্। গোপুরের উচ্চ উচ্চ পুত্তলিকা ও নানাবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট স্তম্ভ ও বিগ্রহাদি দর্শন করিলে মনে হয় যেন কোন্ অজানা দেবলোকে উপনীত হইয়াছি। দাক্ষিণাত্যের এত গোপুর দেখিলাম, এত মন্দির দেখিলাম, কিন্তু এমন সুশ্রী ও বৃহৎ মন্দির আর কোথাও দেখি নাই। পাঠক একবার স্বচক্ষে এই মন্দির না দর্শন করিলে ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। গোপুরের ভিতর দিয়া বৃহৎ প্রাঙ্গণে উপনীত লইলাম, সমস্ত প্রাঙ্গণভূমি প্রস্তর-মণ্ডিত। তৎপরে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে বিঘ্ন বিনাশন গণেশজীর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি রহিয়াছে ইহার একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। তৎপরে সহস্র স্তম্ভমণ্ডপে আসিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলাম। কারুকার্য্য খচিত সিংহ ব্যাঘ্রাদির মূর্ত্তি বিশিষ্ট কি অপরূপ স্তম্ভ! কি অদ্ভুত ব্যাপার! কত অর্থ ব্যয়ে যে এই বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা চিন্তার অতীত। কথিত আছে রাজা তিরুমল নায়ক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মণ্ডপ দীর্ঘে ৩০০ ফিট্ এবং প্রস্থে ৬০ ফিট্। ইহার ছাদ ১২০টী প্রস্তর স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত। প্রত্যেক স্তম্ভ ২০ ফিট্ উচ্চ ও চারি সার করিয়া সজ্জীকৃত। ইহার মধ্যে জল প্রবাহিত হইবার পয়ঃপ্রণালী আছে।

সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপের 'পর বসন্ত-মণ্ডপ, ইহাতেও পয়ঃপ্রণালী আছে। এই মণ্ডপে সুন্দরলিঙ্গ দেবের বসন্ত-উৎসব হইয়া থাকে।

ইহা বৈশাখী শুক্ল পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একাদশ দিন ব্যাপিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানকার লোকের মনে ধারণা এই যে, পৌর্ণমাসীতে সুন্দরলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে সম্বৎসর অর্চ্চনার ফললাভ হয়। সেই সময় ৩০।৪০ হাজার লোক একত্র সমবেত হইয়া থাকে। উৎসবের সময় উক্ত পয়ঃপ্রণালী জলে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। বসন্ত-উৎসব মণ্ডপের স্তম্ভে দশ প্রকার মনুষ্য মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। এই মণ্ডপ দুইটী দর্শন করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া একটী পুষ্করিণী দেখিলাম। ইহার নাম শিবগঙ্গে তীর্থ। ইহার চতুর্দ্দিক্ প্রস্তর দ্বারা বাঁধান, কেহ কেহ ইহাকে (Lily Tank) পদ্ম পুষ্করিণী কহে। ইহার পর আমরা সুন্দরলিঙ্গের মন্দির সম্মুখীন হইলাম। কি সুন্দর লিঙ্গ-মূর্ত্তি! দেখিলে মন প্রাণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। বেশকারী পুরোহিতগণ ভগবান্‌কে বিভূতি ও চন্দনাদি দ্বারা সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দেবতার সম্মুখে প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে স্বর্ণ স্তম্ভ বা সোণার তাল গাছ, (flag staff) রহিয়াছে। পূজারীদের যাত্রিগণের উপর কোনরূপ জুলুম নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা পূজা দিতেছে, তাহাতে কোনরূপ আপত্তি নাই। একটী ফল ও দুই আনামাত্র পয়সা দিতেই আমার নামে সংকল্প পূর্ব্বক পূজা করিয়া পূজারী মহাশয় দেবতার কর্পূরারতি করিলেন। প্রজ্বলিত দীপালোকে সুন্দরেশ্বর স্বামীর সুন্দর লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম। প্রণামান্তে কিঞ্চিৎ প্রসাদ ও চরণামৃত পান করিয়া তথা হইতে মীনাক্ষী দেবী দর্শন করিতে অগ্রসর হইলাম। সুন্দরলিঙ্গের পার্শ্বে অন্য প্রকোষ্ঠে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির। ইনি সুন্দরলিঙ্গের দেবীমূর্ত্তি। রামেশ্বরী দেবী যেরূপ দেখিতে এই দেবীমূর্ত্তিও দেখিতে প্রায় তদ্রূপ। (রামেশ্বরী দেবীর চিত্র দেখুন)। মীনাক্ষী দেবীর গাত্র নানাবিধ হীরা-মুক্তা-জড়িত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। দেবীর সম্মুখেও সোণার তাল গাছ (Golden flag staff) বিদ্যমান

আছে। মন্দিরের মধ্যে অনেক স্থানে লৌহ গরাদেযুক্ত কপাট নয়শত করিয়া লোহার প্রদীপ আঁটা আছে। তাহা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় প্রজ্বলিত করা হয়, তখন মন্দিরের কি অপরূপ শোভাই হয়। মীনাক্ষী দেবীর (পার্ব্বতীর) মন্দিরের চূড়া সমস্ত স্বর্ণমণ্ডিত। সূর্য্য কিরণে ইহা চক্ চক্ করিতে থাকে। মন্দিরে মান্দ্রাজী বাজনা বাজিতেছিল। আমরা যখন অর্চ্চনা করিতে লাগিলাম তখন কর্পূরারতি হইতে লাগিল· এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকরগণ নৃত্য করিতে করিতে বাজাইতে লাগিল। আমরা যৎকিঞ্চিৎ প্রণামি দিয়া এবং বাদ্যকরগণকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

দেবদেবী দর্শন করিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতে করিতে একটী রৌপ্য নির্ম্মিত প্রকাণ্ড হস্তী দেখিলাম। তাহার দন্ত, চক্ষু ও প্রত্যেক সংযোগস্থল স্বর্ণ বিজড়িত। দেবতার সুন্দর রথ ও নানা প্রকার যান ও বাহনাদি আছে। সোণায় মোড়া দুইখানি পাল্কীর মূল্য ২০০০০৲ টাকা। ছত্র ২টীর মূল্য ২৪০০০৲ টাকা; এতদ্ভিন্ন রৌপ্য হংস ও নন্দী এবং নানাবিধ বহুমূল্য আভরণ আছে। দেবালয়ের বাসন ও অলঙ্কারাদি দেখিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইলাম। বাসনের মূল্য ৫০০০০৲ হাজার টাকা এবং মণি মুক্তার অলঙ্কারের মূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা হইবে। মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতে করিতে দেবতার ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে পুলকিত প্রাণে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। শুনিতে পাই মেডুরার মন্দির ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কোন লাট সাহেব বলিয়াছিলেন, যে জাহাজ জাহাজ ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেলেও ভারত কখন দীনহীন হইবে না। সুন্দরলিঙ্গ ও মীনাক্ষী দেবী দর্শন করিলাম কিন্তু পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে এই দেবতার কিঞ্চিৎ পৌরাণিক বিবরণ দিব। বিশেষ ইনি অতি প্রাচীন দেবতা, স্থলপুরাণের মতে যখন অযোধ্যাধিপতি

শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত লঙ্কা গমন করেন, তখন পথে অগস্ত্য মুনির আদেশানুসারে মধুরাপুরীর সুন্দর দেবের আরাধনা ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; সুতরাং ইনি ত্রেতাযুগেরও প্রাচীন। ইঁহার উৎপত্তি বিষয় স্থলপুরাণে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

ত্রেতাযুগে এক দিবস ইন্দ্রালয়ে স্বর্গ-বেশ্যাগণ নৃত্য করিতেছিল, ইন্দ্রদেব এমন মনোনিবেশ পূর্ব্বক নৃত্য দেখিতেছিলেন যে দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় আসিলে তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। ইহাতে বৃহস্পতি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া দেবসভা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক নিজ গুরুত্ব পদ ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ বনগমন করিলেন। ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত পরে অবগত হইয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট সমস্ত বিষয় জানাইলেন। ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে ইন্দ্র ত্রিশিরাকে গুরুত্বে বরণ করেন। তৎপরে ইন্দ্রদেব বৃহস্পতির অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। ত্রিশিরা ত্বষ্টার পুত্র কিন্তু দৈত্যকুলের দৌহিত্র। দেবগুরুত্ব পদ পাইয়া যজ্ঞে আহুতি দিবার সময় প্রকাশ্যে দেবতাদিগের এবং গোপনে আপন মাতামহ কুলের শুভ কামনা করিতেছিলেন। দেবরাজ ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। ত্রিশিরা দ্বিজ ছিলেন, সুতরাং ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইলেন। পরে দেবতাদিগের সাহায্যে ঐ পাপকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া উদ্ভিদ, স্ত্রী, জল ও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। সেই অবধি উদ্ভিদ হইতে নির্য্যাস, স্ত্রী হইতে রজ, জল হইতে ফেন ও পৃথিবী হইতে ক্ষার (সাজিমাটী) উৎপন্ন হইল।

এদিকে ত্বষ্টা পুত্র নিধনে দুঃখিত হইয়া বলিষ্ঠ পুত্র লাভের উদ্দেশে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। সেই যজ্ঞ প্রভাবে বৃত্র নামে অসীম পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করিলেন। ক্রমে বৃত্র ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া

স্বর্গের রাজা হইলেন। ইন্দ্র তখন অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্রায়ুধ নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রকে সংহার কর। তখন ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রকে সংহার করিলেন। বৃত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয়বার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইল। ক্রমশঃ সেই পাপ হেতু ইন্দ্র অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। শেষে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে আসিয়া পদ্ম কর্ণিকার মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। শাসনকর্ত্তা অভাবে স্বর্গে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল। তখন অন্যান্য দেবগণ বৃহস্পতির শরণাগত হইয়া সকলে মিলিয়া ইন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শেষে বৃহস্পতি তাঁহাকে পদ্মবনে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পাপক্ষয়ের জন্য বলিলেন, "বৎস ইন্দ্র, তুমি ভূলোকে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া দেব দর্শন কর, তাহা হইলে তোমার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইবে। তখন ইন্দ্র সমস্ত তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া এই মেড়ুরাতে আসিয়া কল্যাণপুরের নিকট কদম্ববনে উপস্থিত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। ইন্দ্র ইহার কারণ অবগত হইবার জন্য চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিতে করিতে এক অনাদিলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা উক্ত লিঙ্গের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। বৃহস্পতি দ্বারা তাঁহার অভিষেকাদি করিয়া লিঙ্গের নাম সুন্দর রাখিলেন।

ইন্দ্রের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া সুন্দরলিঙ্গ প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, স্বর্গে অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছে, তুমি তথায় সত্বর গমন কর। আমার পূজা করিবার জন্য তোমাকে এখানে থাকিতে হইবে না। বৎসরান্তে বৈশাখী পূর্ণিমাতে এখানে আসিয়া আমার পূজা করিলেই সম্বৎসরের পূজার ফললাভ হইবে। তখন

ইন্দ্র সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনেক বৎসর পরে কল্যাণপুরের রাজা কুলশেখর পাণ্ড্য স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া সুন্দরলিঙ্গের বিষয় জানিতে পারেন। শেষে তিনি জঙ্গল কাটাইয়া তথায় রাজধানী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবালয়ের সংস্কার করিলেন, এবং কাশী হইতে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ আনাইয়া সুন্দরলিঙ্গের পূজার নিয়ম করিয়া দিলেন। রাজধানীর নাম কি রাখিবেন রাজা মনে মনে ভাবিতেছেন এমন সময় মহাদেব প্রত্যক্ষ হইয়া আপন মস্তকস্থিত অমৃত ছড়াইতে লাগিলেন, তজ্জন্য রাজধানীর নাম মধুরাপুরী হইল। এইরূপে রাজা কুলশেখর কর্ত্তৃক সুন্দরলিঙ্গের পূজা মর্ত্ত্যলোকে প্রচার হইল। বহু রাজার রাজত্বের পর ১৬২৩ খৃঃ শ্রী তিরুমল সেবারি নায়নি আয়ালু গারু রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ত্রিচিনাপল্লী হইতে মেডুরায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া আসেন। তিনি বহুদিবস হইতে কাশরোগে কষ্ট পাইতে ছিলেন। রাজবৈদ্যেরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও রোগ আরোগ্য করিতে পারিলেন না, ক্রমে পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে একদিন রাত্রিকালে সুন্দরেশ্বর দেব ও মীনাক্ষী দেবী স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হইয়া আদেশ করিলেন,—"তিনি যদি ত্রিচিনাপল্লী হইতে মেডুরায় অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি কঠিন পীড়া কাশরোগ হইতে অব্যাহতি পাইবেন।" স্বপ্ন দেখিয়াই রাজা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তথায় বাস করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং মন্দির নির্ম্মাণ করণার্থ এককোটী টাকা ব্যয় করিবেন স্বীকার করিলেন।

অনন্তর রাজা দেবালয় নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নানা দেশ হইতে কার্য্যদক্ষ শিল্পিগণ আনাইয়া সুন্দরলিঙ্গের দেবালয়ের বহির্দ্দেশ ও মীনাক্ষী দেবীর মন্দির নূতন করিয়া গঠন করিতে লাগিলেন। রাজধানী, রাজপথ প্রভৃতি নব নব রূপে পরিশোভিত

হইল। ইষ্টক ও প্রস্তরের বৃহৎ বৃহৎ রাজভবন নির্ম্মিত হইল। সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষী দেবীর অলঙ্কার মূল্যবান্ হীরামুক্তার দ্বারা প্রস্তুত হইল। হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বৃহৎ রথ, পাল্কী প্রভৃতি নানাবিধ যানাদি প্রস্তুত করাইয়া দেবালয়ের শোভা পরিবর্দ্ধিত হইল। এতদ্ভিন্ন রাজা অনেকগুলি ছত্রবাটী নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অনেক পুণ্য কর্ম্ম করেন। এই সমস্ত কারণে তিনি কাশরোগ হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থশরীরে ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আমরা দেবালয় দর্শন করিয়া তিরুমল নায়কের রাজভবন দেখিতে গমন করি। দেবালয় হইতে রাজভবন প্রায় এক মাইল। রাজভবনটী অতি সুন্দর ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভদ্বারা পরিশোভিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর রাজবাটী নাই, ইংরাজ বাহাদুর ঐ বাটী সেসন্ জজের আদালতরূপে পরিণত করিয়াছেন। এই ভবনটী দুই অংশে বিভক্ত এবং দেখিবার উপযুক্ত। রাজভবন ব্যতীত মেডুরাতে আর একটী দেখিবার জিনিষ আছে তাহা তেপ্পনকুলম্ নামক বৃহৎ পুষ্করিণী। ইহা রাজভবন হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা সমচতুষ্কোণ, প্রত্যেক দিক্ ১২০০ গজ লম্বা। চতুর্দ্দিক্ উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তরের সোপান দ্বারা পরিশোভিত। এই সরোবরকে স্বর্ণপুষ্প পুষ্করিণী বা পত্রমরাই কহে। ইহার চারিদিকে খিলান করা পথ। উত্তরদিকে বারটি ওজোব্যঞ্জক মূর্ত্তি এই খিলানের থামের কার্য্য করিতেছে। উহার ৫টী পঞ্চ পাণ্ডবের ও ৭টী জলি নামক দৈত্যের মূর্ত্তি। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটী উপদ্বীপ আছে। সেই উপদ্বীপের চতুর্দ্দিক্ প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। মধ্যস্থলে দ্বিমহল দেবালয় ও চারিকোণে চারিটী ছোট ছোট মন্দির। মন্দির চারিটীর গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর এবং কারুকার্য্যবিশিষ্ট। মধ্যস্থলে রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ লতা পুষ্পের দ্বারা সুসজ্জিত ও পরিশোভিত। এই পুষ্করিণীতে সুন্দরলিঙ্গ ও মীনাক্ষী

দেবীর উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের সময় পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে একলক্ষ বাতি দেওয়া হয়। তখন আলোকের ছায়া জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া কি অপরূপ শোভাই ধারণ করে। সেই সময় দেবদেবীর ভোগমূর্ত্তিকে তেপ্পনের (এক প্রকার কাষ্ঠনৌকা) উপর চড়াইয়া পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করান হয়। হ্রদের মত বৃহদায়তন এই তেপ্পনকুলম্ সরোবর যথার্থই একটী দেখিবার জিনিষ।

মেড়ুরার মন্দিরের পার্শ্বে একটী বাজার আছে, সেটিও একটী দেখিবার জিনিষ। ইহাকে মার্কেট (Market) বলে। প্রথমে প্রবেশ দ্বারের উপর একটী গোপুর আছে। তাহাও কারুকার্য্য বিশিষ্ট ও দেখিতে অতি সুন্দর। এই বাজার নানাবিধ পিত্তল কাঁসার জিনিষ ও মাদ্রাজি ধরণের কত প্রকার কাপড়, জরির কাজ করা চাদর, নানা স্থানের ছবি ও মনোহারি দ্রব্যে পূর্ণ। মেড়ুরায় স্ক্রুপ পেঁচ দেওয়া ছোট গেলাস ও ঢাকনি যুক্ত এক প্রকার ঘটী পাওয়া যায় তাহা অতি উত্তম। দেখিতে অনেকটা কমণ্ডলুর মত অথচ নল নাই। এ জিনিষ এই স্থান ছাড়া অন্য কোথাও দেখিলাম না। আমি ২॥• টাকা দিয়া ২টী ঐরূপ ঘটী খরিদ করিলাম। মন্দির ও দুই এক স্থানের ফটোও এই স্থান হইতে খরিদ করিলাম। এই স্থানের লোক বড় কাফি ও লেমনেড পান করে। এক পয়সায় সাধারণ এবং দুই পয়সায় উত্তম লেমনেড চতুর্দ্দিকেই বিক্রয় হইতেছে। রাস্তা বেশ প্রশস্ত কিন্তু পয়ঃ প্রণালীর বন্দোবস্ত না থাকায় বড়ই দুর্গন্ধযুক্ত। অধিবাসিগণ কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকে বেণী, কর্ণে ছিদ্র করিয়া তাহাতে হীরক মণ্ডিত আভরণ, স্বদেশী কাপড়, জরিপেড়ে চাদরে অঙ্গ আচ্ছাদিত, মুখে দেশী চুরট, চরণে পাদুকা নাই এবং সর্ব্বাঙ্গ চন্দন ও বিভূতি ভূষিত। স্ত্রীলোকদের কর্ণ-ছিদ্র এত বড় যেন মনে হয় গোলাকার গর্ত্ত দুটী এখনই কাটিয়া যাইবে। তাহারা কাঁচুলি ব্যবহার করে। এদেশে

মেডুরার মন্দির। (পৃঃ ২৫২)

একটী আশ্চর্য্য দেখিলাম কোথাও বিলাতী কাপড় নাই। জরিপেড়ে কাপড় ও চাদর বড় সস্তা, আমি এক জোড়া চাদর ৩৷৷৹ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলাম।

মেডুরা এক্ষণে জেলার প্রধান নগর। এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট্ কালেক্টর সেসন জজ মুন্সেফ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মেডিকেল অফিসার প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী আছেন। নগরটী বহু প্রজা বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী। এখানকার নূতন জেলখানা, হাঁসপাতাল, জেলার স্কুল, মিসন বোর্ডিং স্কুল প্রভৃতি দেখিবার উপযুক্ত। এখানকার ভাষা তামিল, ইংরাজী ভাষা এক্ষণে অনেকেই শিখিয়াছেন। এখানকার জলবায়ু শুষ্ক, উষ্ণ ও সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। শীত ঋতু নাই বলিলেও চলে, এমন কি পৌষ মাসে লংক্লথের কামিজ ব্যবহার অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। বর্ষা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ সময়ে সময়ে অতিশয় জ্বর হয়। এই জন্য মেডুরা স্বাস্থ্যকর স্থান নহে। অধিবাসীর মধ্যে একজনকেও সুন্দর দেখিলাম না, সকলেই কৃষ্ণবর্ণ। স্থানীয় লোকেরা বলে মেডুরার সমস্ত স্থান দেখিতে প্রায় ৭দিন লাগে। আমরা সেতুবন্ধ যাইবার পূর্ব্বে ও পরে দুইবারই এই স্থানে অবতরণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বস্থান দর্শন করি। যাহা হউক মেডুরার মন্দির ও তাহার আভ্যন্তরীণ মূর্ত্তি সকলের নির্ম্মাণ কৌশল ও সৌন্দর্য্য যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহার জীবন বৃথা। এখনও চক্ষের উপর সেই অপরূপ শোভা যেন নৃত্য করিতেছে। আহা কি সুন্দর !

চতুর্থ অধ্যায়।

রামেশ্বর।

আমরা বাসা হইতে বেলা ১০টার সময় নিষ্ক্রান্ত হইয়া রামেশ্বর যাইবার জন্য মেডুরা ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। সেদিন রাত্রে ষ্টেশনটী ভাল করিয়া দেখি নাই, সুতরাং অদ্য দিবালোকে সুন্দররূপে দেখিলাম। জংসন ষ্টেশন বলিয়া ইহা খুব প্রশস্ত ও বড় ষ্টেশন। রামেশ্বর যাইবার জন্য বাষ্পীয় যান অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা সকলে একটী কামরা অধিকার করিয়া বসিলাম। বেলা ১১॥টার সময় গাড়ী ছাড়িল। এই লাইনটীর নাম Pamban Branch Line. পূর্ব্বে যখন এই লাইনটী হয় নাই, তখন যাত্রীদিগকে এইস্থান হইতে গোযানে করিয়া ৫।৬ দিবসে রামেশ্বরে পৌঁছিতে হইত। পথে দস্যু তস্করেরও ভয় ছিল। তজ্জন্ত এই দুষ্কর তীর্থে যাত্রী খুব অল্প হইত। এখন লৌহ-বর্ত্ম হওয়ায় গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সুতরাং যাত্রীর সংখ্যা এক্ষণে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমাদের গাড়ী দুই চারিটি ষ্টেশন অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, কোন কোন স্থানে পর্ব্বতপুঞ্জ, কোথাও বা বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এই সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আমরাও চলিতে লাগিলাম। গিরিরাজি-ভূষিত তীরভূমি, কোথাও বা নবদূর্ব্বাদল শ্যামকান্তি ধারণ করিয়া, কোথাও বা বিচিত্র গুল্মপাদপাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া, আমাদের নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বাষ্পীয় যান সুঠাম বঙ্কিমভাবে চলিতে চলিতে বেলা ৩টার সময় রামানাদ নামক একটী বড় ষ্টেশনে উপনীত হইল। এইস্থানে গাড়ী ১০ মিনিট অপেক্ষা

করিল। সেই সময়ে চতুর্দ্দিক্ হইতে বিক্রেতারা লেমনেড, কাফি, পাঁউরুটী, কদলী প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিল। কিন্তু আমাদের দেশের মত ঘৃতপক্ক কোন খাবার বিক্রয় করিতে কেহই আসিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে কেবল দুগ্ধ বিক্রয় করিতে দেখিলাম। আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল কিন্তু কোন খাবার না পাওয়াতে শুষ্ক বদনেই গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িল, নানাবিধ অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বেলা ৪৷৷০টার সময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী মাণ্ডাপম্ নামক সুন্দর ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। এই স্থানেই ভারতবর্ষের শেষ ষ্টেশন বা লৌহবর্ত্মের সমাপ্তি হইল।

মাণ্ডাপমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এতই মনোহর যে কিয়ৎক্ষণের জন্য সকলকেই আত্মহারা হইতে হয়। একদিকে ভারতের তীরভূমি, অন্যদিকে বিস্তীর্ণ নীলাম্বুরাশি, প্রকৃতির সে সুন্দর বিলাসভূমি যথার্থই অমরবাঞ্ছিত। আমাদের গাড়ী মাণ্ডাপমের প্লাটফরমে অল্পক্ষণের জন্য আসিয়া আবার পশ্চাৎ হটিয়া অন্যপথে সাগর কূলের দিকে যাইল। আমরা তথায় অবতরণ করিয়া একটী ছোট বাষ্পীয় যানে চড়িলাম। ক্ষুদ্র ষ্টিমারখানি যাত্রী লইবার জন্য সাগরে অপেক্ষা করিতেছিল। যথাসময়ে ষ্টিমারখানি উপকূল পরিত্যাগ করিয়া সাগরবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে পাম্বান্ বা রামেশ্বরম্ নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপাভিমুখে চলিল। এই সমুদ্রই পক্ প্রণালী নামে অভিহিত।

রামেশ্বর দ্বীপ এখান হইতে দেড় মাইল। এখানকার জলের একটু বিচিত্রতা আছে। নির্ম্মল নীলাভ জল এত স্বচ্ছ যে দশ বার হাত বা ততোধিক গভীর জলস্থিত মৎস্যের পাখনা গোণা যায়। একটী দুয়ানি বা সিকি পড়িলেও তাহা ষ্টিমারের উপর হইতে দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ সমুদ্রে তরঙ্গ নাই। যেন স্থির ধীর ও গম্ভীর মূর্ত্তিতে রত্নাকর প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া আছেন। তরঙ্গ

না হইবার কারণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অসাধ্যসাধন সেতুবন্ধ। ষ্টিমার হইতেই সেতুর দৈর্ঘ্য অবলোকন করা যায়। সেতুর দক্ষিণভাগে সমুদ্র স্থির ও ধীর, কিন্তু উত্তরে কি অদ্ভুত উচ্চ তরঙ্গ, কি ঘাত প্রতিঘাতের শব্দ! মনে হইতে লাগিল যেন সমুদ্রদেব সেতু ভঙ্গ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু বিফল মনোরথে পশ্চাৎপদ হইতেছেন। ষ্টিমারে বসিয়া বসিয়া দিবালোকে সেতুটী বেশ সুন্দরভাবে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সেতুটী দেখিতে যেন জলের উপর একটী লম্বা প্রস্তর রেখা বরাবর চলিয়া গিয়াছে। কোন স্থান জলের উপর জাগিয়া আছে, আবার খানিকটা বা জলে ডুবিয়া আছে। ইহার চতুর্দ্দিকেই জলরাশি, কেবল গোলাকার বৃত্তরেখা অনন্ত আকাশের সঙ্গে অনন্ত জলরাশির সহিত মিশিয়াছে। কোথাও কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। কেবল নীল জলরাশির সহিত নীলাকাশের অপূর্ব্ব মিলন। আহা কি শোভা! এ অপরূপ শোভার উপমা নাই। কোথাও কিছুই নাই কেবল ষ্টিমারখানি ভাসিতে ভাসিতে চলিতেছে। এমন সময় ভাবের উচ্ছ্বাসে একজন গায়ক গাহিলেন :—

"কর পার হরি এবার,
তুফান ভারি দরিয়ায়।
না হেরি কুল কিনারা
জল দেখে যে প্রাণ শুকায়॥
তরঙ্গ রঙ্গ করে, আতঙ্কে প্রাণ শিহরে,
বুঝি প্রচণ্ড সমীরে তরণী ডুবায়,
এস হরি, দয়াল ঠাকুর,
রক্ষা কর হ'তে এ দায়॥"

ষ্টিমারে আমাদের প্রায় ১ ঘণ্টা থাকিতে হইয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা পাম্বান্ দ্বীপে পৌঁছিলাম। ষ্টিমার ঘাটে পৌঁছিবামাত্র

বাদেশ্বরের রাস্তা।

(পৃঃ ২৫৭)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি নৌকা আসিয়া আমাদের তীরে পৌঁছাইয়া দিল। নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিবার সময় সমুদ্র সলিলে কণ প্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ দেখিয়া মনে সাতিশয় আনন্দ হইতে লাগিল। কুজভেটকি এবং ঐ জাতীয় নানাবিধ মৎস্য কেমন মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছে। ঐ দেশীয় কতকগুলি মুসলমান কুলী আসিয়া আমাদের মোট ঘাট লইয়া ষ্টেশনে চলিল। আমরাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে চলিলাম।

প্রসিদ্ধ রামেশ্বর মন্দির এই ক্ষুদ্র পাম্বান্ দ্বীপে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪ মাইল ও প্রস্থে ৬ মাইল। তীর হইতে মন্দির প্রায় ৫ মাইল। এই ৫ মাইলের জন্য পুনরায় রেল হইয়াছে। শুনিলাম সেই মাস হইতে এই নূতন রেল চলিতেছে। যখন রেল হয় নাই তখন গো-যানে বা পদব্রজে এই পথটুকু অতিক্রম করিতে হইত। এখন আর কোন কষ্ট নাই। হাওড়ায় গাড়ীতে উপবেশন কর, আর একেবারে রামেশ্বর দেবের মন্দির সন্নিধানে অবতীর্ণ হও। এমন সুবিধা আর কি হইতে পারে! ধন্য ইংরাজ—তোমার কৃপায় আজ সমস্ত তীর্থ, বাড়ীর সন্নিকটে। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, কলিতে সমস্ত তীর্থ নিকটে হইবে। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল রেল বিস্তার। কুলীগণ গাড়ীর একটী কামরায় আমাদের মোট লইয়া ফেলিল। আমরা ৵০ হিঃ সকলকার টিকিট ক্রয় করিয়া বসিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গাড়ী ছাড়িল। মধ্যে একটী ষ্টেশনে আসিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশন রামেশ্বরমে প্রায় রাত্রি ৮ টার সময় পৌঁছিল।

আমরা ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইয়া একটী মাঠে পড়িলাম। সেই মাঠটী পার হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী বড় রাস্তা পাইলাম। এই রাস্তাটী পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। ইহা বরাবর মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার একটি চিত্র প্রদত্ত হইল। চিত্রস্থিত ঐ হস্তীটী

প্রভু রামেশ্বর দেবের। মন্দির সন্নিকটে একটী গলির ভিতর বাসাবাটী নিরূপিত হইল। আমরা বাসায় দ্রব্যাদি রাখিয়া ধূলাপায়ে সেই রাত্রেই দেবদর্শনে গমন করিলাম। প্রথমেই উচ্চ গোপুর সন্নিধানে উপনীত হইয়া রামেশ্বর দেবকে দূর হইতে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। একটী প্রকাণ্ড ইলেকট্রিক লাইট দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে ছিল। এতদূরে ও এমন স্থানে এই আলো দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সেই বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে আমরা মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বরাবর যাইতে লাগিলাম। তৎপরে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ঘুরিয়া শেষে মূল মন্দিরে পৌঁছিলাম। নাটমন্দির হইতে প্রভু রামেশ্বর দেবকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। আজ বহুদিবসের আশা পূর্ণ হইল। এত কষ্ট এত পরিশ্রম করিয়া যে ভগবানের দর্শন পাইলাম সেই আনন্দে সকলের চক্ষেই প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। আমার জ্যেষ্ঠমাতা ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী আনন্দে বলিতে লাগিলেন, আজ আমাদের জীবন সার্থক হইল, দেহ ও মন পবিত্র হইল, আজ তোমার কৃপায় ভগবান্ দর্শন হইল; নচেৎ এজন্মে আর হইত না।

রামেশ্বরে অনেকঘর পাণ্ডা আছে। তন্মধ্যে গঙ্গাধর পীতাম্বর প্রধান ও বিখ্যাত ব্যক্তি। ইঁহার ৬০ জন গোমস্তা। ইহারা ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে হরিরাম নামক জনৈক গোমস্তা আমাদের বেজওয়াড়ার নিকট হইতে সঙ্গ লইয়াছিল। মেডুরা হইতে তাহার সঙ্গ কিছু ঘনীভূত হয়। ষ্টিমার পার হইয়া যখন রেলে উঠি, তখন এই হরিরাম পাণ্ডাই আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া রামেশ্বরম্ ষ্টেশনে নামাইয়া বাসা প্রদান ও দেবদর্শন করিতে লইয়া যায়। আমরা দেব দর্শন করিয়া যখন বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করি তখন প্রধান পাণ্ডা গঙ্গাধর পীতাম্বর ঠাকুর আসিলেন, আমরা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদের সকল বন্দোবস্ত

করিয়া দিলেন। ইনি অল্প অল্প ইংরাজী ভাষা ও হিন্দী বুঝেন, তজ্জন্য তাঁহার সহিত বাক্যালাপে কোন কষ্ট হয় নাই। তিনি বিদায় গ্রহণ করিলে বাসার অনতিদূরে একখানি খাবারের দোকান ছিল, আমরা সেই দোকান হইতে লুচি ভাজাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। খাবার-ওয়ালার সঙ্গে আলাপ করিলাম। ইনি পশ্চিম দেশায় ব্রাহ্মণ। প্রায় দশ বৎসর হইল এই স্থানে আসিয়া দোকান করিয়া আছেন। বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া অবধি স্বদেশবাসীর মুখাবলোকন করিতে পাই নাই এবং ঘৃতপক্ক দ্রব্যের দোকানও দেখি নাই, সুতরাং এই সুদূর রামেশ্বর দ্বীপে একজন পশ্চিমবাসী ব্রাহ্মণকে পাইয়া তাঁহার সহিত দুটা হিন্দী কথা কহিয়াও যেন প্রাণ জুড়াইল। ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিতেছিল, বহুদিবস পরে কলিকাতার মত খাবার পাইয়া বড়ই উপাদেয় লাগিল। আমরা দিবসত্রয় রামেশ্বরে ছিলাম। এই তিন দিনই রাত্রে উঁহার দোকানের খাবার খাইয়া নিশা অতিবাহিত করিতাম। বাসায় আসিয়া অন্যকার মত সকলে বিশ্রাম করিলাম।

রজনী প্রভাত হইলে, প্রভাকরের প্রভায় দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইল, পক্ষিগণ কলরব করিয়া উঠিল; তখন আমরাও ব্রহ্মা মুরারি বলিতে বলিতে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলাম। হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া ক্ষুদ্র দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবার নিমিত্ত বাসা হইতে বহির্গত হইলাম। হরিরাম গোমস্তা পাণ্ডাও আসিয়া জুটিল। প্রথমে রাস্তা ও উভয় পার্শ্বস্থ বিপণীশ্রেণী দেখিতে দেখিতে আমরা কূলে উপনীত হইলাম। এই সমুদ্রই পক প্রণালী, ইহা দেখিতে কি সুন্দর! একদিকে ভারত মহাসাগর অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর, আর মধ্যে এই প্রণালী; অতি দূরে সেতুর রেখা দৃষ্ট হইতেছে। এই দুরন্ত সমুদ্র যে কিরূপে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বন্ধন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়। ভগবান্ ভিন্ন একার্য্য কখনও মনুষ্যের

সম্ভবপর নহে। শুনিতেছি এখন ইংরাজ বাহাদুর এই সেতুর উপর দিয়া রেল বসাইবেন। তাহা হইলে সিংহল ভ্রমণ অতি সুবিধাজনক হইবে। যাহা হউক পাম্বানকূলে দণ্ডায়মান হইয়া যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর তরঙ্গায়িত নীল সলিল ফেনিল হইয়া পবনের সঙ্গে যেন অনবরত নৃত্য করিতেছে দেখিলাম। কিন্তু এখানকার শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ ঝম্প ও গর্জ্জন, শ্রীক্ষেত্রের তরঙ্গের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। সমুদ্র এখানে বন্ধন দশায় পড়িয়াছেন সুতরাং আর তাঁহার আস্ফালন নাই, কাজেই স্থির ও ধীর হইয়া আছেন। শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ ভীষণ গর্জ্জন ও ভয়াবহ তরঙ্গ, এখানে তদ্রূপ নহে। ষ্টিমারে উঠিবার কালে পুষ্করিণীর মত শান্ত সমুদ্র দেখিয়াছিলাম এবং এখানে তদপেক্ষা কিছু তরঙ্গ ও গর্জ্জন দেখিলাম। কিন্তু সেতুর পর পারে কি ভীষণ তরঙ্গ দূর হইতে দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

তৎপরে বাসায় আসিয়া সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডার সহিত লক্ষ্মণ-তীর্থ নামক একটী প্রস্তরমণ্ডিত পুষ্করিণীতে স্নান করিবার নিমিত্ত গমন করিলাম। ইহা বাসার দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধমাইল দূরে বড় রাস্তার উপর অবস্থিত। ইহার জল অপরিষ্কার, যেন সিদ্ধিগোলার মত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আমরা ইহার জলে সংকল্প ও নারিকেল ভেট করিয়া স্নান করিলাম। পাণ্ডা ঠাকুর মন্ত্র বলাইলেন। স্নান অন্তে লক্ষ্মণেশ্বর মহাদেবের অর্চ্চনা করিলাম। চত্বরের উপর আমাদের স্ত্রীলোকগণ গো দান করিলেন, পুরোহিত মহাশয় মস্তক মুণ্ডন করিলেন। তৎপরে সকলে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রামেশ্বর দেবের ও রামেশ্বরী দেবীর কিরূপ পূজা প্রদান করা হইবে তৎসম্বন্ধে পাণ্ডা ঠাকুর সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পূজা ও ভোগের খরচ ব্যতীত গঙ্গাজল

রামেশ্বর-মন্দিরাভ্যন্তর পথ। (২৬১ পৃঃ।)
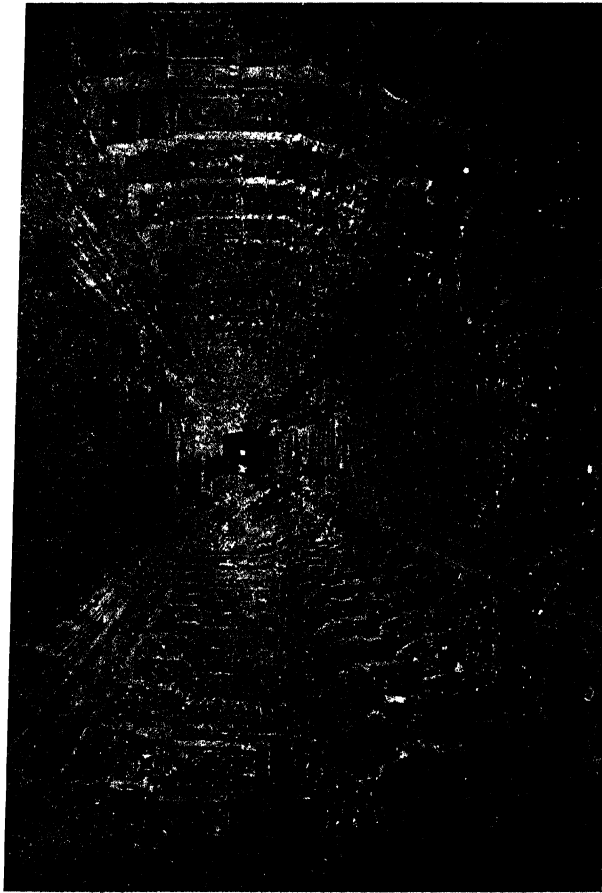
(Calonnade.)

কত টাকার প্রদান করা হইবে তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন যাঁহার যেমন ইচ্ছা ও যেমন অবস্থা তিনি তদ্রূপ খরচ দিলেন। যিনি অতি অবস্থাহীন, তাঁহাকেও পূজার জন্য ১৲ ও গঙ্গাজল ১৲ মোট ২৲ টাকা দিতে হইল। স্ত্রীলোকগণ রামেশ্বরী দেবীর জন্য শঙ্খ, সিন্দূর, লৌহ ও বস্ত্র প্রদান করিলেন, সাধ্যানুসারে সকলেই তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র পূজার খরচ দিলেন। তৎপরে সকলে দেবদর্শনার্থ মন্দিরে গমন করিলাম।

রামেশ্বরের মন্দির।

আমরা প্রথমে বড় রাস্তা দিয়া গমন করিয়া গোপুরমের সম্মুখীন হইলাম। এই গোপুরম্ উচ্চে ১০০ ফিট্, ইহার দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র অলিন্দের মধ্যে দক্ষিণ দিকে কার্ত্তিক স্বামী ও বামদিকে গণেশ দেবের মূর্ত্তি আছে। এই গোপুরমের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। এতদ্ভিন্ন অন্য তিন দিকে ৩টি গোপুরম্ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। গোপুরমের ভিতর দিয়া দেবালয়ে যাইবার প্রস্তরমণ্ডিত সুন্দর পথে পড়িলাম। উভয় পার্শ্বে কারুকার্য্য খোদিত সুন্দর স্তম্ভ সকল উপরের ছাদ রক্ষা করিতেছে। এই পথটী ৬৭১ ফিট্ লম্বা, দুই পার্শ্বে ছবির দোকান এবং দক্ষিণ পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী। ইহার নাম মাধব কুণ্ড বা মাধব তীর্থ। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভশোভিত ছাদ বিশিষ্ট এই পথটীকে ইংরাজীতে The Long Colonnade or The Great Corridor, বলে। ইহার একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। এই রাস্তাটী যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার দুই ধার দিয়া দুই দিকে দুইটী পথ মন্দিরের ভিতর দিকে গিয়াছে। ঠিক সেই সংযোগস্থলে একটী প্রকাণ্ড গণেশের মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহাঁর আকৃতি অনেকটা মেডুরার গণেশের মূর্ত্তির মত। আমরা সিদ্ধিদাতা গণেশকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ দিকের পথে চলিলাম। সে রাস্তাটীও প্রায় এইরূপ দৈর্ঘ্য ও সুন্দর

সুন্দর স্তম্ভাবলম্বিত ছাদবিশিষ্ট। এই সকল স্তম্ভ দ্বারা রাস্তা যেন বারাণ্ডার মত হইয়াছে। এই রাস্তাই এখানকার প্রধান গৌরবের সামগ্রী। ২০ হইতে ৩০ ফিট্ অন্তর স্তম্ভশ্রেণী এবং ছাদ মেজে হইতে ৩০ ফিট্ উচ্চ স্তম্ভোপরি অবস্থিত। এখানকার স্তম্ভের কার্য্য চিদম্বরমের পার্ব্বতী মহেশ্বরের কনক সভার স্তম্ভের কার্য্য অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। প্রত্যেক স্তম্ভেই নানা দেবদেবীর ও রাজাদিগের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। গর্ভগৃহের সম্মুখে যে বারাণ্ডা আসিয়াছে তাহার একদিকে রামনাদ রাজাদিগের মূর্ত্তি আছে। তৎ-পরে আর একটি পুষ্করিণী দেখিলাম ইহার নাম শিবকুণ্ড। মন্দিরের ভিতরে ২১টী কূপ আছে, ইহাও এক একটী তীর্থ। মূল মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড বৃষ বা নন্দীর প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। ইহা একখা'ন প্রস্তরে নির্ম্মিত ও উচ্চে প্রায় ১৫ ফিট্। দেবালয়ের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিলাম—সকল স্থানেই উচ্চ উচ্চ স্তম্ভ ও লম্বা লম্বা হল ও বড় বড় প্রাঙ্গণ। সমস্তই অদ্ভুত কাণ্ড ও বিরাট ব্যাপার। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে উচ্চ প্রাকার তাহা দৈর্ঘ্যে ১০০০ ফিট্ ও প্রস্থে ৬৮৭ ফিট্, রামনদের সেতুপতিরা বহির্ভাগের বৃহৎ মণ্ডপ ও গোপুর নির্ম্মাণ করেন। এই মণ্ডপ কমজোরি ধূসর প্রস্তরে নির্ম্মিত। সুতরাং সামুদ্রিক বায়ুপ্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

মেডুরার নায়ক রাজগণ ভিতরের প্রাকার নির্ম্মাণ করেন। সিংহলের অন্তর্গত কাণ্ডির বংশঙ্কর রাজা সিংহল হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তর সকল আনাইয়া মূল মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পুরাতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ যখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রামেশ্বরে আসিয়াছিলেন তখনও এই মন্দির ও দেবতা বর্ত্তমান ছিল, তৎপূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের সময়েও এই

স্থানে তাঁহার মঠ ছিল। সুতরাং এই মন্দির যে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হইতে পারে—সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার সংস্কার-কার্য্য এবং পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়া থাকিবে। মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর সময় লাগিয়া থাকিবে। শ্রীরঙ্গমের মন্দির, মেডুরার মন্দির ও রামেশ্বরের মন্দির এই ৩টীই দক্ষিণ ভারতে অদ্ভুত ব্যাপার।

মন্দিরের মধ্যে চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া রামেশ্বর দেবের নাটমন্দির বা গর্ভগৃহে উপনীত হইলাম। সম্মুখে সোণার তালগাছ বা Golden Flag Staff আছে। যাত্রিগণ নাটমন্দির হইতে দেবতা দর্শন করিয়া থাকেন। সম্মুখে একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে ভগবান্ রামেশ্বর দেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। একটী স্বর্ণবেদীর উপর অর্দ্ধহস্ত পরিমিত লিঙ্গ জাগরিত রহিয়াছে। কতটা যে বেদীর ভিতর সংস্থিত আছে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইনি অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্ত্তি এবং দ্বাদশ লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম, যথা—

> "সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্
> উজ্জয়িন্যাং মহাকাল মোঙ্কারমমরেশ্বরম্,
> কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্
> বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে,
> বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাবনে।
> সেতুবন্ধে তু রামেশং ঘুস্পৃণেশং শিবালয়ে॥"
>
> শিবপুরাণ।

(১) সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, (২) শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন, (৩) উজ্জয়িনীতে মহাকাল, (৪) নর্ম্মদাতীরে (অমরেশ্বরে) ওঙ্কার, (৫) হিমালয়ে কেদার, (৬) ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর, (৭) বারানসীতে বিশ্বেশ্বর,

(৮) গৌতমীতীরে ত্র্যম্বক, (৯) চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ, (১০) দ্বারকায় নাগেশ, (১১) সেতুবন্ধে রামেশ্বর, (১২) শিবালয়ে ঘুস্‌ণেশ।

যে গৃহে রামেশ্বর দেব আছেন তথায় পূজারি ব্যতীত অন্য কোন ব্রাহ্মণ বা যাত্রীদিগকে যাইতে দেওয়া হয় না। যাত্রিগণ গঙ্গাজল বা পূজার খরচ দিলে, এই সকল পূজারিদিগের দ্বারা পূজা করান হয়। দেবতার গৃহেই যখন কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, তখন কেহই লিঙ্গ স্পর্শ করিতে পায় না। সম্মুখের নাটমন্দির হইতে কেবল মাত্র দর্শন হইয়া থাকে। স্বর্ণমণ্ডিত বেদীটী প্রায় ৩ হস্ত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ২ হস্ত। বেদীটী কারুকার্য্য বিশিষ্ট ও পেনেট যুক্ত। ইহার একটী চিত্র প্রদত্ত হইল, ইহা দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। অন্য
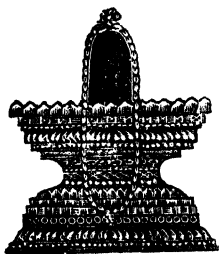
রামেশ্বর দেবের মূর্ত্তি।

ডেক ঢাকা প্রতিমূর্ত্তি।

সময়ে ডেক ঢাকা থাকে। আসল মূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন ডেক দ্বারা আবৃত করা হয়, তখন লিঙ্গের উপর একটী মুখ ও সর্পফণা দ্বারা পরিশোভিত করা হয়। ইহারও একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। নাটমন্দিরের দক্ষিণ দিকে অষ্টধাতুর শ্রীরামচন্দ্র, সীতা

রামেশ্বরের গোপুরম্। (২৬৫ পৃঃ।)

Printed by K. V. Seyne & Bros.

ও হনুমানের মূর্ত্তি আছে। পার্শ্বে সুগ্রীবের একটী ছোট মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতি বৃহস্পতিবার রামেশ্বর দেবের উৎসব মূর্ত্তিকে লইয়া মহাসমারোহে মন্দির প্রদক্ষিণ করান হয়।

আমরা পাণ্ডার দ্বারা রামেশ্বর দেবের অর্চ্চনাদি করিয়া রামেশ্বরী দেবীর মন্দিরে গমন করিলাম। এখানেও সোণার তালগাছ রহিয়াছে। হীরা, মুক্তা খচিত নানালঙ্কার ভূষিতা মা জগদম্বাকে দর্শন করিয়া দেহ মন পবিত্র হইল, নয়ন সার্থক হইল। রামেশ্বরী দেবী দেখিতে কিরূপ তাহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ইহাঁরও একটী ভোগমূর্ত্তি আছে, প্রতি শুক্রবার রাত্রে তাঁহার উৎসব হয়। রামেশ্বর দেবের আরতি দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে আমরা রামেশ্বরী দেবীর উৎসব দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। উৎসবের সময় বাহকগণ ভোগমূর্ত্তিকে অপূর্ব্ব স্বর্ণ সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিক স্কন্ধে করিয়া প্রদক্ষিণ করে। নানাবিধ বাদ্য সেই সময় বাজিতে থাকে। মশালধারিগণ কত মশাল জ্বালাইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতে করিতে দেবীর সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। সে জনকোলাহল ও তৎসঙ্গে মধুর বাদ্যধ্বনি এক রমণীয় ও নয়নাভিরাম দৃশ্য। ভ্রমণ কালে মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ পথে যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে, সেই সেই স্থানে পাণ্ডারা ভোগমূর্ত্তির আরতি করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকে। এইরূপে দেবীকে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করাইয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে সিংহাসন

রামেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি।

সহ রাখিয়া পূজারি ঠাকুর আরত্রিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে কিছু মিষ্টান্ন নিবেদন করিয়া দেবতাকে গৃহে লইয়া যাইলেন। আমরা রামেশ্বরী দেবীর সাপ্তাহিক উৎসব দেখিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই কার্য্যে প্রায় চারি ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

মাসিক উৎসব।

রামেশ্বর ও রামেশ্বরীদেবীর নিত্যপূজা ব্যতীত মাসিক উৎসব হইয়া থাকে, তন্মধ্যে দশ প্রকার উৎসব প্রধান ও উল্লেখযোগ্য।

১। বৈশাখ মাসে শুক্ল ষষ্ঠী হইতে দশ দিবস ব্যাপী বসন্তোৎসব।

২। জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল দশমীতে প্রতিষ্ঠোৎসব।

৩। আষাঢ় মাসে ভরণী নক্ষত্রে দেবীর প্রথম ধ্বজোৎসব।

৪। শ্রাবণ মাসে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে পঞ্চদিবস ব্যাপী কল্যাণ (বিবাহ) উৎসব।

৫। আশ্বিন মাসে শুক্ল প্রতিপদ হইতে দশমী পর্য্যন্ত নবরাত্রোৎসব।

৬। কার্ত্তিকমাসে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে ব্রহ্মোৎসব।

৭। অগ্রহায়ণ মাসে ভরণী নক্ষত্রে দেবীর দ্বিতীয় ধ্বজোৎসব এবং শুক্ল ত্রয়োদশীতে লক্ষ দীপোৎসব হইয়া থাকে।

৮। পৌষ মাসে পূর্ণিমার দিবস পৌষ উৎসব হইয়া থাকে।

৯। মাঘ মাসে পঞ্চদিবসব্যাপী মাঘোৎসব ও শিবরাত্রোৎসব মহাসমারোহে হইয়া থাকে।

১০। ফাল্গুনমাসে মহাভিষেকোৎসব হয়। ভাদ্র ও চৈত্র মাসে বিশেষ কোন উৎসব হয় না।

সেতু।

ভারত হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতু, রামেশ্বর ও মান্নার দ্বীপ লইয়া মোট ৬০ মাইল বিস্তৃত। এই ৬০ মাইলের কিয়দংশ সেতু কিয়দংশ

দ্বীপ এবং খানিকটা ভাঙ্গাসেতু। ইহার দুই পার্শ্বে কেবল জল রাশি বিদ্যমান আছে। প্রথম মাণ্ডাপাম্ হইতে পাম্বাম্ পর্য্যন্ত ২ মাইল বিস্তৃত একটী জলমগ্ন পাহাড়, ইহা গন্ধমাদন পর্ব্বতের অংশ। পূর্ব্বে ভাঁটার সময় এই শৈলের উপর দিয়া পদব্রজে লোক সকল যাতায়াত করিত। ছোট ষ্টিমারের গতি বিধির জন্য পাম্বাম্ তীরের দিকে ২০০ ফিট্ পরিসর শৈল ডাইনামায়িটের সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন ভাঁটার সময় তথায় ১৮ ফিট জল থাকে, সুতরাং ছোট ষ্টিমার সকল এই পাম্বাম্ যোজকের পারাপারে গমনাগমন করিতে পারে। এই ২ মাইলের পর বিখ্যাত রামেশ্বর দ্বীপ। ইহা ১১ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল বিস্তৃত। তৎপরে ১৬ মাইল ভাঙ্গা সেতু। জোয়ারের সময় এইস্থানে জল থাকে, কিন্তু ভাটার সময় বালি ও পাথর জাগিয়া উঠে। রামঝড়কা স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান হইলে, সমুদ্রের উপর একটী কাল রেখার ন্যায় দেখায়। তাহার পর ১৮ মাইল দীর্ঘ ও আড়াই মাইল বিস্তৃত লোক পরিপূর্ণ মান্নার দ্বীপ। ইহাও সেতুর অংশ, এখন এই মান্নার দ্বীপে কেল্লাযুক্ত সুন্দর নগর শোভা পাইতেছে। ইহার পর প্রায় ২ মাইল ভাঙ্গা। এই ভাঙ্গা পার হইলেই লঙ্কাদ্বীপ। এই স্থানের জল বড় কম, এত কম যে ভাঁটার সময় মান্নার দ্বীপ হইতে মানুষ ও গরু পার হইয়া লঙ্কা যায়। পূর্ব্বে এই সেতুর উপর দিয়া লোক সকল লঙ্কা যাতায়াত করিত, তৎপরে ১৪৮৪ খৃঃ অব্দে সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে গমনাগমন বন্ধ হইয়াছে। এই স্থানের সেতুর উভয় পার্শ্বে সাগরের জল কম এবং মধ্যভাগে বালি ও পর্ব্বত। এই সমস্ত ভাগ সেতুর অংশ ছিল। জল কম হেতু এখানে ক্ষুদ্র নৌকাদি ব্যতীত জাহাজ যাইতে পারে না। শুনিতে পাই রামেশ্বর দ্বীপ ও মান্নার দ্বীপ পূর্ব্বে সেতু ছিল এক্ষণে চড়া পড়িয়া পড়িয়া ক্রমশঃ এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে। রামেশ্বর দ্বীপ সর্ব্বস্থানই

প্রায় বালুকাময় ও বাবলা বৃক্ষে আকীর্ণ। এখানে চাষের সম্পর্ক নাই, দেবতার আদেশ অনুসারে কেহই হলাকর্ষণ করিতে পায় না। এই সেতু কেন নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন, তবে সংক্ষেপে ইহার বৃত্তান্ত নিম্নে বর্ণিত হইল। ইংরাজেরা ইহাকে Adam's Bridge বলে।

ত্রেতাযুগে দশস্কন্ধ রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র মা জানকীর উদ্ধারের নিমিত্ত লঙ্কা যাইবার জন্য এই সেতু নির্ম্মাণ করেন। বিশ্বকর্ম্মারপুত্র নলের বুদ্ধিতে ও বানরসেনার সাহায্যে ভগবান্ এই দুষ্কর কার্য্য করেন। ইহাতে কাষ্ঠ বিরালী পর্য্যন্ত সহায়তা করে। হনুমান্ গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন করিয়া এই সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, তৎজ্জন্য সেতুর অনেক স্থানে পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। রামেশ্বর দ্বীপ এই গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। সেতু নির্ম্মিত হইলে দুরাত্মা রাবণ ভগ্ন করিয়া দেয়। শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় সেতু নির্ম্মাণ করেন। রাবণ আবার ভগ্ন করিয়া দেয়। পুনঃ পুনঃ সেতু নির্ম্মাণ ও ভগ্ন হওয়াতে বিভীষণ বলিলেন, এই সেতুর উপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করুন তাহা হইলে রাবণ আর সেতু ভঙ্গ করিতে পারিবে না। কারণ মহাদেব রাবণের ইষ্ট দেবতা। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তখন দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই সেতুর উপর তাঁহার লিঙ্গ স্থাপনা করিলেন। সেই লিঙ্গই রামেশ্বর নামে অভিহিত।* মহাদেব সেতু রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া রাবণ আর সেতু ভঙ্গ করিতে পারিল না। তখন কপি সেনাসহ শ্রীরামচন্দ্র অনায়াসে সাগর পার হইয়া লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক রাবণ বধ করেন। এইরূপে মা জানকীর উদ্ধার করিয়া সকলে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তন

* সেতু মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থের সহিত রামায়ণের মিল নাই। তাহাতে বর্ণিত আছে যে, রাবণ বধের পর রামেশ্বর মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। ২৭৬ পৃঃ হনুমৎ কুণ্ড দেখ।

কালে সাগর মূর্ত্তিমান্ হইয়া ভগবান্‌কে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আমার বন্ধন মোচন করুন, নচেৎ শৃগাল কুকুর পর্য্যন্ত অনায়াসে আমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে। তখন অগ্রজের আদেশে লক্ষ্মণচন্দ্র ধনুকের সাহায্যে এই সেতু ৩ খণ্ডে বিভক্ত করেন। মান্নার দ্বীপের দিকে যেখানে সেতু কর্ত্তন করেন তাহাই ধনুষ্কোটী তীর্থ। সেতুতে ভারত হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত মোট ২৪টী তীর্থ আছে। প্রথমে চক্রতীর্থ, এই স্থানে ধর্ম্ম পুষ্করিণী, দেবী পট্টন ও নব পাষান আছে। ইহাই সেতুর মূল, ইহার পর গন্ধমাদনপর্ব্বত, ইহার উপর ২৩টী তীর্থ ও কতকগুলি উপতীর্থ আছে। ইহাদের নাম পর পর লিখিত হইল।

১। চক্রতীর্থ, ২। বেতাল বরদতীর্থ। ৩। পাপ বিনাশন তীর্থ। ৪। সীতাসর তীর্থ। ৫। মঙ্গল তীর্থ। ৬। অমৃতব্যাপিকা তীর্থ। ৭। ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থ। ৮। হনুমৎকুণ্ড তীর্থ। ৯। অগস্ত্য তীর্থ। ১০। শ্রীরাম তীর্থ। ১১। শ্রীলক্ষ্মণ তীর্থ। ১২। জটাতীর্থ ১৩। শ্রীলক্ষ্মী তীর্থ। ১৪। অগ্নিতীর্থ। ১৫। চক্রতীর্থ দ্বিতীয়। ১৬। শ্রীশিব তীর্থ। ১৭। শঙ্খতীর্থ। ১৮। যমুনা তীর্থ ১৯। গঙ্গা তীর্থ। ২০। গয়াতীর্থ। ২১। কোটী তীর্থ। ২২। সাধ্যামৃত তীর্থ। ২৩। মানসাখ্য সর্ব্ব তীর্থ। ২৪। ধনুষ্কোটী তীর্থ।

১। চক্রতীর্থ।

পুরাকালে ধর্ম্ম, দক্ষিণ সমুদ্রতীরে দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা করিবার সময় স্নানার্থ দশ যোজন ব্যাপী এক পুষ্করিণী খনন করেন। ইহাই ধর্ম্ম পুষ্করিণী নামে খ্যাত। ইহার তীরে বিষ্ণু পরায়ণ "গালব" মুনি নিরাহারে অযুত বর্ষ উগ্র তপস্যা করেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার [illegible] হইয়া বলিলেন বৎস! তুমি বর প্রার্থনা কর। গালব

শঙ্খ, চক্র গদাপদ্মধারী নারায়ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ভক্তি সহকারে বলিলেন, প্রভো! ত্বদীয় পাদপদ্ম যুগলে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। হরি বলিলেন তুমি আর কিছু বর প্রার্থনা কর। গালব কহিলেন, ব্রহ্মা যাঁহাকে জ্ঞানযোগ দ্বারাও দেখিতে পান না, সেই ভগবান্ হরিকে আজ স্বচক্ষে দর্শন করিলাম ইহা অপেক্ষা আর আমার বরের কি প্রয়োজন? হে জগৎপতে! আমি আর অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না। তখন হরি বলিলেন, তুমি এই স্থানে থাকিয়া আমার উপাসনা কর। দেহান্তে আমার স্বারূপ্য লাভ করিবে। তোমার কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমার চক্র আসিয়া তোমায় রক্ষা করিবে। এই বলিয়া ভগবান্ অদর্শন হইলেন। এদিকে গালব ধর্ম্ম পুষ্করিণী তীরে বিষ্ণু পরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক দিবস বশিষ্ঠ শাপভ্রষ্ট "দুর্দ্দম" নামক রাক্ষস ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া গালবকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। গালব প্রাণ ভয়ে বিষ্ণুর কৃপা প্রার্থনা করিলে, ভক্তবৎসল হরি ভক্তের ত্রাণের জন্য চক্র প্রেরণ করিলেন। চক্র আসিয়া রাক্ষসকে সংহার করিয়া গালব মুনিকে উদ্ধার করিল। তদবধি এই স্থান চক্রতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে।

ধর্ম্ম পুষ্করিণীর উত্তর ভাগে দক্ষিণোদধি তীরে দেবী পত্তন্ ও নব পাষান আছে। পুরাকালে মহিষাসুর যুদ্ধে মহিষ, দেবীর মুষ্টি প্রহারে তাড়িত ও ভীত হইয়া দক্ষিণ সাগরের দিকে পলাইতে আরম্ভ করিলে দেবীও তৎপশ্চাৎ অনুসরণ করেন। মহিষ অনন্যোপায় হইয়া এই ধর্ম্মপুষ্করিণীতে লুকাইত হইলে অশরীরিণী বাণী দেবীকে এই ঘটনা নিবেদন করে। তখন দেবীর আদেশে মৃগেন্দ্র [illegible] তোয় পান পূর্ব্বক নিঃশেষ করিলে দেবী মহিষকে এ[illegible]স্থানে বধ করিয়া পুরী নির্ম্মাণ করেন। দেবতারা ইহার নাম "দেবী পত্তন" রাখিলেন।

নব পাষান, সেতুর মূল দেশেই স্থাপিত। এই স্থানে সপ্ত খণ্ড পাষাণ প্রদান করিয়া সাগর স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। যথা—

"পিতৃনাং তৃপ্তিদং স্থান ত্রয়ং রামেণ নির্ম্মিতম্।
সেতুমূলে ধনস্কোট্যাং গন্ধমাদন পর্ব্বতে॥"

সুতরাং সেতুর মূলস্থানে ধর্ম্ম পুষ্করিণী বা চক্রতীর্থ, দেবী পত্তন ও নব পাষাণ সকলের দ্রষ্টব্য।

২। বেতাল বরদতীর্থ।

ইহা চক্রতীর্থের দক্ষিণে ও গন্ধ মাদনের উত্তরে অবস্থিত। ইহার পৌরাণিক কথা এই—গালব মুনির রূপ যৌবন সম্পন্না কন্যা "কান্তি মতী" পিতার পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিয়া আসিতেছিলেন। পথে "সুদর্শন ও সুকর্ণ" নামক বিদ্যাধর কুমার দ্বয় তাহাকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার রূপ যৌবনে মোহিত হইল। পরে তাঁহাকে প্রলোভনে বশীভূত করিতে না পারিয়া বলপ্রয়োগে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বিমানে উত্তোলন করিয়া প্রস্থান করিল। সুকর্ণও তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক হইল না। কান্তিমতী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। গালব মুনি উহা জানিতে পারিয়া কন্যাকে শীঘ্র উদ্ধার করিলেন এবং উহাদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। সুদর্শনকে বলিলেন "তুমি মানব রূপধারী হইয়া নানা কষ্ট পাইবে এবং সহসা বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়া মাংস ও শোণিত ভুক্ হইবে।" সুকর্ণকে বলিলেন "তুমি মনুষ্য হইবে এবং বিদ্যাধর বিজ্ঞপ্তি-কৌতুককে দর্শন করিলে মুক্ত হইবে।" তখন গালব মুনির শাপ বশতঃ বিদ্যাধর ভ্রাতৃদ্বয় যমুনা তটবাসী গোবিন্দ স্বামী নামক কোন ব্রাহ্মণের গৃহে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

সুদর্শনের নাম বিজয়াশোক ও সুকর্ণের নাম অশোক দত্ত হইল। বিজয়াশোক শ্মশানে চিতানল আনিতে যাইয়া শবের কপালস্থ বসা পান করতঃ অতি ভয়ঙ্কর মহাকায় ও তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র হইয়া বেতালত্ব প্রাপ্ত হইল। অশোক দত্ত বিজ্ঞপ্তি কৌতুক বিদ্যাধরকে দর্শন করিয়া শাপমুক্ত হইয়া স্বরূপত্ব লাভ করিল; এবং পূর্ব্ব শাপ বৃত্তান্ত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবস্থা অবগত হইয়া বেতালরূপী ভ্রাতাকে দক্ষিণ সমুদ্র তটে চক্রতীর্থের দক্ষিণে আনয়ন করিল। গন্ধমাদন পর্ব্বতের উত্তরস্থিত ব্রহ্মসনকাদি সেবিত পুণ্যতীর্থের স্পর্শ মাত্রেই তাহার বেতালত্ব দূর হইল। তদবধি ইহার নাম বেতাল বরদ তীর্থ।

৩। গন্ধমাদন পর্ব্বত।

এখন যাহাকে পাম্বাম্ ও রামেশ্বর কহে, তাহাই সেতুমাহাত্ম্যোক্ত গন্ধমাদন। এই স্থান পিণ্ড দানের একটী প্রধান তীর্থ; এবং গন্ধমাদনের বায়ু অঙ্গে লাগিলে কোটী ব্রহ্মহত্যা অগম্যাগমনাদি মহা পাতক নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং এমন পবিত্র তীর্থ আর নাই। এখান হইতে ধনুষ্কোটী পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থই এই গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থিত। সেতু মাহাত্ম্যে বলিতেছে—

"সেতু মূলং ধনুষ্কোটি গন্ধমাদন মেব চ।
ঋণমোক্ষ ইতি খ্যাত মুত্তমং দেব নির্ম্মিতম॥"

গন্ধমাদনের প্রথমেই পাপ বিনাশন তীর্থ। ইহার স্মরণমাত্রে গর্ভবাস নষ্ট করে এবং এখানে স্নান করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া লোক সকল বৈকুণ্ঠে গমন করে। সুতরাং তীর্থযাত্রী মাত্রেরই এখানে স্নান করা কর্ত্তব্য। রামেশ্বরে আসিয়া সাগরে সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিয়া গন্ধমাদনে পিণ্ড দিবে। এখানে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন।

৪। সীতাসর তীর্থ।

জনকনন্দিনী মা জানকী সর্ব্বজন সমক্ষে এবং সর্ব্বদেবতা সাক্ষাতে সতীত্ব প্রভাবে অক্ষত শরীরে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, পঞ্চ মহাপাতক নাশিনী সরোবরে স্নান করিয়া শুদ্ধ হন। তজ্জন্য এই সরোবরের নাম সীতাসরোবর হইল।

"রাঘবপ্রত্যয়ার্থং হি প্রবিশ্য হুতবাহনম্।
সন্নিধৌ সর্ব্বদেবানাং মৈথিলী জনকাত্মজা॥
বিনির্গতা পুনর্ব্বহ্নেঃ স্থিতা সর্ব্বাঙ্গশোভনা।
নির্ম্মমে লোকরক্ষার্থং স্বনাম্না তীর্থ মুত্তমম্॥
তত্র সস্নৌ স্বয়ং সীতা তেন সীতাসরঃ স্মৃতম্।
তত্র যো মানবঃ স্নাতি সর্ব্বান্ কামান্ লভেত সঃ॥"

ইহা গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক দেশে অবস্থিত। ইহা পঞ্চ মহাপাতক নাশন বলিয়া পঞ্চানন এই স্থানে অবস্থান করেন। ইহার পৌরাণিক বিবরণ এই—পূর্ব্বে "ত্রিবক্র" রাক্ষসের পত্নী "সুশীলা" বিন্ধ্যপাদবনে "শুচি" নামক মহামুনির নিকট আসিয়া পুত্র কামনা করিলে, মুনি তাহার গর্ভে "কপালাভরণ" নামক এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পুত্র কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার বরে পুরন্দর সদৃশ হইলেন। তৎপরে তিনি সহস্র বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া অমরাবতী আক্রমণ করিলে, উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইহাতে কপালাভরণের শত অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইলে তিনি স্বয়ং ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্র কিছুতে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া শেষে বজ্র দ্বারা বিনাশ করেন। কপালাভরণ ব্রহ্মবীজোদ্ভব, সুতরাং ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট আগমন পূর্ব্বক পাপ

বিনাশের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সীতাসর তীর্থে স্নান করিতে বলেন। তদনুসারে ইন্দ্র গন্ধমাদন পর্ব্বতের সীতাসর নামক পঞ্চপাপ বিনাশন তীর্থে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইলেন।

৫। মঙ্গলতীর্থ।

ইহাও গন্ধমাদন পর্ব্বতের অন্য এক পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাস করেন। অলক্ষ্মী ও আপদ্ পরিহারের জন্য দেবতাগণও এই স্থানে আসিয়া থাকেন। এই তীর্থে স্নান করিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্র চত্বারিংশৎ দিন জপ করিলে সর্ব্ব অনর্থ বিনাশ হয় এবং মানব লক্ষ্মীবান্ হয়।

৬। অমৃতবাপিকা।

ইহা গন্ধমাদন পর্ব্বতে রামনাথক্ষেত্রে অবস্থিত। এই বাপিকাতে স্নান করিলে আর জ্বরের ভয় থাকে না। শঙ্করের প্রসাদে নরগণ সর্ব্ব-রোগ হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করে। এই স্থানে বসিয়া শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ বিভীষণ ও হনুমানের সহিত রাবণ বধের মন্ত্রণা করিতেন। সাগরের গর্জ্জনে তাঁহাদের পরামর্শ স্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হইতে ছিল না বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র ভ্রূভঙ্গী করিয়া সাগরকে স্থির হইতে বলেন। তজ্জন্য এই স্থানের জল অদ্যাপি নিস্তব্ধ দৃষ্ট হয়। ঐ একদেশ স্থান অদ্যাপি রামনাথক্ষেত্র নামে খ্যাত।

৭। ব্রহ্মকুণ্ড।

পুরাকালে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই দুইজনের মধ্যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে এই বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মা বলেন আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু বলেন আমিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছি। এমন সময় সেই স্থানে সহসা এক

বিরাট অনাময় জ্যোতির্লিঙ্গ উত্থিত হইলে উভয়েই বিস্মিত হন। তৎপরে ব্রহ্মা বলিলেন "আদিত্যসঙ্কাশ অনন্তাগ্নিসমপ্রভ এই অনাদি লিঙ্গের যে আদ্যন্ত দর্শন করিবে সেই লোককর্ত্তা ও প্রভু হইবে এবং তাহার বাক্যই ঠিক। আমি ঊর্দ্ধে গমন করি এবং আপনি নিম্নে গমন করিয়া লিঙ্গের মূল সন্দর্শন করুন।" বিষ্ণু তখন বরাহরূপ ধারণ করিয়া অধোদিকে গমন করিতে লাগিলেন, এবং ব্রহ্মা হংস বাহনে ঊর্দ্ধে গমন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু, লিঙ্গের মূল দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বলিলেন আমি লিঙ্গের আদি দেখিতে পাইলাম না। ব্রহ্মা কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিথ্যা কথা কহিলেন যে আমি লিঙ্গের অন্ত দেখিয়াছি। তখন লিঙ্গরূপী ঈশ্বর উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, চতুরানন! তুমি আমার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা কহিয়াছ সুতরাং লোকে তোমায় সর্ব্বদা পূজা করিবে না। তৎপরে বিষ্ণুকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট সত্য কথা কহিয়াছ, তজ্জন্য তুমি সর্ব্বত্র পূজা পাইবে। ব্রহ্মা তখন শঙ্করের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। মহেশ্বর সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নয়, তুমি গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিয়া মিথ্যা দোষ প্রশান্তির জন্য তথায় যজ্ঞ কর, তৎপরে তোমার পাপ বিধৌত হইলে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মে তোমার পূজা হইবে, কিন্তু প্রতিমাদিতে তোমার পূজা হইবে না। তদনন্তর ব্রহ্মা গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, ইহাতে পৌণ্ডরিকাদ মহর্ষিরা ব্রতী ছিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে মহেশ্বর প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি মিথ্যা দোষ হইতে মুক্ত হইলে এবং এই কুণ্ড তোমার নামে খ্যাত হইবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মকুণ্ড বর্ষায় ভরিয়া থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়। এই সময় ইহার অভ্যন্তর হইতে এক প্রকার মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার নাম ব্রহ্মকুণ্ডভস্ম।

৮। হনুমৎ কুণ্ড।

রাবণ সবংশে নিহত হইলে শ্রীরামচন্দ্র সদলবলে গন্ধমাদনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাবণ ব্রহ্মবীজজাত সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইল। পাপ বিমোচনার্থ মুনিগণের উপদেশ অনুসারে তিনি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য হনুমান্‌কে বলিলেন, বৎস! তুমি কৈলাস হইতে শিবলিঙ্গ আনয়ন কর আমি এই স্থানে সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিব। আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র হনুমান্ কৈলাসে গমন করিয়া লিঙ্গরূপধারী মহাদেবের সাক্ষাৎ না পাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাদেব হনুমানের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লিঙ্গ প্রদান করিলেন। লিঙ্গ প্রাপ্তি মাত্র হনুমান্ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখেন যে শ্রীরামচন্দ্র বিলম্ব হেতু জানকী কৃত সৈকত লিঙ্গ শুভলগ্নে স্থাপন করিয়াছেন। তখন হনুমান্ রোষে ও ক্ষোভে নানা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অনেক বুঝাইলেন এবং বলিলেন, তোমার আনীত লিঙ্গ দ্বাদশ লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম হইবে। যদি ইহাতে তোমার মনের ক্ষোভ না নিবারিত হয়, তাহা হইলে তুমি মৎ-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ উঠাইয়া তোমার আনীত লিঙ্গ স্থাপনা কর। আমি তাহার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিব। তখন মারুতি সানন্দে সেই লিঙ্গ হস্তদ্বারা উঠাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু বিফল মনোরথ হওয়াতে পুচ্ছদ্বারা লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া দুই পদের উপর ভর দিয়া যেমন উত্তোলন করিবে, অমনি বেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া এক ক্রোশ দূরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; এবং মুখ নাসিকা লিঙ্গ ও অপান হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত স্রাব হইয়া এক কুণ্ডে পরিণত হইল। মূর্চ্ছান্তে মারুতি করযোড়ে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিল। তখন রাঘব এই কুণ্ডের তীরে সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং কুণ্ডের নাম হনুমৎকুণ্ড রাখিলেন। এই কুণ্ডে স্নান করিলে মহাপাতক নাশ হয় এবং

কোন অপুত্রক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে সৎপুত্র লাভ করে। হনুমান্ পুচ্ছে করিয়া শিবলিঙ্গ আনিয়াছিল বলিয়া লিঙ্গগাত্রে এখনও পুচ্ছচিহ্ন আছে। এবং সেই স্থানে একখানি শিলাতে হনুমানের মূর্ত্তি ও তাহার পুচ্ছে বেষ্টিত লিঙ্গের অঙ্কিত ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

৯। অগস্ত্য তীর্থ।

পূর্ব্বে এক সময়ে মেরু ও বিন্ধ্যপর্ব্বতে কলহ উপস্থিত হয়। বিন্ধ্য পর্ব্বত সর্ব্বস্থান আক্রমণ করিয়া স্বীয় শরীর সহসা বৃদ্ধি করিতে লাগিল ইহাতে প্রাণিগণ রুদ্ধশ্বাস হইয়া মৃতপ্রায় হইল। তখন সৃষ্টিনাশের আশঙ্কায় দেবগণ কৈলাসে গমন করিয়া মহাদেবকে এই বিষয় অবগত করাইলে তিনি বিন্ধ্য গিরিকে শাসন করিবার নিমিত্ত অগস্ত্যকে আদেশ করেন। অগস্ত্য মুনি তথায় উপস্থিত হইলে বিন্ধ্যগিরি তাঁহাকে যেমনি প্রণাম করিবে, অমনি মুনিবর বলিলেন যাবৎ আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি তদবধি তুমি এইরূপ নতশির হইয়া থাক। সেই অবধি বিন্ধ্যগিরির আর বৃদ্ধি নাই। এদিকে অগস্ত্য মুনি দক্ষিণ দিকে যাইয়া গন্ধমাদনের বৈভব অবগত হইয়া তথায় পুণ্যতীর্থ খনন করেন। এই তীর্থই অগস্ত্যতীর্থ নামে খ্যাত হয়। ইহা সর্ব্ব অভীষ্ট ফলপ্রদ এবং মোক্ষফল প্রদায়ক। এই স্থানে স্নান করিয়া ইহার জল পান করিলে লোকে সর্ব্বরোগমুক্ত হয় এবং ইহলোকে সর্ব্বসুখে সুখী হইয়া অন্তে শিবলোকে গমন করে।

১০। রামতীর্থ।

ইহা শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি এই তীর্থ স্থাপন করিয়া যান। ইহার তীরে মুষ্টিমাত্র দান করিলে অনন্ত গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এখানে যজ্ঞ করিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ

হয়। জপ তপ করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র লোকানুগ্রহ কামনায় মৃত্যু বিনাশক, মহাসিদ্ধিকর, পাতক নাশক, ভক্তিমুক্তি ফলপ্রদ, নরকযন্ত্রণা নাশক, রামভক্তিপ্রদ, সংসারচ্ছেদ কারণ মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। রামতীর্থে স্নান করিয়া রামেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে নরগণ সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া অন্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইহার তুল্য তীর্থ নাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথন জনিত পাপ হইতে উদ্ধারের জন্য মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশে ভ্রাতা ও পুরোহিত ধৌমের সহিত এখানে আসিয়া যথাবিধি সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান দান ও তর্পণাদি করেন। তৎপরে এক মাস কাল এখানে বাস করিয়া গো, ভূমি, তিল, বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকেন এবং যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতি, বন্ধু, গুরুজন ও পিতৃদিগের পিণ্ডদান করেন। এইরূপ করিলে দৈববাণী হইল, "হে পাণ্ডুনন্দন! এই পুণ্যপ্রদ রামতীর্থে স্নান, দান ও লিঙ্গ দর্শন মাহাত্ম্য হেতু তুমি নিষ্পাপ হইয়াছ। এইবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্য শাসন কর।" তখন যুধিষ্ঠির পাপের শান্তিতে প্রীত হইয়া দৈববাণী ও মহালিঙ্গকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। সুতরাং এমন তীর্থ আর ভারতে নাই। ইহা রামকুণ্ড, রামসর ও রঘুনাথসর নামেও প্রসিদ্ধ। দেখিতে ইহা প্রস্তর মণ্ডিত বৃহৎ পুষ্করিণী বিশেষ কিন্তু ইহার অশেষ গুণ।

১১। লক্ষ্মণতীর্থ।

লক্ষ্মণ স্বতীর্থকূলে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই তীর্থে স্নান করিয়া লক্ষ্মণেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে দারিদ্রদুঃখ, রোগ ও ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। অপুত্রক ব্যক্তি আয়ুষ্মান্, গুণবান্ ও বিদ্বান্ পুত্র লাভ করে। বলরাম নৈমিষারণ্যে সূতকে বধ করিলে

ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশ হেতু এই লক্ষ্মণ তীর্থে আসিয়া স্নান ও ব্রাহ্মণ-দিগকে বিত্ত, ধান্য, গো ও ভূমি প্রদান করাতে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই তীর্থের উপর একটী চাঁদনী আছে। তথায় পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে গোদান করায়। আমাদের স্ত্রীলোকগণ এই স্থানে গোদান করিয়াছিলেন। রামেশ্বর মন্দির হইতে ইহা এক মাইল মাত্র এবং বড়' রাস্তার উপরস্থিত। লক্ষ্মণতীর্থ দেখিতে একটী পুষ্করিণীর মত। জল ঘোলা সবুজবর্ণ।

১২। জটাতীর্থ।

রাবণবধের পর শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানে জটা শোধন করিয়াছিলেন। এই তীর্থে স্নান করিলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় এবং ইহা জন্ম মৃত্যু, জরান্তক, সংসারাতুরচেতাদিগের অজ্ঞান নাশক। শুকদেব ও দুর্ব্বাসা মুনি এই তীর্থে স্নান করিয়া মনঃ-শুদ্ধি পাইয়া ব্রহ্মানন্দময় হইয়াছিলেন। মহর্ষি ভৃগুও জটাতীর্থে স্নান করিয়া বুদ্ধি-শুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই তীর্থ চিত্তশুদ্ধির এবং মুক্তির প্রধান সহায়।

১৩। লক্ষ্মীতীর্থ।

যে কেহ কোন বাসনা করিয়া ইহাতে স্নান করিলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। নলকুবের ইহাতে স্নান করিয়া "মহাপদ্ম" নামে নিধির অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ভ্রাতাগণের সহিত লক্ষ্মীতীর্থে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে গো, ভূমি ও ধনরত্নাদি প্রদান করায় রাজসূয় মহাযজ্ঞের সমাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সর্ব্বকাম প্রদ এমন তীর্থ এক্ষণে সমুদ্রগর্ভে নিহিত।

১৪। অগ্নি তীর্থ।

এই স্থানে মা জানকীর অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছিল। ইহাও এক্ষণে সমুদ্র গর্ভে নিহিত। লক্ষ্মীতীর্থ হইতে ইহা প্রায় ৫০০ ফিট অন্তরে ছিল। এই তীর্থ হইতে অগ্নিদেবের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিল; এবং তিনি মা জানকীর বিশুদ্ধতাসূচক বাক্য কহিলে, পূর্ব্বকথিত সীতাসর নামক তীর্থে সীতা দেবীকে স্নান করাইয়া শ্রীরামচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তীর্থে স্নান করিলে পূর্ব্বে মানবগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সাযুজ্য লাভ করিত, কিন্তু এক্ষণে ইহা অনন্ত বারিধি মধ্যে লুকাইত।

১৫। চক্রতীর্থ।

পূর্ব্বে ইহা মুনিতীর্থ নামে অভিহিত ছিল। পুরাকালে মহর্ষি অহির্বুধ্ন তপোবিঘ্নকারী রাক্ষসের ভয়ে সুদর্শন চক্রের আরাধনা করিয়াছিলেন। মুনির তপস্যায় তুষ্ট হইয়া সুদর্শন চক্র রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করেন। তদবধি ইহার নাম চক্রতীর্থ হইয়াছে। ইহাতে স্নান করিলে ভূত প্রেত পিশাচ ও রাক্ষসের ভয় থাকে না; এবং অন্ধ, বধির, খঞ্জ, মুক, পঙ্গু প্রভৃতি বিকলাঙ্গ মানবগণ পুনঃ অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১৬। শিবতীর্থ।

এই তীর্থ স্বয়ং মহাদেব খনন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম শিবতীর্থ হইয়াছে। ইহাতে স্নান করিলে মহাপাতক ও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। ইহা মন্দিরের মধ্যে রামেশ্বরী দেবীর সম্মুখেই অবস্থিত।

১৭। শঙ্খতীর্থ।

শঙ্খ নামক মুনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিষ্ণুর তপস্যা করিতেন। তৎকালে স্নান করিবার জন্য এই তীর্থ খনন করিয়াছিলেন। ইহাতে স্নান করিলে কৃতঘ্ন ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে, এবং পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি গুরুজনের অবমাননাদি পাপও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

১৮। গঙ্গাতীর্থ ১৯। যমুনাতীর্থ ২০। গয়াতীর্থ।

এই তীর্থত্রয়ে স্নান করিলে অজ্ঞানতা নাশ হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। রৈক্ক নামক মহর্ষি গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিয়া তপোবলে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন। শেষে বৃদ্ধাবস্থায় পঙ্গু হইলে শকট আরোহণে তীর্থ স্থানে আসিতেন। ক্রমে পামারোগে আক্রান্ত হইয়া দিবানিশি অঙ্গ কণ্ডূয়ন করিতে থাকেন তথাপি তপস্যা বা স্নান ত্যাগ করিতেন না। একদিবস তিনি গঙ্গা, যমুনা ও গয়াতীর্থে স্নান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, যোগ প্রভাবে গঙ্গা, যমুনা ও গয়াতীর্থ স্মরণ করেন। ইহাতে তাঁহারা নিজ নিজ মূর্ত্তিতে ভূমি ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হন; এবং রৈক্ক মুনিকে বলেন আজ হইতে তুমি সর্ব্বব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিলে এবং আমাদের নামানুসারে ইহার নাম গঙ্গা, যমুনা ও গয়াতীর্থ হইল।

২১। কোটী তীর্থ।

রামেশ্বর দেবের অভিষেকের জন্য উৎকৃষ্ট তীর্থবারি প্রাপ্ত না হওয়াতে, শ্রীরামচন্দ্র ধনুষ্কোটীর অগ্রভাগ দ্বারা ধরণী বিভেদ করিয়া জাহ্নবীকে স্মরণ করেন। গঙ্গা কোটি সংখ্যক ভিন্ন বিবর দিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, সেই শুদ্ধ বারিতে রামেশ্বর দেবের অভিষেক

কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎপরে তিনি রাবণ বধ নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত এই কোটী তীর্থে স্নান করিয়া অনুজ ও কপিকুল সহ পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে গমন করেন।

শ্রীরামচন্দ্র গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে প্রত্যাগমনের সময় এই কোটী তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া, সকল যাত্রীরই কোটী তীর্থে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইয়া সেতু বা গন্ধমাদন পর্ব্বত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে স্নান করিলে সর্ব্ব সম্পদ্ বৃদ্ধি ও মনঃশুদ্ধি হয়; এবং দুঃখ, মহাদুঃখ, মহাপাতক ও মহাবিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কংস বধ করিয়া নারদের উপদেশে স্বমাতুলবধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত এই কোটী তীর্থে আসিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়াছিলেন। যদিও তিনি নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা, তাঁহার আবার পাপ কি? তথাপি লোকশিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি এখানে স্নান করিয়াছিলেন। সুতরাং এই তীর্থ মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত।

২২। সাধ্যামৃত তীর্থ।

এই তীর্থ মন্দির প্রাঙ্গণের ভিতর অবস্থিত। সনকাদি মহাযোগী-গণ ইহাতে স্নান করিতেন। ইহা মুক্তিপ্রদ ও সর্ব্বপাপ বিমোক্ষদ। পুরাকালে পুরুরবা অভিশপ্ত হইয়া উর্ব্বসীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে, মনের দুঃখে ও বিরহ কষ্টে তাপিত হইয়া এই সাধ্যামৃত তীর্থে স্নান করিয়া তীর্থ বৈভব বশতঃ শাপমুক্ত হন এবং পুনর্ব্বার উর্ব্বসীর সহিত মিলিত হইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অমরাবতী গমন করেন। সুতরাং ইহাতে স্নান করিলে আর বিরহযন্ত্রণা থাকে না।

২৩। সর্ব্বতীর্থ।

ইহার অপর নাম মানস তীর্থ। পুরাকালে ভৃগুবংশোদ্ভব "সুচরিত" নামে ঋষি বার্দ্ধক্য বশতঃ গমনাগমনে অক্ষম হইয়া সেতুস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া মহাদেবের তপস্যা করেন। দেবাদিদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষীভূত হইলে, এই বর দেন যে, এই তীর্থে এক্ষণে সর্ব্ব তীর্থের সমাগম হইয়াছে; এবং তুমি ইহাতে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল প্রাপ্ত হইবে। আমি এই তীর্থে সর্ব্বদা থাকিব। তদবধি যাত্রীগণ ইহাতে স্নান করিলে সকল তীর্থের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২৪। ধনুষ্কোটী তীর্থ।

সেতুমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থের মতে রাবণ বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সদল বলে গন্ধমাদনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সাগরের প্রার্থনায় ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া রাঘবকে সেতুভঙ্গ করিতে অনুরোধ করেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র অবলীলা ক্রমে ধনুষ্কোটী (ধনুকের অগ্রভাগ) দ্বারা সেতু ভঙ্গ করেন। তজ্জন্য এই তীর্থের নাম ধনুষ্কোটী তীর্থ হইয়াছে।* ইহা রামেশ্বর হইতে প্রায় বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে যাইতে হইলে রাত্রি ৩টার সময় নৌকা যোগে যাইতে হয় এবং পরদিন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় সন্ধ্যা হয়! হাঁটাপথ বড় দুর্গম ও বালুকাময় ইহার উভয় পার্শ্বে সমুদ্র, মধ্যস্থলে বালুকাময় ভূমি তাহার অনেক অংশ জোয়ারের সময় ডুবিয়া যায় তজ্জন্য হাঁটা পথে কেহ গমন করে না।† ইহার তুল্য তীর্থ আর নাই। সকল পাপের মোচন আছে কিন্তু বিশ্বাসঘাতক পাপ

* রামায়ণে উক্ত আছে যে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ ধনুকের দ্বারা সেতু ভঙ্গ করেন; কিন্তু সেতু মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থের মতে শ্রীরামচন্দ্র ভঙ্গ করেন।

† শুনিতেছি এক্ষণে ধনুষ্কোটী পর্য্যন্ত রেল হইয়াছে।

কোথাও মোচন হয় না। কেবল এই ধনুষ্কোটী তীর্থে বিশ্বাসঘাতকের পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে যে পাপ করিলে অষ্টবিংশতি মহানরকে যাইতে হয়, এই তীর্থে স্নান করিলে তৎসমস্তই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধনুষ্কোটীতে সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান ও দান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আত্মবিদ্যা, অদ্বৈতজ্ঞান, চতুর্ব্বিধ মুক্তি, গোসহস্র দানের ফল, সম্পদ্ ও চিত্ত-শুদ্ধি প্রভৃতি ফল প্রাপ্তি হয়, এবং ব্রহ্মহত্যা, গুরু স্ত্রী, পরদার গমন, সুবর্ণ হরণ প্রভৃতি পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানে স্নান, পিতৃতর্পণ ও পিণ্ডপ্রদান করিলে এবং ভক্তি সংযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়। অপিচ সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ করিয়া সর্ব্ব পাপ বিমোচন হইয়া মুক্তি লাভ হয়। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা নিদ্রিতাবস্থায় পাণ্ডবের পঞ্চপুত্রকে নিধন করিলে তিনি "সুপ্তমারণ" পাপে লিপ্ত হন; এবং সে পাপ কোন তীর্থে বিনষ্ট হইল না। শেষে মহর্ষি বেদব্যাসের কৃপায় ও আদেশে তিনি এই ধনুষ্কোটীতে আসিয়া স্নান ও দান করিয়া "সুপ্তমারণ" মহাপাপ হইতে উদ্ধার হন। দেবতা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই যে কোন পাপ করুন না, এই ধনুষ্কোটী তীর্থে স্নান দান করিয়া সকলেই উদ্ধার হইয়াছেন। যে যে পাতকের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উক্ত নাই তৎসমস্তই এই তীর্থে নষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত পাপ হইতে উদ্ধার হয়।

১। শূদ্রকর্ত্তৃক শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুপূজা ২। বিপ্রের নিন্দা করা ৩। বিশ্বাস ঘাতকতা ৪। ভ্রাতৃভার্য্যা গমন ৫। দ্বিজাতির শূদ্রান্নভোজন ৬। শ্রুতিনিন্দা করা ৭। কন্যা-বিক্রয় ৮। হয়-বিক্রয় ৯। দেবতা বিক্রয় ১০। বেদবিক্রয় ১১। ধর্ম্মবিক্রয় ১২। তীর্থজল বিক্রয়। ১৩। মাতা পিতা সন্ন্যাসী ও গুরুর নিন্দা। ১৪। শিবনিন্দা; ১৫। বিষ্ণু নিন্দা, মিথ্যাকথা কথন প্রভৃতি সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে।

অন্যান্য তীর্থ।

পূর্ব্বোক্ত ২৪টী প্রধান তীর্থ ব্যতীত সেতুতে কতকগুলি উপতীর্থ আছে। সেগুলিও পাপনাশক এবং পুণ্যপ্রদ। সে গুলির নাম এই :—

১। ক্ষীরসর বা ক্ষীরকুণ্ড তীর্থ ২। কপিতীর্থ ৩। গয়াতীর্থ ৪। সরস্বতী তীর্থ ৫। ঋণ মোচন তীর্থ ৬। পাণ্ডবতীর্থ ৭। দেবতীর্থ ৮। সুগ্রীবতীর্থ ৯। নলতীর্থ ১০। নীলতীর্থ ১১। গবাক্ষতীর্থ ১২। অঙ্গদতীর্থ ১৩। গজ-গবয়-সরভ-কুমুদ তীর্থ, ১৪। বিভীষণ তীর্থ ১৫। ব্রহ্মহত্যা বিমোচন তীর্থ। ১৬। নাগবিল তীর্থ। ১৭। সেতু মাধব তীর্থ। ইহাতে প্রভুর সেনাগুলির নামে এক একটী তীর্থ হইয়াছে। অধিকাংশ তীর্থই কূপ ; কোনটী বা ক্ষুদ্র পুষ্করিণী।

যাত্রীদের কর্ত্তব্য।

ইহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ রামেশ্বর মহাদেব ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রীত্যর্থ ক্ষমতানুসারে গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তৎপরে ভস্ম অথবা গোপীচন্দন সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন করিয়া এবং ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক অথবা ঊর্দ্ধফোঁটা করিয়া রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে গৃহ হইতে যাত্রা করিবে। পথে হবিষ্যান্ন করিবে এবং বৃথা ক্রোধ করিবে না। সকল ইন্দ্রিয় সংযত রাখিবে। পাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না। তাম্বুল, তৈল ও স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা চিত্ত শুদ্ধ রাখিবে ও ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও গুণানুবাদ করিবে। তৎপরে সেতু মূলে উপস্থিত হইলে তথায় একখণ্ড পাষাণ নিক্ষেপ করিবে। তথায় কাহারও দান বা কোন বস্তু প্রার্থনা করিবে না। সন্ন্যাসী ভিক্ষুক প্রভৃতিকে যথাশক্তি ভিক্ষা প্রদান করিবে। দেবতাগণের সর্ব্বদা স্তোত্র পাঠ করিবে।

রামেশ্বরে উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে মহাসমুদ্রের আবাহন, নমস্কার ও অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক মনে মনে স্নানের অনুমতি লইয়া তৎপরে সমুদ্রে স্নান করিবে। স্নানান্তে যথাক্রমে দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ ও পিত্রাদি তর্পণ করিবে, আর অন্তরে শ্রীরামের স্মরণ করিবে। তৎপরে দেবদর্শন প্রভৃতি কার্য্য করিবে। সেতুবন্ধে সাতখণ্ড অন্ততঃ একখণ্ডও পাষাণ স্থাপন করিতেই হইবে। যেহেতু পাষাণ খণ্ড স্থাপিত না করিলে কিছুই ফল হয় না। পাষাণ প্রদানের মন্ত্র যথা :—

"পিপ্পলাদ সমুৎপন্নে কৃত্যে লোক ভয়ঙ্করে।
পাষাণং তে ময়া দত্তমাহারার্থং প্রকল্প্যতাম্॥"

তৎপরে আবাহন, অর্ঘ্য প্রদান, প্রণাম ও স্নান করিবে। অর্ঘ্য প্রদানের মন্ত্র ৮৮ পৃষ্ঠায়, নমস্কারের মন্ত্র ৮৪ পৃষ্ঠায় এবং সমুদ্র স্নানের মন্ত্র ৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তৎপরে সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। প্রার্থনা মন্ত্র—

"প্রাচ্যাং দিশি চ সুগ্রীবং দক্ষিণস্যাং নলং স্মরেৎ।
প্রতীচ্যাং মৈন্দনামানমুদীচ্যাং দ্বিবিদং তথা॥
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব সীতামপি যশস্বিনীম্।
অঙ্গদং বায়ুতনয়ং স্মরেন্মধ্যে বিভীষণং॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি প্রাবিশংস্ত্বা মহোদধে।
স্নানস্ত মে ফলং দেহি সর্ব্বস্মাৎ ত্রাহি মাম্ভসঃ॥"

তৎপরে নারায়ণের ধ্যান করিয়া অনুজ্ঞাপন করিবে। স্নানাদি ক্রিয়ায় নারায়ণ স্মরণ করিলে তাহার ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। অনুজ্ঞাপন মন্ত্র যথা :—

"অশেষ জগদাধার শঙ্খ চক্র গদাধর।
দেহি দেব মমানুজ্ঞাং যুষ্মত্তীর্থ নিষেবণে॥"

হে দেব! তোমাতে অসংখ্য অসংখ্য লোক অবস্থিত রহিয়াছে। হে শঙ্খচক্র গদাধারিন্! তোমার তীর্থ নিচয় সেবনের জন্য আমাকে অনুমতি

প্রদান করুন। তৎপরে সমুদ্রে তিল মিশ্রিত জলাঞ্জলি দ্বারা শিব, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সুগ্রীব, হনুমান্, নল, নীল প্রভৃতির তর্পণ করিবে। বিনা তর্পণে স্নানের ফল পাওয়া যায় না। তৎপরে জল হইতে উঠিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিবে। অনন্তর যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। ধনুষ্কোটী তীর্থেও এইরূপ পাষাণ খণ্ড দান, স্নান ও তর্পণাদি করিবে।

লক্ষ্মণ তীর্থে মস্তক মুণ্ডন, গো দান, ভূমি দান প্রভৃতি দানকার্য্য করিবে। তৎপরে রামতীর্থে স্নান করিয়া দেবালয়দর্শনে গমন করিবে। এক দিনে সমস্ত তীর্থে স্নান অসম্ভব তজ্জন্য তিন চারি দিবসে পূর্ব্বোক্ত সকল তীর্থে স্নান দান ও তর্পণাদি করিয়া নিষ্পাপ হইবে। রামেশ্বর মহাদেবকে দর্শন, ষোড়শ উপচারে পূজা প্রদান ও প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ, ভূমি, গো, তিল, ধান্য, অন্ন, বস্ত্র ও দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর রামেশ্বর মহাদেবের অনুমতি লইয়া সেতুমাধবে গমন পূর্ব্বক যথাশক্তি পূজা করিয়া বাসায় আসিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র ভক্তি পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিবে; তাহা হইলে সাযুজ্য লাভ হইবে।

রামেশ্বর দেবের পূজার প্রধান অঙ্গ গঙ্গোদক ও বিল্বপত্র। শুনিলাম এই গঙ্গাজল কাশী হইতে পদব্রজে আনয়ন করা হয়। (একথা কতদূর সত্য ও সম্ভবপর তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।) সুতরাং এই জল অতি মহার্ঘ্য; অতি ক্ষুদ্র এক শিশি জলের মূল্য ১৲ টাকা। ৫৲ টাকার কম বড় এক শিশি জল পাওয়া যায় না। ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে হইলে ৫৷৷০ টাকা লাগে, অষ্টোত্তর শত নামের অর্চ্চনার মূল্য ৷৴০ সহস্র নামের ১৲ দেবদর্শনের দক্ষিণা ৴০ আনা। এই সকল পূজার খরচ পাণ্ডার হস্তেই প্রদান করিতে হয়, কারণ স্বহস্তে পূজা করিবার কাহারও অধিকার নাই। পূজার সময় দূর হইতে বদ্ধকরে দর্শন ও প্রণাম করিবে এবং মনে মনে পূজা

করিবে। সেই সময় পাণ্ডাগণ যাত্রীর প্রতিনিধি হইয়া তাহার নামে সঙ্কল্প করিয়া ষোড়শ উপচারে পূজা, পক্কান্নের ভোগ প্রদান ও কর্পূরা-লোকে আরতি করিয়া, মন্ত্র পুষ্প প্রদানে পূজা সম্পন্ন করেন। সেই সময় অন্য তিন জন ব্রাহ্মণ সমস্বরে নমকং চমকং আদি বেদ গান করিতে থাকেন। ভগবানের এইরূপ অর্চ্চনা দর্শন করিলে ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রীদের সেই সময় আনন্দে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে থাকে। তখন মনে হয় আজ মানব জন্ম সার্থক হইল। সে সময় আর পাপ সংসারের কথা মনে থাকে না।

আমরা প্রভুর পূজার জন্য যে টাকা দিয়াছিলাম, তাহাতে পাণ্ডা-ঠাকুর রামেশ্বর দেবকে গঙ্গোদকে স্নান করাইয়া কর্পূরারতি ও নারিকেলাদি দ্বারা পূজা করিয়া শেষে অন্ন ভোগ প্রদান করিলেন। ছোট মালসার ভিতর যদি অন্ন সিদ্ধ করা হয় এবং সেই অন্ন যদি চাপ বসিয়া জমিয়া যায়, তৎপরে সেই জমাট অন্ন সমুদয়টী বাহির করিয়া লইলে যেরূপ দেখায় রামেশ্বর দেবের ভোগও দেখিতে তদ্রূপ। আমরা সেই জমাট অন্নভোগ সকলে মিলিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া খাইতে লাগিলাম; অন্নের সঙ্গে নারিকেল ও দুচারিটি বাদাম ছিল।

রামঝর্‌কা।

আমরা অপরাহ্নে কয়েকজন মিলিয়া এই স্থানে গমন করি। পথটী বালুকাময় ও প্রায় দুই মাইল হইবে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সেতু বন্ধনের সময় এই স্থানে বসিয়া সেতুর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তজ্জন্য এই স্থানের নাম রামঝর্‌কা। ইহা সমুদ্রতীরে বালুকাময় উচ্চ পাহাড়ের উপর একটী দ্বিতল মন্দির। পাহাড়টী সমুদ্র সমতল হইতে প্রায় ১০০ ফিট উচ্চ হইবে। এই মন্দিরের উপরিভাগ হইতে দেখিলাম চতুর্দ্দিকে সমুদ্র, মধ্যস্থলে এই রামেশ্বর দ্বীপ। অতিদূরে ভারতের বৃক্ষাদি

ধোঁয়ার মত দেখাইতেছে। চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বহুদূরব্যাপী, অতি মনোহর। সর্ব্বদা শীতল বায়ু বহিতেছে। সে দৃশ্য দর্শনে প্রাণ আনন্দ ও শান্তিতে ভরিয়া যায়। এখান হইতে সেতুটী বেশ দেখা যায়, তজ্জন্য মনে হইতে লাগিল, ভগবান্ এই স্থান হইতে সেতুর কার্য্য দেখিতেন, আজ আমরাও সেই স্থানে উপনীত হইয়াছি, আমাদের কি সৌভাগ্য! নিম্নতলস্থ মঞ্চোপরি শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা রহিয়াছে। আমরা ভক্তিভাবে সেই পাদুকা প্রণাম করিলাম। অদ্য আমাদের জীবন সার্থক হইল। বাসনাপূর্ণ হৃদয় ভক্তিরসে গলিয়া গেল। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। এই স্থানটী এমন রমণীয়, পবিত্র ও শান্তিপ্রদ যে এখান হইতে আর যাইতে ইচ্ছা করে না। নানাবিধ বৃক্ষে স্থানটী সমাচ্ছন্ন। মন্দিরের সোপানে ভিক্ষুক সকল বসিয়া আছে, দূর হইতে যাত্রী আসিতে দেখিলে তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। পুরীর যেমন স্বর্গদ্বার, এখানকারও তেমনি রামঝর্‌কা। এখানকার অর্চ্চক বলিলেন এই তীর্থ অতি প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের যথাবিধি পূজা, ব্রাহ্মণাদি ভোজন ও দানাদি করিলে অপুত্রকও গুণবান্ পুত্র লাভ করে। তপনদেব অস্তমিত প্রায় সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদিগকে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল।

দর্ভশয়ন।

সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র বানর সেনা লইয়া কিরূপে লঙ্কায় যাইবেন, তাহা সুগ্রীবের সহিত মন্ত্রণা করিয়া স্থির করেন যে, বরুণ দেবের সাহায্য ও কৃপা ব্যতিরেকে নক্র মকর সমাকুল অগাধ অম্বুধি উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। তজ্জন্য তিনি সাগরতীরে বরুণ দেবের কৃপা প্রার্থী হইয়া দর্ভশয্যায় প্রায়োপবেশন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রায়োপবেশনে থাকিয়াও বরুণ দেবের সাক্ষাৎ পাইলেন না।

তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া শরাসনে বাণ যোজনা করিলে বরুণ দেব মানবদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে বরুণ দেব বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নলের দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া অদর্শন হন।

যথায় শ্রীরামচন্দ্র দর্ভশয্যায় প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন সেই স্থান অতি পুণ্যতীর্থ। ইহা দক্ষিণ সমুদ্রতীরের পশ্চিম, চক্রতীর্থের ধারে সেতু-পতিদিগের রাজধানী রামনদ হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত ও তাহা বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া ঐ পুণ্যময় স্থান দর্শন করিতে পারি নাই। যাত্রীগণ চক্রতীর্থে যাইয়া স্নান করিবার সময় সমুদ্রপতি নারায়ণের মূর্ত্তি দর্শন করিবে। তৎপরে পশ্চিম পারে যাইয়া "দর্ভশয়" নামক দেববিগ্রহ দর্শন করিবে।

রামনাদ।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে মেডুরা হইতে মাণ্ডাপম্ আসিবার পথে Pumban Branch Lineএ রামনাদ নামক একটী বড় ষ্টেশন আছে। সেটী সেতুপতিদিগের রাজধানী। রামনাদের রাজারা সেতু-পতি উপাধি পাইয়াছেন। রামেশ্বর দেবের সেবার জন্য তাঁহারা ৯৬ খানি গ্রাম দেবোত্তর দিয়াছেন। রামনাদে উপস্থিত লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। ইহারা প্রায় সকলেই শৈব। জমিদারীর আয় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। সেতুপতিরা স্বীয় রাজধানী রামনাদে "কোদণ্ড-রামস্বামী, বিশ্বনাথ স্বামী, বাণশঙ্করী, নীলকণ্ঠী ও রাজরাজেশ্বরী দেবীর" মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে ২০টী ছত্রবাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রামেশ্বর দেবের মন্দির সেতু-পতিদের অধীন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহারাই মন্দিরের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

রামেশ্বর দেবের মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় ১,২০,০০০ টাকা।

তন্মধ্যে সেতুপতি প্রদত্ত ৯৬ খানি গ্রামের আয় প্রায় লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট যাত্রী দ্বারা সংগৃহীত হইয়া থাকে। অর্চ্চক প্রভৃতি ভৃত্যাদিগের মাসিক বেতন ৩০০ টাকা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাত্রীগণের নিকট হইতে প্রত্যহ ৫০ টাকার উপর সংগ্রহ হয়। শিব রাত্রির সময় প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়া থাকে। রামেশ্বর দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র। তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ। পাণ্ডাবৃত্তিই ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। এখানে কৃষি-প্রণালী নাই, তজ্জন্য পাণ্ডাগণের চাষের উপায় নাই। ভারত ও সিংহল হইতে খাদ্য দ্রব্য এই স্থানে আমদানী হইলে তবে ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদন হয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতি এই সকল ব্যবসায় করিয়া থাকে। হাটের দিন নানাবিধ ফল, তরিতরকারি, চাউল, কাষ্ঠ, হাঁড়ি, কল্‌সি প্রভৃতি বিস্তর দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল দ্রব্যের অনেক দোকানও আছে। আমি ৶৹ তিন আনা দিয়া একটি তরমুজ কিনিয়াছিলাম, সেটী ঠিক গোয়ালন্দের তরমুজের মত বৃহৎ ও খাইতে অতি সুস্বাদু। অসময়ে এমন উৎকৃষ্ট ফল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। আরও বিস্ময়ের কারণ এই কৃষিবিহীন দেশে এমন উপাদেয় ও টাটকা ফল কোথা হইতে আসিল?

়ে যদিও শস্যাদির চাষ আবাদ কিছু হয় না, কিন্তু নারিকেল ও তালবৃক্ষে চতুর্দ্দিক্‌ সমাচ্ছন্ন। আফিং গাঁজা ও তাড়ি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইতে গভর্ণমেণ্টের ০ হাজার টাকার উপর বার্ষিক আয় হয়।

মেশ্বরে আমরা ত্রিরাত্র বাস করিয়া ঊষাকালে তথা হইতে করিলাম। রাত্রে আমাদের পাণ্ডা সফল করিবার জন্য এক বিভূতি বা ভস্ম আনয়ন করিলেন। সেই ভস্ম দেখিয়া আমরা কোন প্রকার অন্ন প্রসাদ মনে করিয়াছিলাম। যখন সেই

দ্রব্য হাতে পাইলাম তখন দেখিলাম ইহা খাদ্য দ্রব্য নহে শুদ্ধ ভস্ম মাত্র। যাঁহার যেরূপ অবস্থা তিনি তদ্রূপ দক্ষিণা প্রদান করিলেন; তজ্জন্য বিশেষ কোন পীড়ন নাই। অনেকেই দুই এক টাকা করিয়া দিলেন, তবে স্ত্রীলোকগণ স্বেচ্ছানুসারে পাঁচ ছয় টাকা করিয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ২৫।৩০ টাকার কমে এখানে সফলের সময় নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত না; সে কথা অমূলক মাত্র। আমরা সকলে টাকা দিলে তিনি প্রত্যেককে সেই ভস্ম প্রদান করিলেন। ললাটে কিয়ৎ পরিমাণে সেই ভস্ম সকলে ধারণ করিলাম। তৎপরে পাণ্ডা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। প্রভু রামেশ্বর দেবের স্মরণ লইয়া অবশিষ্ট নিশা অতিবাহিত করিলাম। অতি প্রত্যূষে পাণ্ডার লোক আসিয়া দুই খানি গোশকট ভাড়া করিয়া দিলে আমরা তাহাতে চড়িয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। যাইবার সময় সাশ্রু নয়নে ভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া [illegible] হইতে বিদায় লইলাম। প্রভো! আর কি কখনও আপনার [illegible] দর্শন করিতে পাইব? আমাদের শাস্ত্রে ৪ ধামের কথা বর্ণিত [illegible] এই ভারতের চারিদিকে সেই চারিটী ধাম অবস্থিত। উত্তরে [illegible] বদরিকাশ্রম, দক্ষিণে রামেশ্বর, পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্র এবং পশ্চিমে [illegible] ভক্তপ্রাণ নরনারী ভক্তিভরে, এক কালে ঐ চারিধাম [illegible] হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে এক[illegible] শ্রীক্ষেত্র ও রামেশ্বর ব্যতীত অন্য দুইটি ধাম দর্শন হইল না। মনকে প্রবোধ দিলাম যতদূর অদৃষ্টে ছিল ততদূর হইল তজ্জ[illegible] আক্ষেপ কি?

"ভবিতব্যং ভবত্যেব তচ্চ লোকেন বুধ্যতে।
যদ্ভাব্যং তদ্ভবত্যেব যদভাব্যং ন তদ্ভবেৎ॥"

বৃহন্নারদীয় পু[illegible]

"বিশেষ তীর্থং পরং কিং, স্বমনো বিশুদ্ধং"। অর্থাৎ সকল তীর্থের সার কি? স্বীয় মনের বিশুদ্ধতা। এখন মনের তাদৃশ জোর নাই, তাই এ তীর্থ সে তীর্থ করিয়া বেড়াই। আমরা সংসারের বদ্ধ জীব, সংসার মায়ায় অন্ধ হইয়া আত্মতীর্থ বিস্মরণ হইয়াছি। তাই তীর্থ তীর্থ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।

মনো! ন্যত্র শিবোঽ ন্যত্র শক্তি রন্যত্র মারুতঃ।
ইদং তীর্থ মিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাননে॥

জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র।

তামস প্রকৃতি লোকের মন অন্য স্থানে, শিব অন্য স্থানে, শক্তি অন্য স্থানে, বায়ু অন্য স্থানে এবং সে এই তীর্থ, এই তীর্থ করিয়া ভ্রমণ করে। হে বরাননে! যাহারা আত্মতীর্থ জ্ঞাত নহে, তাহাদের কিরূপে মোক্ষ লাভ হইবে? কিন্তু তীর্থ ভ্রমণ না করিলে, নানা দেশে ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল না দর্শন করিলে, তাঁহার মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, মনের অন্ধকার দূরীভূত হয় না, জ্ঞানের বিকাশ হয় না, চিত্তের সংকীর্ণতা ও নীচতা ঘোচে না, নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি হয় না এবং সংসারের অনিত্যতা সহজে বোধগম্য হয় না। বিশেষ অধ্যয়ন বা শ্রবণ অপেক্ষা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে কোন বিষয়েরই সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ হয় না।

প্রভাত ৬টার সময় গাড়ী ছাড়িল, আমরা আবার সমুদ্রতীরে আসিলাম। ক্ষুদ্র বাষ্পযানে আরোহণ করিয়া আমরা সংক্ষুব্ধ সাগরের উপর দিয়া ভারত অভিমুখে চলিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই তীরভূমি অদৃশ্য হইল, এক্ষণে কেবল চতুর্দ্দিকেই নীল জলরাশি অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিলিত হইয়াছে দৃষ্ট হইল। প্রভাতালোকে সেতুর

দৈর্ঘ্য সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হইল। সকলেই বলিয়া উঠিলেন ঐ সেতু, ঐ সেতু। সেতু দেখিলেই ভগবান্ রামচন্দ্রকে মনে হয়। যেমন জগতের বিষয় ভাবিলে জগৎপতিকে মনে পড়ে, তদ্রূপ সেতু দেখিয়াই সেতুপতি শ্রীরামচন্দ্রকে মনে পড়িল। তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া সেতুকে নমস্কার করিলাম।

"দশ যোজন বিস্তীর্ণং শত যোজন মায়তং।
রামচন্দ্র সমাদিষ্টং নল সঞ্চয় সঞ্চিতং॥
দশকণ্ঠশিরশ্ছেদহেতবে সেতবে নমঃ।
কেতবে রামচন্দ্রস্য মোক্ষ-মার্গক হেতবে॥"

সেতুর সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আমরা পাম্বান্‌কুলে আসিয়া পৌছিলাম। বাষ্পতরি হইতে সকলে অবতরণ করিয়া মাণ্ডাপম্ ষ্টেশনে আসিয়া টিকিট ক্রয় করিলাম। এইবার আবার পাপ সংসারের জন্য গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। সকলে গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম। আর কি কখন সেই পুণ্যভূমি রামেশ্বরধাম দর্শন হইবে! পাঠকগণ একবার তথায় যাইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া আসুন।

ওঁ পূর্ণ মদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাব শিষ্যতে॥

"ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

পরিশিষ্ট।

পঞ্চম অধ্যায়।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইবার পথে যে সকল তীর্থ আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত চারি অধ্যায়ে বর্ণিত হইল; কিন্তু এতদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে আরও কয়েকটী দর্শন যোগ্য স্থান ও তীর্থ আছে তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যদিও সে সকল স্থানে আমাদের যাইবার সুবিধা হয় নাই, তথাপি পাঠক বর্গের অবগতির নিমিত্ত যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই পুস্তকের পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হইল।

কিষ্কিন্ধ্যা।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বেজওয়াড়া হইতে একটী লাইন মান্দ্রাজ গিয়াছে, আর একটী লাইন গণ্টাকুল জংসনের উপর দিয়া গিয়াছে। শেষোক্তটীর নাম দক্ষিণ মারহাট্টারেল। এই লাইনে গণ্টাকুল ষ্টেশন ছাড়াইয়া হস্‌পেট নামক একটী ষ্টেশন আছে। রামায়ণোক্ত কিষ্কিন্ধ্যা, ঋষ্যমূক ও মাল্যবান্ পর্ব্বত এবং পম্পাসরোবর প্রভৃতি দর্শন করিবার বাসনা হইলে (South Marhatta Ry.) দক্ষিণ মহারাষ্ট্র লাইনে এই হস্‌পেট নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়। এই স্থান হইতে ৭ মাইল দূরে হাম্পি নগর। এখন আর নগরের তেমন শ্রী নাই। হাম্পিতে আসিলে কিষ্কিন্ধ্যা, ঋষ্যমূক পর্ব্বত প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুণ্যতোয়া তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ ভাগে হাম্পি ও বাম ভাগে ঋষ্যমূক পর্ব্বত। হস্‌পেট হইতে হাম্পি পর্য্যন্ত বেশ বাঁধান পাকা রাস্তা এবং গাড়ী ভাড়াও অতি সুলভ। এই ৭ মাইল রাস্তা যাইতে একখানি গো যান দেড় টাকা মাত্র

লইয়া থাকে। হাম্পিতে অনেকগুলি দেবমন্দিরও আছে। এখানে পাণ্ডা পাওয়া যায় না, সুতরাং তীর্থাদি প্রদর্শনের নিমিত্ত একজন পথপ্রদর্শক হসপেট্ ষ্টেশন হইতেই সংগ্রহ করিয়া লওয়া উচিত। সহায় শূন্য অপরিচিত স্থানে পাণ্ডাই একমাত্র ভরসা। আজকাল অনেক লোক পাণ্ডার উপর বিশেষ চটা, কিন্তু তাঁহারা যদি একবার আপন ভরসায় অপরিচিত তীর্থে গমন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় নিজভ্রম বুঝিতে পারিবেন। সকল সভ্য দেশেই ভ্রমণ করিবার জন্য পথপ্রদর্শকের বন্দোবস্ত আছে, এবং তজ্জন্য তাহাদের পারিশ্রমিকও দিতে হয়, তবে আমাদের দেশের পাণ্ডা প্রথার দোষ কি? পাণ্ডারা না হয় স্বল্পমূল্যে পুণ্যক্রয়ের লোভ দেখাইয়া নানা বাবদে অর্থ আদায় করে, কিন্তু উহারা যাত্রীগণকে যেরূপ আত্মীয়ের ন্যায় নিজ বাটীতে স্থান দেয়, রন্ধন করিয়া আহার্য্য দেয়, অসুখ বা বিপদ উপস্থিত হইলে যেরূপ ভাবে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করে, তাহার তুলনায় সে দোষটী সামান্য। বিশেষতঃ পাণ্ডার আশ্রয়ে যাত্রীদের কখনও চুরি যাইতে শুনা যায় নাই। আমার পরিচিত কয়েকজন এই হাম্পিতে গমন করিয়া পাণ্ডার অভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন, এবং সকল স্থানও দেখিতে পান নাই। তজ্জন্য হস্পেট্ হইতে একজন পদপ্রদর্শক সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজন। যাহা হউক হাম্পি এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। হাম্পির এক দিকে তুঙ্গভদ্রা নদী, এবং অপর দিকে পর্ব্বতশ্রেণী, এই কারণে উহা বহিঃশত্রু হইতে সুরক্ষিত। "নরপতি" রাজারা হাম্পিতে অনেকগুলি সুন্দর দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উক্ত দেবালয়ের অনেকগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। তন্মধ্যে বিরূপাক্ষ, রামস্বামী, বিটোবা ও নরসিংহ স্বামীর মন্দির প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক মন্দির ও মণ্ডপ কালের করাল গ্রাসে বিলীন হইতেছে।

বিরূপাক্ষ মন্দিরে পদ্মাবতীশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। ইহার গোপুর (Gate) শিবালয় এবং সম্মুখের মণ্ডপ অতিবৃহৎ, গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। সম্মুখে প্রস্তরমণ্ডিত বৃহৎ তিপ্পকুল পুষ্করিণী। ১৩৩৫ অব্দে মাধবাচার্য্য বা আনন্দতীর্থ এই স্থানে ষড়্‌দর্শন সংগ্রহ ও বহুবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের টীকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। গোপুরের সম্মুখস্থ রাস্তার দুই পার্শ্ব, মণ্ডপ, পান্থশালা ও বিপণিতে পরিবৃত। এই রাস্তায় রথোৎসব হইয়া থাকে। পদ্মাবতীশ্বর রথে চড়িয়া অর্দ্ধ মাইল দূর-স্থিত বৃহৎ মণ্ডপে আসিয়া বিশ্রাম করেন। তৎকালে পান্থশালা ও মঠ বহু জনতায় পরিপূর্ণ হয়, এবং বিপণিতে নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সুশোভিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত মণ্ডপের পার্শ্ব দিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে আসিয়া অর্দ্ধ মাইল গমন করিলে রামস্বামীর মন্দির। পরপারে ঋষামূক পর্ব্বত। ভগবান্ রামচন্দ্র ঋষ্যমূকে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া তুঙ্গভদ্রায় স্নান করিয়া দক্ষিণ তীরে যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহারই উপর রামস্বামীর মূর্ত্তি স্থাপনা হইয়াছে বলিয়া, উহা বৈষ্ণবদিগের অতিশয় পুণ্যক্ষেত্র। এখানে যাত্রীগণ নারিকেল ফাটাইয়া দেবতার সম্মুখে বলি প্রদান করে। মন্দিরাভ্যন্তরে রামসীতার মূর্ত্তি বিরাজিত। চতুর্দ্দিকেই বানর সকল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষলতাদি ও নিম্নে তুঙ্গভদ্রা নদী থাকায় স্থানটী অতি মনোরম এবং আশ পাশে গ্রাম না থাকায় একান্ত নির্জ্জন, ঠিক যেন প্রাচীন ঋষিদের আশ্রম। সাধন ভজনের পক্ষে প্রশস্ত স্থান বলিয়া অনেক সাধু এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তটভূমি তুঙ্গভদ্রা হইতে অনেক উচ্চ। নদীতে নামিবার কোনরূপ বাঁধা ঘাট নাই। পার্ব্বত্যস্থান বলিয়া অনেক পাথর পড়িয়া থাকায়, জলে অবতরণ করিবার বিশেষ কোন কষ্ট নাই। খরস্রোতা তুঙ্গভদ্রার স্রোতোজল প্রস্তরে প্রতিহত

হইয়া অতি সুমধুর কল্লোলধ্বনি উঠিতেছে। সন্ধ্যা উপাসনা পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের স্তোত্রধ্বনি মিলিত হইয়া, যে কি শ্রুতিসুখকর শব্দ উত্থিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। এই নদী উপকূলে বসিয়া সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি মহাদেবের অংশাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের আলোচনা করেন, এবং বেদান্তাদির ভাষ্য সকল রচনা ও বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি কত গ্রন্থই প্রচার করেন। এই স্থান হইতে তুঙ্গভদ্রার তট দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে শৃঙ্গগিরিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সিংগেরি মঠে গমন করা যায়। ইহাই তৎপ্রতিষ্ঠিত আদি ও প্রধান মঠ। এই স্থানে তিনি সরস্বতী মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রগ্রন্থ ও মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

রামস্বামীর মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে সুপ্রসিদ্ধ বিটোবা মন্দির। ইহার গঠনপ্রণালী ও প্রস্তরোপরি সুচারু কারুকার্য্য একটী দেখিবার জিনিষ। তালিকোটার যুদ্ধের সময় দুর্বৃত্ত যবন সেনা এই দেবালয় লুণ্ঠন করিয়াছিল। তাহারা ধনলোভে মূল স্থান পর্য্যন্ত খনন করিয়াছিল, এবং দেবমূর্ত্তিকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই ঘটনা ৩৪০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, তদবধি দেবালয় হতশ্রী ও মূর্ত্তি বিহীন হইয়া পড়িয়া আছে। পাষণ্ডদের জন্য বিটোল দেবের এমন সুন্দর মন্দির ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ভগ্নস্থানের সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

বিটোবা মন্দিরের কিয়দ্দূরে নরসিংহ স্বামীর মন্দির। এই স্থানে আরও কতকগুলি ছোট বড় মন্দির ও মণ্ডপ আছে। মন্দিরগুলি সংস্কার অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তুঙ্গভদ্রার উপর "নরপতি" রাজগণকৃত সেতু স্তম্ভ দর্শনযোগ্য। হাম্পিনগরের পরিধি প্রায় ৮ মাইল, ইহার সর্ব্বস্থানেই "নরপতি" রাজগণকৃত মন্দির ও মণ্ডপের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভগ্নস্তূপ যেন দণ্ডায়মান হইয়া মোহান্ধ

মানবগণকে স্মরণ করাইতেছে যে, জগৎ মিথ্যা এবং জগদীশ্বরই সত্য। ব্রহ্মই সৎ অপর সমস্তই অসৎ, ইহা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখিয়া একমাত্র সেই ব্রহ্মেরই ভজনা কর।

ঋষ্যমূক পর্ব্বত।

ঐই পর্ব্বত তুঙ্গভদ্রার উত্তর তটে অবস্থিত। দুই মাইল ব্যাপী শৈলমালা উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষ লতাদি পূর্ণ পর্ব্বতমধ্য দিয়া তুঙ্গভদ্রা নদী সর্পের ন্যায় বক্র গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। এই পর্ব্বতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়। উহার উপরিভাগে একটী ক্ষুদ্র মন্দির এবং পাদদেশে তুঙ্গভদ্রার উপর মণ্ডপ ও ঘাট। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিম্নে একটী গুহা আছে। এই গুহায় সুগ্রীব, হনুমান্ আদি মন্ত্রিচতুষ্টয়ের সহিত বানররাজ বালীর ভয়ে লুকাইয়া বাস করিত। এইস্থান হইতে দেড় মাইল দূরে পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি একটী বৃহৎ মন্দির দৃষ্ট হয়। অঞ্জনা যে স্থানে মারুতিকে প্রসব করিয়াছিল, তাহারই উপর এই মন্দির নির্ম্মিত এবং অঞ্জনেয়স্বামীর নামে ঐ মন্দির উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

ইহার অনতিদূরে রামায়ণোক্ত তারাগড়, বালিকুট ও অঙ্গদকূট শৃঙ্গগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমস্ত স্থানই কিষ্কিন্ধ্যা। কিষ্কিন্ধ্যা সহরের আধুনিক নাম আনিগন্ধি। পূর্ব্বে ইহা খুব সমৃদ্ধ স্থান ছিল। এখানে এখনও বাজার, হাট, দোকান, স্কুল, পোষ্টঅফিস প্রভৃতি আছে। সহরের বহিঃপ্রদেশে দুটী ছতরি আছে। প্রথমটীতে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বালী বধ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ছতরিতে সুগ্রীবকে বানররাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানকার পার্ব্বত্য পথগুলি অতি বন্ধুর। এই স্থানের দুই তিন ক্রোশের মধ্যে ঋষ্যমূক পর্ব্বত, মাল্যবান্ পর্ব্বত, কিষ্কিন্ধ্যা, পম্পা ও মাতঙ্গ সরোবর প্রভৃতি

এককালীন দর্শন করা অতি কঠিন। অসমতল পার্ব্বত্যভূমি না হইলে এবং পথ ঘাট পরিষ্কৃত হইলে, অল্পক্ষণের মধ্যে সকল স্থান দেখা কষ্টকর নহে; সুতরাং ইহা সময় সাপেক্ষ। হসপেট্ ষ্টেশন হইতে হাম্পিতে আসিলে রামায়ণোক্ত কিষ্কিন্ধ্যা ও নরপতিরাজগণ কৃত মন্দিরাদি দর্শন হইয়া থাকে।

পম্পা সরোবর।

আনিগন্ধি হইতে এক ক্রোশ দূরে পূর্ব্ব কথিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতের যে অংশ তুঙ্গভদ্রা নদীর বামতটে অবস্থিত, তাহারই কোলে পর্ব্বত শ্রেণীর ভিতর বিখ্যাত পম্পা সরোবর। সরোবরের পরিমাণ ১৫।২০ বিঘা হইবে। ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানে মণ্ডিত। ইহার পার্শ্বে মাতঙ্গ সরোবর। ইহা একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মত। এই স্থানে মাতঙ্গ মুনি ও অন্যান্য ঋষিদিগের আশ্রম ছিল। এই কারণে এই সরোবরের নাম মাতঙ্গ সরোবর হইয়াছে। এখনও পম্পার সেই রামায়ণ বর্ণিত প্রফুল্ল কুমুদ কহ্লার ভূষিত, হংস কারণ্ডব কুলে পরিবৃত, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষী সমূহ দ্বারা শোভিত এবং জল কুক্কুট, টিট্টিভ ও ক্রৌঞ্চদিগের কূজনে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভক্ত প্রাণে আনন্দোৎপাদন করিতেছে। ভারতে যেমন ৪ ধাম আছে; তেম্নি ৪ সরোবরও আছে। ১ম উত্তরে মানস সরোবর, ২য় পূর্ব্বে (ভুবনেশ্বরে) বিন্দুসরোবর, ৩য় দক্ষিণে পম্পাসরোবর, ৪ পশ্চিমে (কচ্ছদেশে) নারায়ণ সরোবর। পুরাণে এই চারিটী পুণ্যতোয়া সরোবরের বিষয় বর্ণিত থাকায়, এই সকল স্থানে যাত্রিগণ ভক্তি সহকারে স্নান করিয়া থাকে। গ্রহণাদি পর্ব্বদিনে বহুদূর হইতে যাত্রিগণ পম্পায় স্নান করিতে আসিয়া থাকে। বহুদূর বিস্তীর্ণ, সাধুদিগের হৃদয়ের ন্যায় পম্পার অগাধ স্বচ্ছ জলরাশি এবং নানাবিধ কুসুমিত লতাজালে ও বিবিধ ফল ভরে নম্র

তরু সমূহে আবৃত, বিবিধ কুসুম গন্ধে সুবাসিত তীর ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পূর্ব্বের শোভা এখনও সমভাবে বর্ত্তমান। দর্শক বা ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত যে কেহ এখানে আসিলে ভগবদ্‌লীলায় প্রাণ আকৃষ্ট হইবে। পম্পা যদিচ সর্ব্বদা বহু যাত্রি-সঙ্কুল বা ঐশ্বর্য্যপূর্ণ তীর্থ নয় বটে; কিন্তু প্রাচীনতায় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা সকল স্থানকে পরাজিত করিয়াছে।

পম্পা সরোবরের উপর পম্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের মধ্যে ধর্ম্মশালা আছে, যাত্রীরা এই স্থানে বাস করে। মন্দিরটী দুই মহল, প্রধান গোপুরের পর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে। এই প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে ধর্ম্মশালার পৃথক্ পৃথক্ গৃহ এবং দেবতার উৎসবের মণ্ডপ, এবং মধ্যস্থানে জল পানার্থ কুয়া আছে। দ্বিতীয় মহলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ ও পম্পেশ্বর মহাদেবের মূল মন্দির অবস্থিত। সম্মুখে মহাদেবের নন্দী বা ষাঁড় আছে। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে নানা দেবতার প্রতিমূর্ত্তি এবং পার্ব্বতীর পৃথক্ স্থান আছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে একটী দরজা আছে। তাহার ভিতর দিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীতে যাওয়া যায়। এই মন্দির অতি প্রাচীন, সংস্কার অভাবে অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা দাক্ষিণাত্যের অপরাপর মন্দির অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন হইলেও আর্য্যাবর্ত্তের মন্দিরের হিসাবে অতি বৃহৎ। মন্দিরের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে ৩০।৪০ ঘর লোকের বসবাস ভিন্ন সমুদয় সহরটী জনশূন্য ও ভগ্ন অট্টালিকা স্তূপে পরিণত হইয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এক্ষণে পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য আর কিছুই নাই, কেবল তুঙ্গভদ্রা নদী ক্ষীণস্বরে অবিরত রাম নাম শব্দে প্রবাহিত হইতেছে মাত্র। এ সকল দেশে মৎস্য, মাংস বা তামাকের প্রচলন নাই।

মহিসূর।

দক্ষিণ মারহাট্টা রেলওয়ের অন্তর্গত মহিসূর ষ্টেট রেলওয়ের ইহা একটী বড় ষ্টেশন। প্রবাদ এই যে, মহিসূর প্রদেশে পৌরাণিক মহিষাসুরের রাজত্ব ছিল। এই স্থানে ভগবতী দুর্গা মহিষ মর্দ্দিনীরূপে দুর্দ্ধর্ষ মহিষাসুরকে বধ করিয়া চামুণ্ডা পর্ব্বতে বিশ্রাম করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী মাহাত্ম্যে ও দেবী ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে ইহার বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজধানী চামুণ্ডা পাহাড়ের নিম্নদেশে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর বিজয় নগরের অধীন ছিল। পরে এখানকার রাজা স্বাধীন হইলে টিপু সুলতান নগর অধিকার পূর্ব্বক দুর্গ ভগ্ন করিয়া তাহারই উপকরণে নজরাবাদে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৭৯৯ খৃঃ টিপুর মৃত্যুর পর ঐ সকল উপকরণ পুনর্ব্বার মহিসূরে আনীত হয় এবং তদ্বারা পূর্ব্বস্থানে দুর্গ নির্ম্মিত হয়। দুর্গটী সহরের দক্ষিণ দিকে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৪৫০ গজ হইবে। ইহার প্রাচীর এখনও উত্তম অবস্থায় আছে। বহির্দ্দেশে চারিদিকে খাত ছিল এক্ষণে ভরাট করিয়া পুষ্পোদ্যানে পরিণত করা হইয়াছে। মহিসূর নগরের আয়তন প্রায় ৩ বর্গ মাইল। এখানে গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত রেসিডেণ্ট আছেন। তাঁহার বাস-ভবন উৎকৃষ্ট ও দেখিবার সামগ্রী। দুর্গ মধ্যস্থ পথগুলি অপ্রশস্ত কিন্তু নগরের পথগুলি সুপ্রশস্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানকার অধিকাংশ বাটী কৃষ্ণালাচ্ছাদিত। নগরের দক্ষিণ দিকে দুর্গ, দুর্গের অভ্যন্তরে মহারাজার প্রাসাদ এবং রাজবংশীয় আত্মীয়গণের বাস ভবন। রাজবাটীর সম্মুখে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের সম্মুখে নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত চারিটী কাষ্ঠের খুঁটীর দ্বারা সুরক্ষিত এক প্রকাণ্ড দ্বিতল প্রাসাদ, এই প্রাসাদের নাম নবরাত্র মহল। এইস্থান একখানি রৌপ্য নির্ম্মিত বৃহৎ

সিংহাসন, কয়েক খানি বহুমূল্য চেয়ার, টেবিল, সোফা, অয়েলপেণ্টিং আলেখ্যাদির দ্বারা সজ্জিত রহিয়াছে। উক্ত গৃহের কপাট চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং গজদন্তের কারুকার্য্যে সুশোভিত। এইটী মহারাজার বসিবার গুপ্তগৃহ। ইহার পর দরবার বক্সীর দপ্তরখানা। দরবারের সময় এই স্থানে মহারাজ "দশহরা" নামক হলের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবেশন করিলে প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করে। এই রত্ন সিংহাসন ১৬৯৯ খৃঃ চিক্যদেবরাজ দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে উপহার পাইয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে হস্তিনাপুরের পাণ্ডবগণ উক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। ইহা ভূমিতে প্রোথিত ছিল। পরে বিজয়নগরের রাজা কোন সিদ্ধপুরুষের নিকট ইহার বিষয় অবগত হইয়া ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন। বিজয়নগরের ধ্বংশের পর উহা মহিস্থরের রাজা-দিগের হস্তগত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় সিংহাসনের প্রকৃত শোভা নাই। এক্ষণে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত সুচারু কারুকার্য্যের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য পত্র মণ্ডিত করিয়া তাহাতে পৌরাণিক মূর্ত্তি সকল অঙ্কিত করা হইয়াছে। দরবার ভিন্ন নবরাত্র মহলে মণিমুক্তা খচিত হীরকাদি শোভিত অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপতলে এই সিংহাসনে বসিয়া মহারাজ নয় দিবস ব্রত পালন করেন। অন্য সময় ইহা পার্শ্বগৃহে আবদ্ধ থাকে।

অম্ববিলাস নামক দ্বিতীয় তলে মহিস্থরের অনেক রাজকর্ম্মচারীর প্রতিকৃতি আছে। ড্রয়িংরুম নানাবিধ ঝাড় লণ্ঠন, সোফা, চেয়ার ও ছবিতে সুসজ্জিত। দেবালয় মহলে চামুণ্ডাদেবীর নকল মূর্ত্তি আছে। ইহাঁরও প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। ইহার পার্শ্বে নৃসিংহ দেবের মহল। মহিস্থরের রাজা অল্পদিন সাবালক হইয়াছেন। ইহাঁর সম্মানার্থ ২১ তোপ গভর্ণমেণ্ট দিয়া থাকেন। এখানে মহারাজার বিশ্রামাগার, আলেখ্যগৃহ, সঙ্গীতাগার, তোষাখানা, দপ্তর মহল,

নৃত্যশালা, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি দর্শনযোগ্য। বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় ৬০০ বালিকা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে। এবং তাহাদের জন্য ২৲ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত কয়েকটী মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজসরকারের গাড়ী করিয়া বালিকাদিগকে স্কুলে আনয়ন করা হয়। ৮।১০ বৎসরের বালিকা হইতে ২০।২২ বৎসরের রমণীগণ বিদ্যাশিক্ষা ভিন্ন বীণাবাদ্য ও গীত শিক্ষা করিয়া থাকে। রাজবাটী পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও সুসজ্জিত। বর্ত্তমান মহারাজ রাজভবন মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রাসাদের সম্মুখে অশ্ব শালা, এখানে ১২০টী অশ্ব আছে এবং দক্ষিণদিকে গোশালা, তথায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ন্যূনাধিক ৩০০ হৃষ্টপুষ্ট গাভী আছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি বিলাতী গাভী। মহারাজ স্বয়ং দুইবার ইহা পরিদর্শন করিয়া থাকেন। মহারাজের উদ্যান ও গ্রীষ্ম ভবন দেখিবার জিনিষ। মহিস্থর নগরটী অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ইহার বার্ষিক আয় ১৪৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ইহা একটী আদর্শ করদ রাজ্য। রাজার সৈন্য সামন্তও অনেক আছে। মহিস্থরে বিস্তর লৌহ ও মধ্যে মধ্যে স্বর্ণ পাওয়া যায়। এখানে প্রচুর পরিমাণে কাফি, তামাক, নারিকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি এবং ধান্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চামুণ্ডা মন্দির।

মহিস্থর নগর হইতে চামুণ্ডা পাহাড় প্রায় এক ক্রোশ। পাহাড়ের উপর চামুণ্ডা দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির। সমতল ভূমি হইতে পাহাড়টী প্রায় সহস্র ফিট উচ্চ। পাহাড়ে উঠিবার যে সোপান আছে তাহা অতি প্রাচীন। পুরাকালে পাথর কাটিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তজ্জন্য উপরে উঠিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। উপরে চামুণ্ডা দেবীর সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত বৃহৎ মন্দির। চামুণ্ডাদেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়া এই পর্ব্বতে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। দেবীর আদেশ ক্রমে পর্ব্বতোপরি মূলস্থান

মহিস্থরের ষাঁড়। (পৃঃ ৩০৫)

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মন্দিরের গঠন প্রণালী দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য দেবালয়ের সদৃশ। ইহা ৭টী প্রকোষ্টে বিভক্ত, চতুর্দ্দিক প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। সম্মুখে নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি বিশিষ্ট উচ্চ গোপুরম্। মূল মন্দিরাভ্যন্তরে অষ্টভুজাদেবী সিংহাসনোপরি দণ্ডায়মানা। মূর্ত্তি প্রস্তরময়ী ও নানা আয়ুধ ধারিণী; দক্ষিণ হস্তস্থিত ত্রিশূল দ্বারা ইনি অসুরকে বিদ্ধ করিতেছেন। বামহস্তস্থিত নাগপাশ দ্বারা অসুরকে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়াছেন। অসুরের মহিষাকৃতি দেহ, নরাকৃতি মস্তক ঘুরাইয়া দেবীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে। দেবী অন্যান্য হস্তে তরবারি তীর ধনুক চক্র প্রভৃতি ধারণ করিয়া রণবেশে যেন নৃত্য করিতেছেন। চালচিত্রে দেবর্ষি মহর্ষি যক্ষ রক্ষ ও নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি জগদম্বার স্তব করিতেছেন। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক ও গণেশ কিন্তু এখানে স্থান পান নাই। এই দেবীমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া আমাদের বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। এবং বাঙ্গালায় মা দশভুজা সপরিবারে পূজিত হইয়া থাকেন। পর্ব্বত পার্শ্বে ১৬ ফিট্ উচ্চ একখানি প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত সুন্দর একটী নন্দীর মূর্ত্তি আছে। ইহার একটী প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। দেবীর সম্মুখে পশুবলি হয় না। তবে পর্ব্বত নিম্নে পথের পার্শ্বে শূদ্রজাতিরা দেবীর উদ্দেশে পশুবধ করিয়া থাকে। বলিদানের সময় কিন্তু মন্ত্র পাঠ হয় না।

উক্ত চামুণ্ডাদেবী মহিসূরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সুতরাং রাজাদিগের কুললক্ষ্মী। তজ্জন্য রাজাগণ কর্ত্তৃক পর্ব্বতোপরি এই সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। শারদীয় পূজার সময় প্রায় শতাধিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সেই সময় ৯ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহারা হোম, যাগ, শ্রীসূক্ত, ভূসূক্ত, মন্যুসূক্ত, পুরুষসূক্ত এবং

সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন। হোম, জপ এবং বেদপাঠ এদেশের পূজার প্রধান অঙ্গ। অন্নব্যঞ্জনের মহানৈবেদ্য হয়; ব্রাহ্মণগণ রজনীতে তাহাই প্রসাদ পাইয়া থাকেন। রাজপরিবারবর্গ সকলেই দেবীর পূজা করিতে আসিয়া থাকেন।

দেবীর মন্দিরের সন্নিকটে নৃসিংহদেবের মন্দির অবস্থিত। ইহারও গঠন প্রণালী অতি উত্তম। সম্ভবতঃ মহারাজ চিক্কাদেব কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এখান হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে মহারাজের বিশ্রামাগার আছে। রাজপরিবার দেবদেবীদর্শন করিয়া পর্ব্বতোপরি এই বৃহৎ অট্টালিকায় বিশ্রাম করিয়া থাকেন। ইহা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত বলিয়া এখানে সর্ব্বদাই শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এখান হইতে মহিসূর রাজ্য যেন ঠিক চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি রমণীয়; যিনি এ অপরূপ দৃশ্য দেখিয়াছেন তিনিই তাহা অনুমান করিতে পারেন। এখানে দণ্ডায়মান হইলে দুর্গমধ্যস্থ রাজভবন, একদিকে শ্রীরঙ্গপত্তন এবং অন্যদিকে অতিদূরে ৪০ মাইল ঈশান কোণে শিবসমুদ্রে কাবেরী নদীর প্রপাত ধূমবৎ প্রতীয়মান হয়। পর্ব্বতোপরি একটী সরোবর এবং এজেণ্ট সাহেবের সুদৃশ্য বাঙ্গালা আছে।

পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিবার সময় দেবরাজু নামক একটী হ্রদ দৃষ্ট হয়। পথের পার্শ্বে স্বর্গীয় রাজাদিগের সমাধি স্থান আছে। এখানে স্বর্গীয় মহারাজ কৃষ্ণরায়ের সমাধির উপর একটী সুন্দর অট্টালিকা আছে। মহারাজ বৃহৎ কূর্ম্মাসনে বসিয়া জপ করিতেন। সমাধির উপর সেই কূর্ম্মাসন স্থাপিত করিয়া মহারাজের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এই সমাধি ক্ষেত্রে রাজা ও রাজপরিবারবর্গের বিস্তর প্রতিমূর্ত্তি আছে। রাজাদিগের মূর্ত্তির প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে কিন্তু পরিবারবর্গের মূর্ত্তির প্রত্যহ পূজা হয় না। সমাধি-

প্রাঙ্গণের নিকটে সাধু সন্ন্যাসীদিগের জন্য একটী ছত্রবাটী আছে। যাহা-হউক মহিস্থরে দেবী মহিষাস্থর বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা একটী পীঠস্থান। দাক্ষিণাত্যের তীর্থ যাত্রীর ইহা দর্শন করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়।

কাবেরী প্রপাত।

মহিস্থর ষ্টেটরেলে মন্দুর নামক ষ্টেশন হইতে উক্ত প্রপাত দর্শন করিবার সুবিধা ও বন্দোবস্ত আছে। ষ্টেশন হইতে প্রপাত ২৯ মাইল এবং বরাবর পাকা রাস্তা। এখানে অশ্বযান ও দেশীয় গোযান পাওয়া যায়, মূল্য ৪ টাকা এবং পৌছিতে ৪॥ ঘণ্টা সময় লাগে। পবিত্রতোয়া কাবেরী নদীর গর্ভে শিবসমুদ্র দ্বীপ। কানেরি ভাষায় ইহাকে "হেগগুরা" বলে। এই দ্বীপ দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল ও প্রস্থে ২ মাইল। কাবেরী কুর্গ-রাজ্যের ব্রহ্মগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া শিবসমুদ্রের দক্ষিণে দুইভাগে পৃথক হইয়া দ্বীপের উত্তরে আসিয়া আবার মিলিত হইয়াছে। তৎপরে মাদ্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়া শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ৪টী ধারায় বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম অর্দ্ধ-গঙ্গা। শিবসমুদ্র দ্বীপে অনেক দেবমন্দির আছে। এখানে কাবেরী নদীর উপর সহস্র ফিট লম্বা একটী প্রস্তর সেতু আছে। ৪০০ স্তম্ভের উপর উক্ত সেতু দণ্ডায়মান। গগন চাক্কী নামক স্থান হইতে প্রপাতের ভীষণ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে। গগন চাক্কীর ১ মাইল দূরে পূর্ব্ব তীরে কাবেরীর প্রসিদ্ধ প্রপাত। বীর চাক্কী নামক কাবেরীর দক্ষিণ শাখা হইতে এই প্রপাতের উৎপত্তি। ২০০ ফিট উচ্চ হইতে ভীমনাদে ভীষণ বেগে অমিত জলরাশি ২৩৫০ হস্ত পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া পতিত হইতেছে। বর্ষাকালে ইহার ভীষণ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়। তজ্জন্য শীতকালেই ইহা দর্শন যোগ্য।

কাবেরী প্রপাতের সম্মুখীন হইলে দর্শকের নেত্র মুদিত হইবে, ইন্দ্রিয় শিথিল হইবে, শরীর স্পন্দিত হইবে এবং তিনি বিঘূর্ণিত-মস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইবেন। যেন শত শত বজ্রাঘাত হইতেছে। প্রপাতের কি ভীষণ গর্জ্জন! কি ভয়ঙ্কর আস্ফালন! কি ঘোর আবর্ত্ত! ধূমের ন্যায় বারিস্ফুলিঙ্গে নভোমণ্ডল অন্ধীভূত। এ ভীম দৃশ্য বর্ণিত হইবার নয়। এ অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিলে, মনে' যুগপৎ ভয় বিস্ময় ও কৌতুহল উদ্দীপিত হইয়া থাকে। প্রধান শাখা তীব্রবেগে অনাচ্ছাদিত শিলাময় খাতে পতিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ খাত প্রায় ৯০০ ফিট গভীর হইবে। ইহার পতন জনিত ফেন-সমন্বিত ঘূর্ণায়মান এক প্রকাণ্ড জলস্তম্ভের সৃষ্টি হইয়াছে। উহার বেগ এত তীব্র ও উহা এরূপ প্রবল বেগে মুষল ধারে নিম্নে পতিত হইতেছে যে, জলরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডলে একখানি অপূর্ব্ব মেঘের সৃষ্টি করিয়াছে। জলের অন্যান্য ধারা পড়িবামাত্র প্রস্তরের ঘাত-প্রতিঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এক ভীষণ দৃশ্যে পরিণত হইতেছে। ইহার প্রধান শাখা দেখিয়া ক্রিষ্টি সাহেব (পর্য্যাটক) কহিয়াছেন যে এই প্রপাত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও ইহার অদ্ভুত বারিবর্ষণ। জগদ্বিখ্যাত নায়েগ্রায় ইহা অপেক্ষা অধিক জল পতিত হয় বটে, কিন্তু ইহার উচ্চতা নায়েগ্রা অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহার উচ্চতা ৮৮৮ ফিট এবং ইহাতে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৬০০০ ঘন ফিট জল পতিত হয়। ইহার ভীষণ ভাব দর্শন করিলে ইহাকেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রপাত বলিয়া অনুমান হয়। বর্ষাকালে ১৪।১৫টী ভিন্ন ভিন্ন প্রপাতে পরিণত হয়। অসীম সাহসিক ব্যক্তিরাই এই প্রপাতের সম্মুখীন হইতে পারে, নচেৎ সাধারণজনগণ এই প্রপাত দেখিয়া জগৎপতির বিচিত্র সৃষ্টি কৌশলের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

শ্রীরঙ্গপত্তন।

মহিসূর প্রদেশে বাঙ্গালোর ও শ্রীরঙ্গপত্তন এই দুইটী নগর দর্শনযোগ্য। এখানকার ভূমি সমবিষম ও স্থানে স্থানে এক একটী গণ্ডশৈল প্রকাণ্ড শির উন্নত করিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ধান্যরাশি, তামাক ও কাফির উর্ব্বর ক্ষেত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহিসূরের দশ মাইল দূরে শ্রীরঙ্গপত্তন। এখানে হাইদার আলির রাজধানী ছিল। এখানে ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীরঙ্গজীর প্রাচীন মন্দির বর্ত্তমান আছে। ইহাই আদি রঙ্গ নামে বিখ্যাত। শ্রীরঙ্গপত্তন কাবেরী নদীর চরদ্বীপে অবস্থিত। শ্রীরঙ্গজীর নামানুসারে উক্ত নগরের নাম শ্রীরঙ্গপত্তন হইয়াছে। গৌতম মুনির তিম্মন নামক জনৈক শিষ্য অঙ্গার হল্লী নামক পল্লীতে কোন বৃক্ষের নিকট বল্মীকস্তূপের ভিতর শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত মূর্ত্তির উপর গর্ভগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া পূজার বন্দোবস্ত করেন। তৎপরে ৩৫০ খৃঃ অব্দে বিশিষ্টা-দ্বৈতমত-প্রবর্ত্তক বিখ্যাত রামানুজাচার্য্য মন্ত্রবলে রাজকন্যাকে ব্রহ্মদৈত্য হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহারই চেষ্টায় উক্ত দেবালয়ের উপর বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হয়।

মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ গোপুর, গোপুরের চূড়ায় ৫টী পিত্তলের কলসী আছে। শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের নিকট নৃসিংহদেবের মন্দির আছে। উক্ত ২টী মন্দিরই মহিসূরের রাজার অধীন। দেবালয়ের ব্যয় কারণ মাহারাজ বাৎসরিক ৭১৮০ টাকা দিয়া থাকেন। শ্রীরঙ্গপত্তনে হায়দার আলি ও টিপুসুলতানের সমাধিমন্দির এবং আলা মসজিদ দেখিবার উপযুক্ত। টিপুসুলতান গঞ্জাম গেটের নিকট আঞ্জনেয় দেবের মন্দির ধ্বংস করিয়া তদুপরি উক্ত মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ইহার গঠন-প্রণালী অতি উত্তম এবং দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদের অনুকরণে প্রস্তুত।

বাঙ্গালোরে বেঙ্গলু নামক এক প্রকার শিম্বফল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, সম্ভবতঃ তাহারই নামানুসারে উক্ত নগরের নাম হইয়াছে। এখানে রাজবাটী, মিলার সরোবর এবং উদ্যান মধ্যস্থ মিউজিয়াম দেখিবার উপযুক্ত। হালসুর সরোবরের মধ্যে ক্যাণ্টনমেণ্ট বাজার। একটী ক্ষুদ্র খাল উভয় সরোবরকে সংযোগ করিয়াছে। মধ্যস্থলে কুবনপার্ক। এখানে একটী দুর্গ আছে। দুর্গের মধ্যে টিপুর প্রাসাদের চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কেরল প্রদেশ।

দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান বর্ণিত হইল, কিন্তু কেরল প্রদেশের আচার ব্যবহার জ্ঞাত হইলে পাঠকগণ আশ্চর্য্য হইবেন। তজ্জন্য এই দেশের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শেষ করিব। দেশ ভেদে রুচি বিভিন্ন, একদেশে যাহা সুন্দর, অন্য দেশে তাহা কদর্য্য বলিয়া পরিগণিত। এখানকার ব্যবহার বড়ই অদ্ভুত। পুত্রেরা বাপের নাম জানে না। মামার নামে পরিচয় দেয়। মাতা বাটীর সর্ব্বেসর্ব্বা এবং পথের পুরুষ আকর্ষণে-কুলগরিমা বৃদ্ধি করে। মাতা গত হইলে জেষ্ঠা কন্যা বাটীর কর্ত্রী হইয়া থাকে। ভাগিণেয়গণ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু পুত্র বিষয় পায় না। ইহারা যেন সর্ব্বদেশীয় আইন কর্ত্তাকে মূঢ় করিয়াছে। এখানকার সকলই অদ্ভুত।

কেরল প্রদেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ আছে যে, পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিলে, বিশ্বামিত্র ঋষির পরামর্শে একটী বৃহৎ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে

পরশুরাম কশ্যপ মুনিকে দক্ষিণাস্বরূপ এই ভারতভূমি প্রদান করেন। তখন ঋষিরা পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে আদেশ করিলে, তিনি কন্যা কুমারিকাতে গমন করিয়া বহুদিবস পর্য্যন্ত বরুণ দেবের উগ্র তপস্যা করেন। বরুণ দেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এই আদেশ করেন যে, তিনি যতদূর পর্যান্ত আপন পরশু নিক্ষেপ করিতে পারিবেন ততদূর ভূমি তাঁহার বাসস্থানের জন্য সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রদান করা হইবে। তখন পরশুরাম কন্যাকুমারিকা হইতে উত্তর দিকে আপন পরশু সজোরে নিক্ষেপ করিলে দক্ষিণ কেনারার অন্তর্গত গোকর্ণে পতিত হয়। বরুণদেবও কুমারিকা অন্তরীপ হইতে গোকর্ণ পর্য্যন্ত একখণ্ড ভূমি সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া পরশুরামকে প্রদান করেন। সেই ভূখণ্ড কেরল নামে অভিহিত। বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর কোচিন ও মালেবার কেরলের অন্তর্গত। উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড পরশুরাম ক্ষেত্র নামে অভিহিত। পরশুরাম উক্ত ভূমি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণা নদীর তীর হইতে ৬৪ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া কেরল প্রদেশকে ৬৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেককে এক এক ভাগ জমী প্রদান করেন। ব্রাহ্মণদের সেবা শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত নার্য্য নামক শূদ্রজাতি আনাইয়া প্রত্যেক গ্রামে বাস করান। যাহাতে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না পারে তজ্জন্য তাহাদের আচারভ্রষ্ট করিয়া দেন।

কেরল ব্রাহ্মণগণ নম্বুতিরী (নম্বু = বেদ + তিরী = বেত্তা) নামে অভিহিত। এই নম্বুতিরী হইতে নম্বুরী কথা হইয়াছে। উহাদের আবাস ভূমিকে "মন" অথবা "ইল্লোম" বলে। ইহার এক দিকে গৃহ-শ্মশান বা দাহভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে। নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ পুষ্পোদ্গমের পরে হইয়া থাকে। বালকগণ উপনয়নের পর হইতেই বেদাধ্যয়ন করিতে থাকে। প্রাপ্ত যৌবনে ইহাদের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তজ্জন্য অনেক নম্বুত্তিরী

বা নম্বরী কন্যা অবিবাহিতা থাকে। এই কারণে কন্যাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে ব্রাহ্মণীরা তথাপি সতী ও সাধ্বী হইয়া পতিসেবায় নিযুক্ত থাকে, কদাচ অন্য পুরুষের মুখ দর্শন করেন না। ইহাদিগকে ইল্লোম অর্থাৎ বাটীর বাহির হইতে হইলে মুখাবরণের জন্য একটী তালপাতার ছত্র সম্মুখে ধরিয়া গমন করিতে হয়। স্ত্রীলোকদের অন্তর্জনা কহে। প্রত্যেক অন্তর্জনার একটী করিয়া নায়ার (শূদ্র) দাসী থাকে। বহির্গমনকালে নায়ার দাসী সতর্ক করিয়া দিলে অন্তর্জনা-গণ আতপত্র দ্বারা মুখাবরণ করিয়া লজ্জা নিবারণ করে। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ ভ্রষ্টা হয় সে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার হস্তস্থিত সতীত্বের চিহ্নস্বরূপ তালপত্র কাড়িয়া লওয়া হয়, এবং বাটী হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। ব্যভিচারকারী পুরুষও ভ্রষ্টা স্ত্রীর সহিত সমাজচ্যুত হয়। যে সকল স্ত্রীর বহু বিবাহ হয় তাহারা পর্য্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্বামীর সহিত সহবাস করে। অর্থাৎ কোন যুবক যুবতীর নিকট যখন থাকিবে, তখন তাহার গৃহদ্বারে অস্ত্র বা দণ্ড রক্ষিত হয়, ইহা দেখিয়া অপরে সে দিকে অগ্রসর হয় না। এই হিসাবে দ্রৌপদী সতীপদ বাচ্য। কেরল দেশের এই সনাতন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া নার্য্য যুবতীগণ স্বেচ্ছানুসারে বহুপতি উপভোগ করিয়া থাকে। এদেশে স্ত্রীলোকেরাই যেন কর্ত্তা; তাহারা ইচ্ছামত পতি নির্ব্বাচন করে। যুবতী যাহার সংসর্গে গর্ভিনী হইয়া থাকে, তাহাকেই সন্তানের পিতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু সে সন্তান পিতার পিণ্ড দিবার অথবা পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয় না। মাতৃসম্পত্তিতে লালিত ও পালিত হইয়া মাতুলের পিণ্ডাধিকারী হয়। যদি কাহারও ভগ্নীর অভাব হয় কিংবা ভগ্নী বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে বংশ রক্ষার নিমিত্ত দত্তক ভগ্নী গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। মালাবারে ভগ্নী অতি আদরণীয় ও তদীয় সন্ততি যত্নের সহিত পালন করা হয়।

"কনিয়ার" নামক গ্রহাচার্য্য বা পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "পলিয়াণ্ডি," বিবাহ প্রথা আছে; অর্থাৎ দুই তিন বা চারি ভ্রাতা মিলিত হইয়া এক পত্নী বিবাহ করে। ইহাদের মধ্যে অনেক অবিবাহিতা কন্যা থাকিয়া যায় কনিয়ারের পুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। আতিপুরের থিয়ার ভ্রাতৃগণ এক স্ত্রী পছন্দ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে সহবাস করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পনিককর জাতি, সূত্রধর, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কাংসকার প্রভৃতি জাতিতে বহুস্বামী প্রথা আছে। এ দেশের দেবতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখীন হইলে পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই গাত্র অনাবৃত রাখা বিধি। নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই অনাবৃত বক্ষে থাকে। বক্ষ অনাবৃত রাখাই এদেশের নিয়ম। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে স্ত্রীলোকগণ যদি বক্ষ আবৃত করে তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে এবং ইহাতে তিনি অপমান বোধ করেন। উন্নত বক্ষোরূহ বিমুক্ত রাখিয়া স্ত্রীগণ যেন সভ্যতার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে। এদেশের স্ত্রীলোক সকল দেখিতে সুন্দরী নহে। প্রায় সকলেই কৃষ্ণবর্ণ, তন্মধ্যে কেহ কেহ শ্যামবর্ণ ও সুন্দরী হইয়া থাকে। ইহাদের সৌন্দর্য্যের ছাঁচগুলি নিটোলভাবে দেহ যষ্ঠি আশ্রয় করিয়া থাকে। নগ্ন মাধুরী বীভৎস না হইলে সময়ে সময়ে তৃপ্তিকর ও নয়ন রঞ্জক হয়। অনাবৃত বক্ষে সঞ্চরণ করা আমাদের পক্ষে নূতন বোধ হয়, কিন্তু এদেশের এই প্রথা দূষ্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। দেশ কাল ও পাত্রভেদে কতরকমই নূতন সামগ্রী চক্ষে পতিত হয়।

কেরল নায়ার প্রধান দেশ। দ্রাবিড় হইতে নায়েক উপপদধারী বর্ত্তমান বনিয়ার জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ মলয় প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নায়ার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। নায়ার অর্থে নারী পর্য্যায়। নার্য্য হইতে নারীয়র, তাহা হইতে নেয়ার, তৎপরে নায়ার হইয়াছে।

নায়ার শূদ্র জাতীয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা সৈনিক বৃত্তি করে অথবা বাহুবলের সহিত যাহারা বিদ্যা ও ধন লাভ করিয়াছে তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। নম্বুত্তিরী স্ত্রীগণ ঋতুকালে তিন দিবস এবং সূতিকাগারে এই নায়ার শূদ্রাণীর অন্নগ্রহণ করে। ইহাতে তাহাদের শুদ্ধাচার ভ্রষ্ট হয় না। অন্য সময়ে ইহাদের স্পর্শ করিলে স্নান করিতে বাধ্য হয়। নম্বুত্তিরী স্ত্রীগণ ও নায়ার স্ত্রীগণ উভয়ের মধ্যে তালিবন্ধন প্রথা আছে। বিবাহের পূর্ব্বে যে নিস্ফল বিবাহের অনুকরণ (courtship) করা হয় তাহাকেই তালিবন্ধন কহে। তৎকালে বাটীর সম্মুখে আটচালা উত্তমরূপে সজ্জিত করা হয়। শুভদিনে ও শুভলগ্নে বন্ধুবান্ধবগণ আমন্ত্রিত হয়। বরকর্ত্তা আপন পুত্রের জন্য কন্যা কর্ত্তার নিকট কন্যার কর প্রার্থী হয়, কন্যাকর্ত্তা বাগ্‌দানে পরিণয়ের দিন স্থির করেন। বর শুভদিনে শুভক্ষণে হস্তে মঙ্গল সূত্র ধারণ করিয়া বংশদণ্ড লইয়া কন্যার গৃহে ত্রিরাত্রি বাস করে। কন্যা উভয় পদের মধ্যমাঙ্গুলিতে রৌপ্য অঙ্গুরীয়ত্রয় ও গলদেশে মালাদ্বয় ধারণ করে। ঐ মালাকে তালি কহে। উহার একগাছি পিতার; অপর গাছি স্বামী কর্ত্তৃক উদ্বাহকালে প্রদত্ত হয়। বর ত্রিরাত্রি কন্যার গৃহে অবস্থান করিয়া বিবাহ পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া প্রস্থান করে। তদবধি পাত্রীর সহিত আর কোন সম্পর্ক থাকে না। তৎপরে কন্যা বয়ঃস্থা হইলে অন্য পুরুষকে নায়ক স্থির করিয়া পুনঃ বিবাহ করিয়া থাকে। সেই সময়ে যুবতীর বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হয়। বর স্ত্রীর পরিধেয় বস্ত্র ও মাখিবার তৈল দিতে স্বীকৃত হইলে শুভদিনে শুভলগ্নে উদ্বাহ কার্য্য সমাধা হয়। বিবাহকালে বর বস্ত্র ও তৈল আনিয়া স্ত্রীর হস্তে দিলে গৃহস্বামিনী পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানে তাহাকে সম্মানিত করে। পরে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইলে যুবক তদবধি অবিবাদে যুবতীর সন্নিধানে যাতায়াত করে। স্বজাতি হইলে রাত্রিকালে আহার

করে। ব্রাহ্মণ হইলে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না। যতদিন প্রণয় ও ভালবাসা থাকে ততদিন যুবক যুবতীকে মাখিবার তৈল ও কাপড় দিয়া থাকে। খাইবার খরচ দিতে হয় না। যুবক সঙ্গতিপন্ন হইলে অলঙ্কার পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। উভয়ের মনোমালিন্য ঘটিলে সহজেই বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায়। যুবক প্রদত্ত বস্তু যুবতী প্রত্যর্পণ করিলেই বিবাহ ভগ্ন হয়, তখন যুবতী অন্য পুরুষ নিয়োগে আবদ্ধ হয়। যুবতী একজনের নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলে অন্যের সহিত ব্যভিচার করে না। পতি ছাড়িয়া গেলে অন্য পতি গ্রহণ করে। ইহারা ঠিক আমাদের দেশের মুসলমানের পদ্ধতি অনুকরণ করিয়াছে। যাহাই হউক হিন্দুর চক্ষে ইহা অতি দূষ্য কিন্তু দেশভেদে প্রথা স্বতন্ত্র। ইহারা বিধবা হইলেও পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। বিবাহ ব্যাপারে ইহাদের অনেক খরচ হয়। গরীব হইলেও দুই সহস্র মুদ্রার কমে কেহ পার পায় না। এই কারণেই বোধ হয় সকলের বিবাহ হয় না।

মালবার দেশের পুরুষগণ সমস্ত গাত্রে চন্দন মাখিয়া থাকে ও শিরোদেশে শিখা রাখে। স্ত্রীগণ একটী অন্তর্বাস (কৌপিন) পরিধান করিয়া তৎপরে বাহির্বাস পরে, কিন্তু বক্ষ আবৃত করে না। মস্তকে চিকুর-দাম চূড়ার ভাবে সজ্জিত। কর্ণে সুবৃহৎ হিরণ্য কর্ণিকা কর্ণপত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া ত্বকের পরিধি মধ্যে অবস্থান করে। গলে সুবর্ণ হার, মনিবন্ধ অলঙ্কার বিহীন। ইহাদের কেশ অতিশয় দীর্ঘ হয়। তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণ বলেন "সজল ঘনরুচি কেরলী কেশ পাশ।"*

* "বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনক জন পদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে,
দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিত জঘনে চোৎকল প্রেয়সীনাম্।
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজল ঘনরুচৌ কেরলী কেশ পাশে,
কর্ণাটীনাং কটৌচ স্ফুরতি রতিপতি গুর্জ্জরীণাং স্তনেষু॥"

ইহারা সুন্দরী না হইলেও কেশের জন্য ললনাকুলে সুন্দরী পদ বাচ্যা। ইহারা বাঙ্গালীর মত দুইবেলা মৎস্য আহার করে। ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞ এবং স্ত্রীলোকেরাও বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিয়া থাকে। ইহাদের ভাষা কানারি। এক্ষণে অনেকে খৃষ্টান হইয়াছে। দেশী খৃষ্টান ভিন্ন অনেক পার্শী (ইহুদী) দৃষ্ট হইয়া থাকে। মালাবারের প্রাকৃতিক দৃশ্য বাঙ্গালার মত। বর্ষাকালে ভূমি সকল জলমগ্ন হয়। এখানে ধান্য ও নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু নারিকেল ও সুপারির চাষই এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। বৈশাখ মাসে দশ হাত অন্তর করিয়া দেড় হস্ত গভীর ও সেই পরিমিত প্রশস্ত গর্ত্ত খনন করিয়া নারিকেল চারা লবণ ও ভস্ম সহযোগে রোপিত হয়। মূল দেশে কিঞ্চিৎ সার-মৃত্তিকা প্রদান করিয়া জল প্রদত্ত হয়। ক্ষুদ্র নদীর ধারে নারিকেলের উদ্যান দেখিতে বড় মনোরম। স্রোতস্বিনীর উভয় পার্শ্বে অবিরল নারিকেল বৃক্ষরাজি অবিরল ফলগুচ্ছ ধারণ করিয়া নদী গর্ভে আনত রহিয়াছে। পশ্চাতে এক পংক্তি, তদনন্তর অন্যশ্রেণী, সারি সারি ভাবে চলিয়াছে। ইহার মধ্যে মধ্যে গুবাক আপন অঙ্গ মিশাইয়া সুষমা বিস্তার করিতেছে। এদেশের বনভূমি দেখিলে রামায়ণের বর্ণনা মনে উদয় হয়। শাল, তাল, তমাল, নীপ, কিংশুক, কদম্ব, বেতস, চম্পক, নক্তমাল প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষে মালবার ভূমি আচ্ছন্ন। এক এক গাছি বেত ২২৫ ফিট লম্বা; ভূরি ভূরি চন্দন বৃক্ষ। এ চন্দনের কিন্তু সুগন্ধ নাই। কর্ণাট, মহিসুর কাবেরী নদীর উৎপত্তি স্থান সন্নিহিত ভূভাগ, সুগন্ধিশালী চন্দনের আকর। কত জাতীয় কত বিশাল বৃক্ষ বিকটাকারে শাখা বিস্তার পূর্ব্বক বহুদূর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। এক একটা সেগুণ বৃক্ষ ৩০।৪০ হস্ত উচ্চ। তালের ঘটাই বা কত এবং তাহার পত্রের বিস্তারই কি ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর লতা সকল ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া উর্দ্ধে

উঠিয়াছে। গভীর অরণ্যে মাতঙ্গের বৃংহিত, ব্যাঘ্রের হুঙ্কার ও বানরের কিচিমিচি শব্দে বনভূমি দিবানিশি কম্পিত হইতেছে। নিস্তব্ধ বনে নিরন্তর ঝিল্লীরব এবং বৃক্ষ রাজির উচ্চ শিরে নানাবিধ পক্ষীর চিচি কুচি ধ্বনিতে সমস্ত অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে পুষ্পরেণু লইয়া সুগন্ধ মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে। এখানকার পর্ব্বতকে মলয় পর্ব্বত কহে। পশ্চিমঘাটের দক্ষিণ ভাগটা মলয় পর্ব্বত এবং নীলগিরি রামায়োণোক্ত দর্দ্দুর পর্ব্বত। এই মলয় গিরি হইতে মলয়ানিল প্রবাহিত হয়। এখানে প্রায় চিরকালই বৃষ্টি হইয়া থাকে। এখানকার পর্ব্বত হইতে বিস্তর নদী উৎপন্ন হইয়া সাগরে পতিত হইতেছে। নানাস্থানে কদলী কানন ও পর্ব্বত প্রান্তে এলাবন সকল সুদীর্ঘ হরিদ্রাবর্ণের ন্যায় জঙ্গলাবস্থায় বহুদূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। নানাবিধ ফল, জায়ফল ও দারুচিনি বৃক্ষে চতুর্দ্দিক শোভিত। লোকের আবাস ভূমিতে আম্র ও কাঁটাল বৃক্ষোপরি গোলমরিচের লতা বেষ্টিত থাকে। চন্দন, মরিচ, জায়ফল, জৈত্রী, সাগু, কফি এবং নারিকেলতৈল এখানকার প্রধান রপ্তানি। কোচিনের নারিকেল তৈল জগদ্বিখ্যাত। জায়ফলের গাছ নেবুর মত। ইহার আচার ও মোরব্বা খাইতে বড় সুস্বাদু। আঁটিটাই জায়ফল। এখানে স্বর্ণ লৌহ ও মধ্যে মধ্যে হীরকের খনি দৃষ্ট হয়। জল বায়ুও স্বাস্থ্যকর, আহার্য্য দ্রব্যও সুপ্রতুল। এখানে তণ্ডুলই প্রধান আহার। পনস্, আলু, সিম, বেগুন, কদলী প্রভৃতি তরকারিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পরন্তু মরিচ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

সিংহল।

সিংহল দ্বীপকে ভূচিত্রে দেখিলে "ভারত-হারের" ধুকধুকির মত দেখায়। টিউটিকরিন হইতে ষ্টিমারযোগে সিংহলে যাইতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে যখন রেল হয় নাই তখন বরাবর ষ্টিমার যোগেই যাইতে হইত। ভারত ও সিংহলের মধ্যবর্ত্তী সেতুবন্ধের পর্ব্বত শ্রেণীর প্রতিবন্ধকতা বশতঃ সিংহলের পূর্ব্বদিক দিয়া ষ্টিমার যাইত। তজ্জন্য পূর্ব্বে সকলকে "গাল" নামক বিখ্যাত নগরে সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইতে হইত। এক্ষণে রেল হওয়ায় সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। টিউটিকরিন হইতে যে ষ্টিমার ছাড়ে তাহা প্রথমে কলম্বো বন্দরে ধরে। তথা হইতে রেল পথে "কাণ্ডী," "গাল" প্রভৃতি স্থানে যাইবার বিশেষ সুবিধা আছে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি ইংরাজবাহাদুর সেতুর উপরে রেল বসাইয়া একবারে সিংহলে লইয়া যাইবেন; তাহা হইলে আর জলপথের প্রয়োজন হইবে না। সেতুবন্ধ দর্শনান্তে সিংহল ভ্রমণ অতি সুলভ হইবে।

ষ্টিমারে বসিয়া সিংহলের শোভা দেখিতে অতি সুন্দর। এইদ্বীপের অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয় বলিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ইহাকে স্বর্ণময়ী লঙ্কা বলিয়া গিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে নীল আকাশ, আর তরঙ্গ সঙ্কুল ঘন নীল সমুদ্র, আর সম্মুখে সিংহলের হৃদয়মুগ্ধ-কারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া যেন আত্মহারা হইতে হয়। প্রাণ তখন আপনা হইতেই বিশ্বপিতার চরণে অবনত হয়। ভগবানের এই স্নিগ্ধ প্রেম অতিবড় অবিশ্বাসীর হৃদয়কেও ধীরে ধীরে আপ্লুত করিয়া ফেলে। সমুদ্র প্রান্তর অস্পষ্ট নীলবর্ণ, তৎপশ্চাতে গৌরবর্ণ বালুতট, তাহার পশ্চাতে শ্যামবর্ণ বনরাজি, পরে মেঘমালার ন্যায় প্রতীয়মান বিরাট শৈলশ্রেণী; এই সকল বিভিন্ন বর্ণের সৌন্দর্য্যবহুল দৃশ্য একত্র মিলিত হইয়া কি চমৎকার শোভা ধারণ করিয়া আছে। বালুকাময়

বেলাভূমি একটী পীতবর্ণ রেখার ন্যায় দৃষ্ট হয়, তন্নিম্নে শুভ্র তুষারবৎ সাগরোত্থিত ফেন পুঞ্জ। কি অপূর্ব্ব শোভা! নানা পুষ্পে হরিৎলতাপল্লব সমাচ্ছন্ন। কুসুমকুঞ্জের মধ্যে কেবল নারিকেল বৃক্ষগুলি উন্নতশিরে দণ্ডায়মান থাকায় তটভূমি যেন চিত্রিত রহিয়াছে। তাহার পশ্চাতে পর্ব্বতশ্রেণী নীলকাদম্বিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দূরের পাহাড়গুলি দূরস্থিত মেঘের ন্যায় অস্পষ্ট, পর্ব্বত সকলের সানুদেশ মেঘজালে জড়িত। ষ্টিমারে বসিয়া দূরবীক্ষণ দ্বারা দর্শন করিলে সিংহলের শোভা আরও স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। স্থলে এই অপরূপ শোভা, আর জলে ধীবরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গি লইয়া মৎস্য ধরিয়া বেড়াইতেছে, এবং কিংহসগণ (Seagulls) মৎস্য আহরণের জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

কলম্বো।

ডিম্বাকৃতি সিংহল দ্বীপ দৈর্ঘ্যে ২২০ মাইল এবং বিস্তারে ১৪৫ মাইল। কলম্বো ইহার প্রধান নগর। কাণ্ডী ও গালসহর উপনগর। কলম্বো নগরে গভর্ণমেণ্টের অফিস, আদালত, বন্দর যাদুঘর লাটভবন কল্যাণী নদী ও মন্দির, গালফেস (Galleface) নামক ব্যারাক দুর্গ প্রভৃতি দর্শন যোগ্য। সিংহলীরা আম্রকে কোলম্বা কহে। সম্ভবতঃ এই কথা হইতে নগরের নাম কলম্বো হইয়াছে। কলম্বোর অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১,৬০,০০০। কলম্বো সহরেই লাটভবন ও রাজবাটী আছে। বন্দরে বিলাতের জাহাজ সকল রক্ষিত হয়। ঝড় ও তুফান হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহা জলমধ্যে প্রাচীর (Break-water) দ্বারা বেষ্টিত। এখানে একটী দুর্গ আছে, তাহার তিন দিক জল রাশিদ্বারা বেষ্টিত—যেন একটী যোজকের মত। ইহার পশ্চাতে আলোক স্তম্ভ (Light-house) আছে, ইহা ৯৭ ফিট উচ্চ। মিলিটারি আফিস,

রেভিনিউ আফিস, জেনারেল পোষ্ট আফিস, লাইব্রেরী, মেডিকেল মিউজিয়ম ও বিস্তর বিপণি এই দুর্গমধ্যে অবস্থিত। দুর্গের পশ্চাতে একটী হ্রদ আছে। নিবিড় নারিকেল বৃক্ষের ঘনচ্ছায়ায় দুর্গটী সর্ব্বক্ষণ শীতল থাকে। দারুচিনি, কোকো, নারিকেল এবং মুক্তা এখানকার প্রধান উৎপন্ন সামগ্রী। দারুচিনির বাগান চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বৃক্ষ উচ্চে ২০ ফিট পর্য্যন্ত হয়। কলম্বোতে ওলন্দাজগণ সর্ব্বপ্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করে। এক্ষণে এখানে পুরাতন ডাচ (Dutch church) গির্জা ও সমাধি স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। এখানে ২টী হিন্দু মন্দির ও মুসলমানগণের একটী সুন্দর মস্‌জিদ আছে।

সিংহলীরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ, কিন্তু অনেকে এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। যাহারা হিন্দু তাহারা প্রায় সকলেই শৈব। কলম্বো নগরে সী ষ্ট্রীটে বিস্তর তামিল শেঠীর বাস। ইহাদেরই দুইটী শিব মন্দির আছে। তামিলরা সকলেই শিবউপাসক। শেঠীরা প্রাতঃকালে শিবমন্দির হইতে বিভূতি মাখিয়া থাকেন। এখানকার ব্রাহ্মণগণ কোন প্রকার আমিষ দ্রব্য ভক্ষণ করেন না, কিন্তু শূদ্র বা অন্যজাতিরা কুক্কুট পর্য্যন্ত আহার করিয়া থাকে। কুক্কুট ভোজন এদেশে নিন্দনীয় নহে। ব্রাহ্মণগণ কট্‌কি পেড়ে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া খড়ম পায়ে দিয়া উৎকলবাসী ব্রাহ্মণের মত মস্তক-মুণ্ডন করিয়া বিচরণ করেন। তাঁহাদিগকে সকলেই শ্রদ্ধাভক্তি করে, এবং স্বামীজী বলিয়া সম্বোধন করে। সিংহলে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, বৌদ্ধদের সংখ্যাই অধিক। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ। ইঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহের মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন। বিবাহবিধি ইহাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ। বৌদ্ধগণের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, সুতরাং ইহাঁরা স্বহস্তে কোন জীবকে বধ করেন না। অন্য কেহ বধ করিয়া দিলে পশুমাংস ভক্ষণ করেন। ইহাঁদের মস্তক মুণ্ডিত,

পদ নগ্ন, পরিধানে গৈরিক বসন। ইহাঁরা সর্ব্বদাই সহাস্য বদনে বিচরণ করিয়া থাকেন।

সৌধমালামণ্ডিত কলম্বো নগর হইতে দুই ক্রোশ দূরে কল্যাণী মন্দির। ইহা চিরকলনাদিনী কল্যাণী নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে স্থানে স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত খোলার ছাদযুক্ত বাটী; স্থানে স্থানে নারিকেল পত্রাচ্ছাদিত কুটীর। সুতরাং এস্থানটী সামান্য গ্রামের মত। জনাকীর্ণ বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যবহুল রাজধানীর ক্ষুব্ধ কোলাহল তথায় নাই। চতুর্দ্দিকে হরিৎলতাপল্লব-সমাচ্ছন্ন কুসুমকুঞ্জ, তরু-শাখাসীন বিহঙ্গকুলের হর্ষকাকলীতে বনস্থলী প্রতিধ্বনিত। যেন প্রকৃতি দেবীর পবিত্রতা ও রমণীয়তার সজীবমূর্ত্তি বিরাজমানা। চিত্রের ন্যায় সুন্দর ও নয়নরঞ্জক মনোহর স্থানে বৌদ্ধগণ কল্যাণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মন্দিরাভ্যন্তরে একটী কাচাবরণ (glass case) মধ্যে বুদ্ধদেবের দারুময় বৃহৎ শয়ান মূর্ত্তি অবস্থিত। মুখখানি দেখিতে অনেকটা জগন্নাথের মত। এখানে উপাসনার বিশেষ আড়ম্বর নাই। উপাসকগণ কাষ্ঠফলকে বুদ্ধদেবের সম্মুখে পুষ্প, ধূপ, দীপ, নারিকেল আম্র প্রভৃতি রাখিয়া দেয়। কিন্তু মন্ত্র সহযোগে সেগুলি উৎসর্গ করে না। মন্দিরের পূর্ব্বপার্শ্বে একটী দাগোচ অর্থাৎ বুদ্ধাস্থির সমাধি মন্দির আছে। উক্ত মন্দির দেখিতে অতি বৃহৎ শ্বেত গোলার্দ্ধ। ভক্তগণ সমাধির চতুর্দ্দিকে দীপ প্রজ্বলিত করেন। মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে একটী অশ্বথ বৃক্ষ আছে, ইহাকে বোধিদ্রুম কহে। পাছে কাল সহযোগে বৃক্ষটি ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে বেদী প্রস্তুত করিয়া অতি যত্নসহকারে রক্ষা করা হইয়াছে।

বোধিদ্রুমের পশ্চিমে বৌদ্ধপুরোহিতদিগের আশ্রম। ইহাকে পাণশাল (পর্ণশালা) কহে; কিন্তু ইহা তৃণাচ্ছাদিত পর্ণ কুটীর নহে। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত মনোহর অট্টালিকা, কেবল ইহার বারণ্ডায় একটী

চালা আছে। পাণশালের মধ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধী শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। তাহার অধিকাংশ তালপত্রে লিখিত। কয়েকখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রবালমুক্তা বিজড়িত, মরকতাদি হীরক খচিত আবরণে জড়িত। বৌদ্ধপাণশাল যেন শান্তিনিকেতন। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে যথার্থই মনে যেন কে শান্তিরস ঢালিয়া দেয়। মুণ্ডিতশির, পীতাম্বর বৌদ্ধপুরোহিতগণ যখন তালপত্র খুলিয়া ত্রিপিটক গ্রন্থ পাঠ করেন, তখন মনে হয় যেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদের পবিত্র গীতা পাঠ করিতেছেন। বৌদ্ধগণ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি বিশ্বাস করিয়া থাকে।

সিংহল বঙ্গদেশ অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী, কিন্তু বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় যেমন বাণিজ্য, সিংহলের রাজধানী কলম্বো নগরে তেমন বাণিজ্য নাই। সিংহলের সর্ব্বত্রই নারিকেল বৃক্ষ ও দারুচিনির বৃক্ষ জীবিকানির্ব্বাহের একটী প্রধান উপায়। কলম্বোর দারুচিনির উদ্যান একটী দেখিবার জিনিস। এই বৃক্ষের অসাধারণ গুণ, ইহার কিছুই ফেলা যায় না। ইহার মূলে কর্পূর তৈল হয়, পত্রে লবঙ্গের তৈল এবং ডালে দারুচিনি বা ডালচিনি হয়।

কাণ্ডী।

সিংহলে রেল ও ট্রাম গাড়ীর সুবিধা থাকায় ২।৪ দিবসেই সমস্ত দ্বীপটা পর্য্যটন করা যায় এবং এক দিবসেই কলম্বো হইতে কাণ্ডীতে আগমন করা যায়। এখানকার মত নৈসর্গিক দৃশ্য জগতে অতি বিরল। ইংরাজগণ কাণ্ডী দেখিয়া বলেন "The first scenery in the world". বস্তুতই কাণ্ডীর নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভা অতুলনীয় ও ভুবন-বিখ্যাত। এখানে চতুর্দ্দিকেই উচ্চ উচ্চ পাহাড় দৃষ্ট হয়, সেগুলি হিমালয়ের শিমলা পর্ব্বতের সমান উচ্চ, কিন্তু তাহাতে

তুষার নাই। আদম শৃঙ্গ (Adam's peak) সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহা সমুদ্র হইতে ৮০০০ ফিট উচ্চ। আদমশৃঙ্গের চূড়াতে একটী পদচিহ্ন দৃষ্ট হয়; কেহ বলে উহা হনুমানের, কাহারও মতে উহা বুদ্ধদেবের।

কাণ্ডীতে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে বোটানিকেল গার্ডেন, হ্রদ এবং দন্তমন্দির। বৌদ্ধগণের উপাস্য দেবতা বুদ্ধদেবের দন্ত লইয়া এই প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তজ্জন্য ইহাকে দন্ত-মন্দির কহে। কলম্বোর কল্যাণী মন্দির অপেক্ষা কাণ্ডীর দন্ত মন্দির দেখিতে অতি সুন্দর। এখানে প্রত্যহ কতশত নরনারী আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করে। মন্দিরাভ্যন্তরে বুদ্ধদেব পদ্মাসনে যোগাবলম্বনে বসিয়া আছেন। পার্শ্বে একটী "ডাগোবা" আছে, দেখিতে সমাধি মন্দিরের মত; ইহারই অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের দন্ত স্থাপিত আছে। দন্তটি মণি-মুক্তা খচিত স্বর্ণ বাক্স মধ্যে স্থিত। কাণ্ডী নগর জন কোলাহলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। স্ত্রীপুরুষ দলেদলে পুষ্প হস্তে বুদ্ধদেবের মন্দিরাভিমুখে চলিতেছে। দিবারাত্র কাঁসর ঘণ্টার রবে নগর প্রতিধ্বনিত। মন্দিরের প্রথম বৃহৎ দ্বারদেশে কতকগুলি বিকট মূর্ত্তি আছে। মন্দিরস্থিত উদ্যানের প্রবেশপথে পুরোহিতগণ নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান। ইহারা কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গী না করিয়া নীরবে ভক্তগণ-প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছে। দেবতার দুই পার্শ্বে শত শত ধূপাধার হইতে সুগন্ধি নীলাভ ধূমরাশি ঊর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া মন্দির কক্ষ সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে। মন্দিরের বিজন অন্তরতম প্রদেশে পুরোহিতগণের পশ্চাতে পবিত্র স্থানে যোগাসনে উপবিষ্ট একটী বৃহৎ স্ফটিক বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। মূর্ত্তিটী এরূপ স্বচ্ছ যে উহাকে উপছায়া বলিয়া মনে হয়। ইহাঁর স্বচ্ছ ওষ্ঠাধরে যে অনন্ত মধুর হাস্য বিরাজমান, তাহাতে মনে হয় যেন সত্যসত্যই জীবিত প্রতিমূর্ত্তিই সহাস্য আস্যে বসিয়া আছেন।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে দুইটী সম্প্রদায় বর্ত্তমান। ১মটী অভিনব ব্রতী সামান্য ভিক্ষু, ২য়টী বৌদ্ধপুরোহিত শ্রমণ। শেষোক্ত শ্রমণ সম্প্রদায় আপনাদের ইচ্ছাকে বশীভূত করে, অর্থাৎ কোন বিষয়েই তাহাদের লোভ নাই—অনাসক্তি। আত্মবশীকরণই মোক্ষ বা নির্ব্বাণ লাভের উপায়,যেমন আমাদের সংযম। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ৮টী মাত্র বস্তু গ্রহণ করে। তিনখানি পরিধেয় বস্ত্র, একটী কোমর বন্ধ, একটী কমণ্ডলু, একটী ক্ষুর, একটী ছুঁচ ও একটী ছাঁকুনি। নূতন ভিক্ষু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করে। তৎপরে মন্দিরের দালান ও বোধি-বৃক্ষের (বটবৃক্ষ) চতুষ্পার্শস্থ ভূমি সম্মার্জ্জনী সহকারে পরিষ্কার করে। পানীয় জল উত্তোলন করিয়া ছাঁকুনি দ্বারা ছাঁকিয়া রাখে। গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিজ গুরুর সহিত কমণ্ডলুহস্তে ভিক্ষার্থ বহির্গত হয়। ইহারা মুখ ফুটিয়া কিছু যাজ্ঞা করেনা। কেবল দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান থাকে। ভিক্ষালব্ধ চাউল লইয়া গৃহে প্রত্যা গমন করিয়া রন্ধন করে। আহারান্তে গুরুর নিকট শাস্ত্রকথা শ্রবণ করে। সময় পাইলে নির্জ্জনে গমন করিয়া ধ্যান করে। ইহারা বিবাহ করে না, সুতরাং পুরোহিতের পদ বংশ পরম্পরাগত নহে, যেমন আমাদের দেশের মোহান্ত। কাণ্ডী নগরে বৌদ্ধপুরোহিতের সংখ্যা অধিক। বৌদ্ধদিগের মূলমন্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত "ওঁ পদম্ পানি ওঁ"। নেপাল, সিকিম, ও ভূটানের প্রচলিত মূলমন্ত্র এই; কিন্তু সিংহলের বীজমন্ত্র "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামঃ, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামঃ, সঙ্গং শরণং গচ্ছামঃ।" ইহাদের জপচক্রে মন্ত্র অঙ্কিত আছে, চক্র ঘুরাইলেই জপের ফল হয়। প্রধান যাজককে মহা থেরো বলে। বৌদ্ধ পুরোহিত গণের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ। আমাদের দেশের মহাপুরুষ বুদ্ধদেবই ইহাঁদের উপাস্য দেবতা। সিংহলের চতুর্দ্দিকেই বৌদ্ধমন্দির বিরাজিত। প্রায় সকল মন্দিরেই বুদ্ধদেব প্রায় ১২ হস্ত উচ্চ আসনে ধ্যান স্তিমিত লোচনে বসিয়া আছেন।

গাল নগরীতে যে বৌদ্ধমন্দির আছে, তথায় দেবতার দুই পার্শ্বে দুইটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। এখানকার পুরোহিতগণ বলেন যে প্রথমটী কোনাগম বুদ্ধ, দ্বিতীয়টী কাশ্যপ বুদ্ধ, তৃতীয় গৌতম বুদ্ধ। এই মন্দিরের প্রাচীরে নরক চিত্রিত আছে। ভয়ানক অগ্নি জ্বলিতেছে, চারিজন দৈত্য একটা পাপীকে ছিঁড়িয়া কাটিয়া খাইতেছে। এই মন্দিরে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তিও আছে। এই সকল মূর্ত্তির পূজা হয় না, কেবল বুদ্ধদেবের চরণপ্রান্তে রাশিরাশি পুষ্প বিকীর্ণ থাকে।

গাল নগর।

সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সমুদ্র কূলে ৭২ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা সিংহলের প্রধান বন্দর ছিল। কলম্বো হইতে সমুদ্রতীর দিয়া বরাবর এখানে রেলপথ আছে। গালনগরের (Point de galle) শোভাও নিতান্ত মন্দ নহে। সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ উন্নত শিরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। তটভূমি সমুদ্রের তরঙ্গরাজি আকণ্ঠ নিমগ্ন পর্ব্বতের মস্তকে রোষপূর্ব্বক আঘাত করিয়া ফেনরাশি উদ্গার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত উচ্চভূমি শ্যাম শোভা ধারণ করিয়া আছে। সূর্য্যকিরণে উদ্দীপ্ত উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ জলরাশি চক্‌চক্ করিতেছে। যেন সৃষ্টির সমুদয় শোভাই এখানে একত্রীভূত। জলের উপর ক্ষুদ্র তরী মৎস্যের ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এক একটী নৌকা আবার ডোঙ্গার মত সরু। গাল সহর দেখিতে অনেকটা আমাদের হুগলী বা শ্রীরামপুরের মত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে এখানেও বৌদ্ধমন্দির আছে। সমুদ্র নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর। গাল সহরে অট্টালিকা অতি

বিরল, প্রায় চতুর্দ্দিকে কদলীবৃক্ষের উদ্যান, ভগ্ন প্রাচীর ও খোলার ঘর বিদ্যমান। সকল গুলিই কিন্তু নয়ন-তৃপ্তিকর। এখানে পেয়ারা, লেবু পক্ক ও অপক্ক রম্ভা, নারিকেল, সজিনা খাড়া প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। গোলমরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, দারুচিনি প্রভৃতি মসলা বিস্তর উৎপন্ন হয়। ধান্য অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। চা, কাফি ও কোকো এখানকার প্রধান উৎপন্ন সামগ্রী।

জলবায়ু।

সিংহলে নিত্য বসন্ত বা নিত্য গ্রীষ্ম বিরাজমান। এখানে সূর্য্য অতিশয় প্রখর, তজ্জন্য সিংহলীরা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু সাগরোত্থিত শীতল সমীরণে সৌর তেজের এত লাঘব হয়, যে, সিংহলে বসন্তের নিত্যাধিকার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় প্রতি মাসেই বৃষ্টি হয়। যে সময়ে বৃষ্টি হয় না, সে সময়ও নভোমণ্ডলে শ্বেত মেঘ দৃষ্ট হয়। পৌষ মাসের নিশায় একখানা চাদর গাত্রে দিলেই চলে। বায়ুর তাপাংশ ফরেন হিটের তাপ-পরিমাণের ৮০ অংশের বড় উপরে উঠে না, এবং নিম্নেও নামে না। তজ্জন্য সিংহলে বার মাস পক্ক আম্র, পক্ক কাঁঠাল আনারস প্রভৃতি ফল জন্মিয়া থাকে। এখানে পনস তালিকা নামক একপ্রকার ফল জন্মে, দেখিতে ঠিক কাঁঠালের মত। এই ফল রন্ধন করিলে রুটীর মত খাইতে সুস্বাদ, এইজন্য ইংরাজেরা ইহাকে রুটী ফল (Bread fruit) কহে। এদেশে নানাবিধ সামগ্রী জন্মে কিন্তু ধান্য বেশী উৎপন্ন হয় না; এবং গোধূম, ছোলা, মটর, আলু প্রভৃতি ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এখানে সর্ষপ তৈলের আদৌ ব্যবহার নাই, সুলভ জাত নারিকেল ও তিল তৈল দ্বারা সমস্ত রন্ধন হইয়া থাকে।

সিংহলের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে বহু যোজন বিস্তৃত নারিকেল বন। কলম্বোর নারিকেল বৃক্ষ বঙ্গদেশের নারিকেল বৃক্ষ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। আম্র ও কাঁঠাল গাছ আমাদের দেশের অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ উচ্চ। সিংহলে এক ক্ষুদ্রকায় পাণ্ডুবর্ণ নারিকেল আছে তাহাকে রাজ নারিকেল (King cocoanut) বলে। ইহার জল মিশ্রির পানার ন্যায় সুমিষ্ট। নারিকেল বৃক্ষই এখানকার লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। নারিকেল হইতে তৈল ব্যতীত এক প্রকার মদ্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেল পাড়িবার সময় এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষ পর্য্যন্ত দড়ি দিয়া বাঁধা হয়। তাহা অবলম্বন করিয়া সমস্ত বাগান বিচরণ করা যায়। মাটীতে পা দিতে হয় না। নারিকেল তৈল নারিকেল দড়ি ও কাছি প্রস্তুত করিবার জন্য এখানে অনেক কল আছে। এখানকার অনেক লোকে তৃষিত হইলে জলপান না করিয়া নারিকেলোদক পান করে।

আচার ব্যবহার।

সিংহলীদের বর্ণ অনেকটা বাঙ্গালীর মত। তাহাদিগকে বাঙ্গালী অপেক্ষা বলবান্ বলিয়া বিশেষ বুঝা যায় না। ইহাদের মাথায় খোঁপা বাঁধা থাকে, তাহাতে একটী কাঁচকড়ার চিরুণি গোঁজা। স্ত্রীলোক আর শ্মশ্রু-বিহীন পুরুষকে প্রভেদ করা বড় কঠিন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই দীর্ঘকেশ। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পরিচ্ছদও একপ্রকার। পুরুষে কাছা দেয় না, গোঁপ দাড়ি প্রায় অনেকে রাখে না, সুতরাং স্ত্রী হইতে পুরুষ চেনা কঠিন। স্ত্রীলোকেরা গাত্রে পিরাণ দেয়, মাথায় কাপড় দেয় না। ইহারা চিরুণীর পরিবর্ত্তে মাথায় কাঁটা ব্যবহার করে। দরিদ্র সিংহলবাসীরা নারিকেল পাতায় গৃহ প্রস্তুত হয়। উলুখড় বা বিচালী এখানে বড় দুষ্প্রাপ্য। ইহারা ভৃত্যদিগকে বালক (Boy)

বলে। ৩০।৪০ বৎসরের ভৃত্যকেও বয় বলে। সিংহলীরা অল্প বয়সে বিবাহ করে। ইহারা বিবাহের জন্য জাতি বিচার করে না। ইহাদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টান হওয়ায় সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এদেশে অবরোধ প্রথা নাই। ইহাদের বড় ভূতের ভয়। ইহারা মৃতদেহ দাহ করে।

সিংহলীরা এখানকার নদীকে গঙ্গা বলে। আমাদের দেশেও গাং বলিয়া থাকে; গাং গঙ্গা শব্দের বিকৃতি মাত্র। নদীতে নানাজাতীয় মৎস্য জন্মিয়া থাকে। এখানকার সমুদ্রে পুঁটী, টাঙ্গরা, ও মৌরলা মৎস্য পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর মৌরলা অপেক্ষা এগুলি অনেক বড়। এখানে "আরাকোলা" নামক একপ্রকার মৎস্য পাওয়া যায়, তাহা অতি সুস্বাদু। ইলিস মৎস্যের তেমন স্বাদ নাই। সিংহলের কর্কট এক একটা কচ্ছপের মত। সিংহলের বনে যত প্রকার কাষ্ঠ আছে, তন্মধ্যে আবলুষ ও সাটীন কাষ্ঠই প্রসিদ্ধ। আবলুষ কাষ্ঠের উপর কচ্ছপের খোলার কাজ করা অতি সুন্দর বাক্স নির্ম্মিত হয়। আবলুষ কাষ্ঠের ছড়ি ও চৌকি, কাঁচকড়া ও সজারুর কাঁটা, হস্তিদন্তের প্রস্তুত নানাবিধ সামগ্রী পাওয়া যায়।

সিংহলকে বিধাতা যে কি অপূর্ব্ব রত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। এখানে দুর্ভিক্ষ নাই, দারুণ দারিদ্র্যও নাই; চির বসন্ত বিরাজমান। নন্দন-কানন-শোভিত গন্ধর্ব্বগীত-নিনাদিত, অপ্সরঃ-সেবিত স্বর্গভূমিও যেন সিংহলের নিকট পরাজিত। এখানে ভ্রমণ করিতে হইলে কবি, পণ্ডিত, পর্য্যাটক ও পুরাবৃত্তবেত্তা হইয়া ভ্রমণ করিতে হয়, নচেৎ সিংহলের সম্যক্ ভাব উপলব্ধি হয় না। এখানকার মুক্তা ভুবন-বিদিত। অন্যান্য রত্নের মধ্যে পদ্মরাগ মণি, বৈদুর্য্য, ইন্দ্রনীল, গোমেদ ও প্রবাল প্রসিদ্ধ। মরকত ভাল পাওয়া যায় না। সিংহলীরা কৃত্রিম মণি মুক্তা প্রস্তুত করিয়া নূতন লোকদিগকে ঠকাইয়া থাকে। পূর্ব্বে

প্রতিবৎসর মুক্তাফলদ কস্তুরী সিংহলের উত্তর পশ্চিম সমুদ্র হইতে উত্তোলন করা হইত। তাহাতে অনেক ছোট কস্তুরী নষ্ট হওয়ায় তিন বৎসর অন্তর এক্ষণে তোলা হয়। শুনিতে পাই গভর্ণমেণ্টের ইহাতে প্রায় ১২।১৬ লক্ষ টাকা লাভ হয়। ৬।৭ বৎসরের কস্তুরীতে ভাল ও বড় মুক্তা পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টম বৎসরের কস্তুরী প্রায় মরিয়া যায়, এবং মুক্তাও নষ্ট হয়।

উত্তর সিংহল।

কাণ্ডীসহরের উত্তরে সতের মাইল দূরে রেল পথে মাতালি নামক স্থানে যাওয়া যায়। এখান হইতে যান যোগে প্রায় ১৪ ক্রোশ দূরে গমন করিলে "দাম বালা" নামক স্থানের শ্যাম শষ্পাস্তরণমঞ্জু-তরঙ্গান্বিত পর্ব্বতশ্রেণী ও স্থানীয় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের সুচারু ছবি নয়ন-পথে পতিত হয়। এস্থানের শ্রেণী পরম্পরা রচিত শৈলমালার শোভা অতুলনীয়। এই সকল পর্ব্বত মধ্যে সুন্দর সুন্দর গুহা, মন্দির ও পর্ব্বতোপরি শিল্পবিদ্যার নিদর্শনসমূহ দর্শন করিলে মন আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়। এখান হইতে ৪০ মাইল দূরে বিখ্যাত অনুরাধা পুর। ইহা অতি প্রাচীন সহর। এখন এখানে রেল হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে হিন্দু রাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, শেষে বৌদ্ধগণও রাজত্ব করেন। এখানে এখনও অনেক মন্দিরের ভগ্নস্তূপ ও বহুমূল্য হর্ম্ম্যের প্রাচীন অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ২৫০।৩০০ ফিট উচ্চ উচ্চ দাগোবা বা ইষ্টক নির্ম্মিত পিরামিড ও মনুমেণ্ট সদৃশ উচ্চ স্তম্ভ সকল দৃষ্টিগোচর হয়। অনুরাধাপুরে গ্রেনাইট প্রস্তরের ১৬০০ স্তম্ভ যুক্ত রাজপ্রাসাদ ও প্রায় ২২০০ বৎসরের পুরাতন বোধিবৃক্ষ এখনও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রহিয়াছে।

রাবণের বাটী।

অনেকে অনুমান করেন যে এই অনুরাধাপুরে বা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে রাবণের বাটী ছিল। স্থানীয় লোকেরা কিন্তু ইহার বিষয় বিশেষ কিছু বলিতে পারে না। শুনিতে পাওয়া যায় উত্তর সিংহলে "রাবণ কোটা" নামক একটী স্থান আছে, সম্ভবতঃ সেই স্থানেই রাবণের বাটী ছিল। আবার অনেকে বলেন অনুরাধা পুরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে সমুদ্রতীরে "মারিচ চুক্কাধি" নামক একটী স্থান আছে, উহা মারিচের নামানুসারে হইয়া থাকিবে। ঐ স্থানে রাবণের বাটী ছিল এক্ষণে সমুদ্রগত হইয়াছে। ঐ স্থানের সমুদ্র-উপকূলে দণ্ডায়মান হইলে সমুদ্রমধ্যে ভাঁটার সময় একটী শ্বেতবর্ণ বাটীর মত দৃষ্ট হয়, আবার জোয়ারের সময় ডুবিয়া যায়, অনেকে বলেন ঐ টাই রাবণের বাটী ছিল। এখানে জলের এমনি স্রোত যে কোন জাহাজ বা ষ্টীমার কিছুই ঐ স্থানে যাইতে পারে না। এখানে একটী লাইট হাউস আছে এবং কাহাকেও উহার নিকট যাইতে দেওয়া হয় না।

বহু অনুসন্ধানেও রাবণের বাটীর বিষয় ঠিক জানিতে পারা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আধিক্যে রাবণের অস্তিত্ব বিষয় সন্দেহস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল শৈব হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা বলেন, উত্তর সিংহলে সমুদ্রতীরেই রাবণের বাটী ছিল, এক্ষণে সে সমস্ত সমুদ্রগত হওয়ায় উহার বিষয় ঠিক বলিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ রামরাবণের যুদ্ধ বহুকাল পূর্ব্বে হইয়া ছিল এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিছু বলা সুকঠিন। তবে সে যে এই লঙ্কাদ্বীপ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব্ব সেতু।

সম্পূর্ণ।

সিংহলের একখানি পত্র।

প্রিয় আশুবাবু—

আপনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গিয়াছিলেন। রামেশ্বর যাইবার পথে যে সমস্ত দর্শনযোগ্য স্থান আছে তাহা আপনি দেখিয়াছেন। অতএব বাহুল্য বোধে ঐ সকল স্থানের বিবরণ আপনাকে লিখিলাম না। উপস্থিত সিংহলের বিবরণ আপনাকে প্রেরণ করিলাম।

"রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে", সিয়ার সোলের স্বনামধন্য বদান্যবর জমীদার শ্রীল্ শ্রীযুক্ত কুমার রামেশ্বর মালিয়া বাহাদুরের সঙ্গে সিংহল যাওয়ার অধিকার ও সুবিধা পাইয়াছিলাম। ১৯০৯ সালের ১৫ই মার্চ্চ মদুরা হইতে বোট মেলে টিউটীকরিণ হইয়া আমাদের কলম্বো রওনা হওয়া পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। কলম্বোর মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কের হেডস্রফ্ অর্থাৎ প্রধান কোষাধ্যক্ষ মিঃ টি শোকানাথান মহোদয়কে আমাদের জন্য তথায় বাসা ঠিক করিতে পূর্ব্বেই চিঠি লেখা হইয়াছিল। তিনি বাসা ঠিক করিয়া সংবাদ দিলে পর, ১৪ই মার্চ্চ বৈকালে কলম্বোর জাহাজের কামরা রিজার্ভ করিবার জন্য বি, আই, এস, এন, কোম্পানীর এজেণ্টকে টেলিগ্রাফ্ করিয়া ১৫ই মার্চ সকালে আমরা আহারাদি করিয়া মালপত্রসহ ষ্টেশনে চলিলাম।

আমার বহু দিনের লঙ্কা দেখার অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া মনটা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্তু কুমার বাহাদুরের সঙ্গের অন্যান্য লোকজনের মুখে একটা বিষাদের ছায়া দেখিতে পাইলাম। লঙ্কা—সে যে রাক্ষসের দেশ—রাক্ষসেরা যে মানুষ খায়—এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। এমনকি তাহারা আমাকে কম্পিত ওষ্ঠে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিল, হ্যাঁগা ওটা কি সত্যি রাবণের লঙ্কা ? টিকিট কেনা হইল, মালপত্র লগেজ করা হইল। অবশ্য মতুরার ষ্টেশন মাষ্টার মিঃ কল্যাণং রাম আয়ার আমাদিগকে মালপত্র লগেজ করা, গাড়ীতে সুবিধামত উঠা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। মতুরায় থাকার সময়েও তাঁহার সৌজন্যে আমরা অতিশয় আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। বেলা ১১টার সময় বোট মেলে আমরা মতুরা হইতে টিউটীকরিণ অভিমুখে চলিলাম। এই ট্রেণটা মান্দ্রাজ বীচ ষ্টেশন হইতে বরাবর টিউটী-করিণে যায়। কলম্বো যাইবার জাহাজের সহিত ইহার যোগ আছে বলিয়া ইহাকে বোট মেল বলে। মতুরায় অবস্থানকালে ত্রিপর্ণ কুণ্ডরামের সুব্রহ্মণ্য দেবের বিশাল পার্ব্বত্য মন্দির (Rock Temple) ও পর্ব্বতের উপর সযত্নে রক্ষিত বৃষ্টির জলে অসংখ্য মৎস্যের ক্রীড়া দেখিয়া আসিয়াছিলাম। গাড়ী হইতে অদূরে ঐ পর্ব্বত দেখিয়া পুনরায় তৃপ্তিলাভ করিলাম। রাস্তার একদিকে কোথাও বা "তমালতালীবন-রাজিনীল" কোথাও বা শস্য-শ্যামল প্রান্তরের বিচিত্র সৌন্দর্য্য এবং অপরদিকে সিরুমালী পর্ব্বতের স্নিগ্ধ-গম্ভীর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা বেলা ৪টার সময় টিউটীকরিণ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াই দেখি যে তথাকার সবজজ মিঃ শ্রীনিবাস রাও তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে কুমার বাহাদুরের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে পাঠাইয়াছেন। জনৈক ইংরাজ ডাক্তার কলম্বোযাত্রীদিগকে এখানে পরীক্ষা করিয়া পাস করিলে তবে যাত্রীদিগকে জাহাজে যাইতে দেওয়া হয়। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের পরীক্ষা সেদিন শেষ না হওয়ায় তাহাদিগকে সে দিন জাহাজে যাইতে দেওয়া হইল না। ডাক্তার সাহেব আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া একখানি পাস দিলেন। আমরা কোথা হইতে আসিতেছি, কলম্বো কেন যাইতেছি ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশ্ন পুলিশ করিতে লাগিল। যথাযথ উত্তর

দেওয়া সত্বেও তাহাদের সন্দেহ দূর হয় না দেখিয়া আমরা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা কাল ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়া গাড়ী বীচের দিকে চলিল। বীচে অর্থাৎ সমুদ্রের ধারে গাড়ী দাঁড়াইলে ডাক্তারের পাশ ও আমাদের টিকিটগুলি ষ্টিমার কোম্পানীর লোক আসিয়া লইয়া গেল এবং ঐ পাস দেখিয়া রেলের টিকিটগুলি বদলাইয়া জাহাজের টিকিট আমাদিগকে দিল। যাহাদের ডাক্তারের পাশ ছিল না, তাহাদগকে জাহাজের টিকিট দেওয়া হইল না।

যে অর্ণবপোতে আমাদের কলম্বো যাইতে হইবে, সেটী তীর হইতে অনেক দূরে হারবারের মধ্যে নঙ্গর করিয়াছিল। তীর হইতে উক্ত জাহাজে ষ্টীম লঞ্চের সাহায্যে যাইতে হয়। এই ষ্টীম-লঞ্চটী বি, আই, এস, এন, কোম্পানীর সম্পত্তি বটে। এখানে আমাদের মালপত্র লইয়া কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই; কারণ গাড়ীতে যত জিনিষপত্র থাকে ষ্টিমার কোম্পানীর কুলিরা তাহা সমস্তই বিনা খরচে ষ্টীম-লঞ্চে লইয়া যায় এবং ষ্টীম-লঞ্চ হইতে বিনা খরচে জাহাজে উঠাইয়া দেয়। প্রথমতঃ কুলিদের কার্য্যকলাপ দেখিলে আশঙ্কা হয় যে, জিনিষপত্রগুলি লণ্ডভণ্ড হইয়া হারাইয়া যাইবে; কেননা সমস্ত আরোহীদের সমস্ত জিনিস পত্র এলোমেলো ভাবে লঞ্চের নিম্নে ফেলিয়া রাখে। আমি এইরূপ আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া কুলিদিগকে আমাদের মালপত্র লইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোম্পানীর জনৈক সাহেব কর্ম্মচারী জিনিষপত্র সম্বন্ধে আমাকে নিশ্চিন্ত হইতে অনুরোধ করিলেন; এবং বলিলেন যে এ পর্য্যন্ত এখান হইতে কাহারও কোনও জিনিষ হারায় নাই। আমরা ষ্টীম-লঞ্চে যাইয়া দেখি যে আরোহীদের যত লগেজ সব এলোমেলো ভাবে স্তূপাকার অবস্থায় নীচে এবং ডেকের উপর পড়িয়া আছে; কাহারও কোন জিনিষ একেবারে বাহির করা কঠিন।

সন্ধ্যা ৬টার সময় ষ্টীম-লঞ্চ জাহাজে আরোহীদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য টিউটীকরিণ বন্দর ছাড়িয়া দিল এবং আমরা হারবারেরও অদূরে আলোক মন্দিরের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে "গোলকোণ্ডা" নামক জাহাজে পৌঁছিলাম। আমরা আরোহীদের থাকিবার স্থানে যাইয়া নিজ নিজ স্থান অধিকার করিলাম। প্রথমে গুদামরক্ষক সাহেবের অনুমতি লইয়া আমাদের জিনিষপত্র গুলি দেখিবার জন্য গুদামে প্রবেশ করিলাম। আরোহীদিগের জিনিষপত্র ছাড়াও বহু মাল তথায় ছিল। এত গোলমালের ভিতর এবং কোন জিনিষের রসিদ দিয়া গ্রহণ না করিয়াও কোম্পানীর লোকগুলি যে আরোহীদের মালগুলি অটুট অবস্থায় তথায় রাখিয়াছে তাহা দেখিয়া কোম্পানীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অল্পায়াসেই আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র তথায় অক্ষত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। অন্য কাহারও কোন জিনিষ হারাইয়াছে বা নষ্ট হইয়াছে এমত শুনিতে পাই নাই। রাত্রিতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আমরা নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম।

প্রত্যূষেই নিদ্রাভঙ্গ হইল। ডেকে যাইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে যে দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইল তাহাতে আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। নিম্নে বিস্তীর্ণ নীল জলরাশি ঊর্দ্ধে বিশাল নীলাকাশ। ব্যাপ্তির অসীমত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। সৃষ্টির অতুল গাম্ভীর্য্যে মন অভিভূত হইল। তারপর সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য। অনেকেই সমুদ্রে সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কোন বর্ণনাই সে সৌন্দর্য্যকে অতিরঞ্জিত করিতে পারে নাই। ঐ যে দূরে বহুদূরে জলে ভাসমান সোণার থালা খানা ধীরে ধীরে আকাশে উঠিয়া ক্রমে মার্ত্তণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করে, সেই আলো ও ছায়ার অভিনব বিকাশ স্বচক্ষে না দেখিলে কোন বর্ণনার সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আমি প্রাতঃকৃত্য

সমাপন করিয়া মাল গুদামে যাইয়া আমাদের মাল পত্রগুলি গুছাইয়া এক স্থানে রাখিলাম। অবশ্য অন্যান্য আরোহীরাও তদ্রূপ করিলেন।

বেলা ৮টার সময় দূর হইতে "ধারানিবদ্ধের কলঙ্কলেখা"র ন্যায় বেলাভূমি দেখা যাইতে লাগিল। তীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনেক নৌকা পালভরে চলিয়া যাইতেছিল। ধীবরেরা মাছ ধরিতেছে দেখিতে পাইলাম। পূণ্যস্মৃতি স্বর্ণলঙ্কা দেখিবার বহুদিনের অপূর্ণ বাসনা শীঘ্র পূর্ণ হইবার আশায় মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বেলা ৮৷৷০টার সময় আমাদের পোতখানা কলম্বোর বিখ্যাত হারবারে পৌছিল। কলম্বোর হারবারটী অতিশয় মনোহর এবং ইউরোপ হইতে প্রাচ্যদেশে যত বাণিজ্য-পোত আছে তাহাদের আশ্রয় ও বিশ্রাম-স্থল বলিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই হারবারটী যে ব্রেক ওয়াটারের (Break Water) দ্বারা রক্ষিত তাহা অতিশয় দৃঢ়, মনোহর এবং পাশ্চাত্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার গৌরববর্দ্ধক। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা ও ভয়ঙ্কর ঝড় হইতে নঙ্গর করা জাহাজগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সমুদ্রের মধ্যে ইট ও পাথর দ্বারা প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া জাহাজ বাহির হইবার ও প্রবেশ করিবার সুন্দর উপায় করা হইয়াছে। সেই প্রাচীরের উপর দিয়া লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই লৌহবর্ত্মের সাহায্যে লৌহ প্রভৃতি ভারি বাণিজ্য দ্রব্য তরী হইতে তীরে এবং তীর হইতে তরীতে আনয়ন করা হয়। এই ব্রেক ওয়াটারের নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধন আর অলীক বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড যে বৎসর যুবরাজরূপে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই বৎসর তিনি এই ব্রেক ওয়াটারের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের জাহাজখানা হারবারে নঙ্গর করা মাত্র ডাক্তার সাহেব আসিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করিলেন এবং আমরা কোন সংক্রামক রোগের চালান আনি নাই বলিয়া সার্টিফিকেট দিলেন।

কলম্বোর কষ্টম কর্ম্মচারী সাহেব আসিয়া আমাদের সঙ্গে যে সব জিনিষ পত্র ছিল তাহার একটী তালিকা দাখিল করিতে আদেশ দিলেন এবং আমাদের তালিকা সত্য কিনা তাহা মিলাইয়া লইবার জন্য আমাদের পোর্টমেণ্ট গুলি খুলিতে চাহিলেন। কলিকাতার কষ্টম হাউসের কয়েকটী সাহেবের সহিত আমার পরিচয় আছে জানিয়া সাহেবটী পোর্টমেণ্ট খুলিয়া সমস্ত জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলার অসুবিধা হইতে আমাকে অব্যাহতি দিলেন। আমাদের সঙ্গে চেয়ার টেবিল ও রান্নার বাসন পত্রের উপর ২॥০ আড়াই টাকা শুল্ক আদায় করিয়া আমাদের জিনিষগুলি পারে উঠাইবার আদেশ দিলেন। এদিকে অনেক নৌকা আসিয়া জাহাজের গায়ে লাগিয়াছে এবং আরোহীদিগকে তীরে পৌঁছাইবার অধিকার লাভের জন্য একে অন্যের সহিত প্রতি-যোগিতা করিতেছে। যদিও পোর্ট আফিস হইতে আরোহীদের তীরে পৌঁছাইবার নিয়ম ও রেট বাঁধা আছে তথাপি মাঝিগুলি নিয়ম-লঙ্ঘন করিতে ইতস্ততঃ বোধ করে না। পোর্টের নিয়মানুযায়ী প্রতি আরোহীকে ১০ সেণ্ট করিয়া এবং প্রত্যেক লগেজেও ১০ সেণ্ট করিয়া দিতে হয়। টিফিন বাক্স ও ডেক-চেয়ার প্রভৃতি যাহা আরোহীরা নিজের সঙ্গে লইবেন তাহা বিনা মাশুলে লইতে বাধ্য। তথাপি মাঝিরা উক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনেক বেশী চার্জ্জ করে। তীর হইতে বহুসংখ্যক দোকানদার তাহাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে জাহাজে আসিয়া থাকে। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে লঙ্কার মণি ও মুক্তা উল্লেখ-যোগ্য। এই সব দোকানদারেরা অধিকাংশই অসৎ প্রকৃতি এবং কৃত্রিম মণিমুক্তা দ্বারা আরোহীদিগকে ঠকাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। মিঃ শোকানাথান তাঁহার ভ্রাতা মিঃ কার্ত্তিকসু সহ একখানি ষ্টীমলঞ্চ সহ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য জাহাজে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্যে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম। আমাদের জিনিষপত্র সমস্ত

ষ্টীমলঞ্চে উঠিলে আমরা ষ্টীমলঞ্চে চড়িয়া জেটিতে পৌছিলাম। জেটীর বাহিরে মিঃ লোকনাথান ফেঠিন ল্যাণ্ডো প্রভৃতি গাড়ী প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। আমরা মালপত্র সহ সহরের শোভা দেখিতে দেখিতে বেলা ১১টার সময় মিঃ লোকনাথানের বাড়ীতে পৌছিলাম। তথায় তিনি আমাদের অভ্যর্থনার যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন; এমন কি আমাদের জলযোগেরও প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে তাঁহার আদরের জন্য ধন্যবাদ দিয়া, আমাদের জন্য সিনামন গার্ডেনে ম্যাকার্থীরোডে গ্রীনসাইড নামক যে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল, সেই বাসায় চলিয়া গেলাম এবং তথায় যাইয়া রান্না হইলে আহারাদি সমাপন করিলাম।

কলম্বো সহরটী কলিকাতার ন্যায় বড় নগর না হইলেও স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের হিসাবে কলিকাতাকে পরাস্ত করিয়াছে। সহরের মধ্যে একটী সুন্দর স্বাভাবিক হ্রদ আছে। হ্রদটীর চারিদিকেই সুন্দর সৌধমালা বিরাজিত এবং মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই হ্রদটীর বিশেষত্ব এই যে, সমুদ্র হইতে ১রশি পরিমাণ মৃত্তিকার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইলেও ইহার জল লোনা নহে। কলম্বো সহরের সমুদ্রতীরটী অতিশয় মনোহর, এই স্থানটীকে গলফেস (galle-face) বলে। গল নামক বন্দর এখান হইতে কল্পনার চক্ষে দেখা যায় বলিয়া ইহার নাম গলফেস হইয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকে বিশাল ফেনিল হিল্লোলময় ভারত সমুদ্র, অপরদিকে বিচিত্র সৌধমালা-শোভিত দুর্ব্বাশ্যামল প্রান্তর। এই প্রান্তর ও সমুদ্রের মধ্য দিয়া একটী ধূলিশূন্য রক্তিমাভ সরল রাজপথ। সান্ধ্য বায়ু সেবনের জন্য এখানে কলম্বোর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গাড়ীতে ও পদব্রজে আসিয়া থাকে। এবং সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের অপরূপ শোভা উপভোগ করিয়া প্রফুল্ল মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। ফোর্ট নামক স্থানটী এখানকার ইউসেনিয় বাণিজ্যের ও

গবর্ণমেণ্ট আফিষের কেন্দ্রস্থল। পর্ত্তুগীজদের রাজত্ব সময়ে এখানে একটী দুর্গ ছিল বলিয়া এখন কোন দুর্গ না থাকা সত্বেও এ স্থানটী ফোর্ট বলিয়া অভিহিত হয়। কলম্বো সহরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য এইস্থানে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এখানে অনেকগুলি প্রকাণ্ড দ্বিতল ত্রিতল বাড়ী আছে। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট হাউস, টেলিগ্রাফ আফিস, গ্রেণ্ড ওরিয়েণ্টাল হোটেল, ভিক্টোরিয়া আর্কেড, ব্রিষ্টল হোটেল, কার্গিল কোম্পানীর দোকান, হোয়াইটওয়ে লেড ল কোম্পানীর দোকান প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য : এই স্থানে চ্যাথান ষ্ট্রীটে একটি আলোক মন্দির আছে। সমুদ্র হইতে রাত্রে এই আলোক মন্দিরের আলোক দেখিয়া নাবিকেরা তাহাদের গতি স্থির করিয়া চলে। এই স্থানটীতেই লঙ্কার মণিমুক্তার দোকান সমূহ বিরাজিত। মণিমুক্তার দোকানগুলি অধিকাংশই সিংহলী ও মুরজাতির দ্বারা পরিচালিত।

এই সহরের পেটা নামক স্থানটী দেশীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং অনেকটা কলিকাতার বড় বাজারের ন্যায়। পেটাতে মিউনিসিপাল মার্কেটে মাছ, মাংস, পশু, পাখী, শাক, সবজী, ফল মূল সমস্তই প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। এই বাজারই এখানে বড় বাজার। এখানে বঙ্গদেশের ন্যায় ছানার ও ক্ষীরের মিষ্টান্ন বা লুচি পাওয়া যায় না। এখানকার বৌদ্ধ-সিংহলী খাবার দোকানে হালুয়া এবং ময়দা ও সফেদার নানা প্রকার খাবার পাওয়া যায়। মুদির দোকানে চাল, ডাল নুন, রান্নার জন্য তিল তৈল, নারিকেল তৈল (সরিষার তৈল পাওয়া যায় না) শুকনো মাছ, রান্নার মশল্লা, গুড় চিনি কাষ্ঠ প্রভৃতি জিনিস বিক্রীত হয়। এখানে জিপটাম পেটীয়া ষ্ট্রীটে একটী চোলট্রী বা পান্থনিবাস আছে।

এখানে হিন্দুমাত্রেই বিনা খরচে তিন দিন আহার ও বাসস্থান পাইতে পারেন এবং তিন দিনের অতিরিক্ত থাকিতে হইলে দৈনিক ॥০ আনা

হিসাবে দিতে হয়। এখানে সাহেবের পরিচালিত একটী কাপড়ের ও দুইটী নারিকেল তৈলের কল আছে। এই কল সহরের বাহিরে বাম্বালা পেটীয়াতে অবস্থিত। কাপড়ের কলটীতে সুতাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। সহরে জলের কল, বৈদ্যুতিক ট্রাম, গ্যাসের আলো আছে। ট্রামের মাত্র দুইটী লাইন; একটী বোরিনা ক্রস পর্য্যন্ত, অপরটী গ্রাণ্ড পাস পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই দুইটী লাইনে সহরের প্রায় সমস্ত জনাকীর্ণ স্থানেই যাওয়া যাইতে পারে। ভাড়া প্রথম শ্রেণী ১৫ সেণ্ট এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ১০ সেণ্ট। এখানকার আফিষ ও বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার বন্দোবস্ত দেখা যায়। সহরের সিনামন গার্ডেন বা দারুচিনির উদ্যান নামক একটী স্থান আছে। এই স্থানটীতে পূর্ব্বে নাকি দারুচিনির বাগান ছিল। এখন দারুচিনি বাগান না থাকিলেও বহু দারুচিনির বৃক্ষ আছে। এই স্থানটীই সহরের বড়-লোক ও ভদ্রলোকের বাসস্থান। এখানে গৃহগুলি অতিশয় মনোহর। এখানকার বাড়ীগুলিকে কুটীর (cottage) বলে। বিলাতের কুটীরের অনুকরণে নির্ম্মিত ইটের প্রাচীর, খোলার চাল, কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ কৌশল ও ভঙ্গিমা বড়ই মনোহর।

এখানে একটী মিউজিয়ম আছে। মিউজিয়মের বাড়ীটী একটী বিস্তীর্ণ দুর্ব্বাশ্যামল কমপাউণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। লঙ্কায় প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন বহু শিল্পদ্রব্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধ সময়ের। এখানে রিক্‌স গাড়ীর অত্যধিক প্রচলন। এই সহরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ হইবে। তামিল ভাষী, মুর, ইউরোপীয়, বারঘার, ইউরেসিয়ান, সিংহলী এবং ভারতের গুর্জ্জর দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান এখানকার প্রধান অধিবাসী। তন্মধ্যে ইউরোপীয় ও ভারতবাসীরা কেবল বাণিজ্য উপলক্ষে তথায় বসবাস করিতেছে। আর অন্যান্য জাতিরা

আপনার দেশ বলিয়া তথায় ঘরবাড়ী তৈয়ার করিয়া পুরুষানুক্রমে আছে। এদেশের লোকগুলি অধিকাংশই কৃষ্ণকায়, খর্ব্বাকৃতি এবং বলিষ্ঠ। পুরুষেরা লুঙ্গি পরে ও কোট গায়ে দেয়। কাণ্ডী প্রভৃতি স্থানের পুরুষগুলি মাথায় অশ্বপাদুকার মত এক প্রকার চিরুণী মাথায় দেয় এবং পেণ্টলুনের উপর লুঙ্গি পরে। এখানে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই। স্ত্রীলোকেরা লুঙ্গি পরিধান করে এবং গায়ে বুককাটা জ্যাকেট দেয়। এখানকার সাধারণ স্ত্রীলোকের পোষাক-গুলি লজ্জা রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা এখন প্রায়ই গাউন প্রভৃতি পরিধান করিয়া থাকেন। অনুপাতে এখানকার অধিবাসী ভারতবাসী অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষায় বেশী শিক্ষিত বলিয়া বোধ হয়; সিংহলীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। তামিল ভাষীরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, তবে এখানকার হিন্দুদের মধ্যে কুক্কুট ভক্ষণ ও বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ নহে এবং উত্তরাধিকার আইনও হিন্দু আইন নহে। এখানকার অধিবাসীদের মাছ ও ভাতই প্রধান খাদ্য।

এলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, জয়িত্রি, চা, কাফি, আম্র, কাঁটাল, নারিকেল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, জয়িত্রি, চা, কাফি নারিকেল প্রভৃতি বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। এখানকার চা পৃথিবীর মধ্যে নাকি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এমন কি ১ পাউণ্ড চা বিলাতে নাকি ৩ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫৲ টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে। এখানে এত নারিকেল (নারিকেল বাগান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের স্থাবর সম্পত্তি) তথাপি এখানে নারিকেল সস্তা নয়। এখানে প্লাম্বেগোর খনি আছে। এই প্লাম্বেগোর ব্যবসা অতিশয় বিস্তীর্ণ। রত্নপুরাতে চুণি ও পান্না এবং ক্যাটস্ আই (বিড়ালাক্ষী) নামক বহুমূল্য জহরতের খনি আছে।

লঙ্কার জহরত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আদৃত হইয়া থাকে। এখানকার সমুদ্রে বহুমূল্য মুক্তা জন্মিয়া থাকে এবং তিন বৎসর পর তিন বৎসর এই মুক্তা উঠান হয়। এখানে বার মাস ভাল আঁব পাওয়া যায় কিন্তু সিংহলীরা বেশী আম্রপ্রিয় নহে। তাহাদের মনে বিশ্বাস সর্ব্বদা আম খাইলে অসুখ করে। এখানকার অধিবাসীরা ধান্যের চাষ খুব কম করে। ইহারা ভারত হইতে আমদানী চাউলের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইহার কারণ ধান্যের চাষ অপেক্ষা নারিকেল, চা প্রভৃতির চাষ অধিক লাভজনক। কাজেই এখানে খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য।

ইহা একটী ইংরাজাধিকৃত দেশ, এবং ক্রাউন কলনি (Crown Colony). এখানে একজন গবর্ণর আছেন এবং তাঁহার একটী ব্যবস্থাপক সভা আছে। এই ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় সভ্য আছে বটে কিন্তু তাঁহারা সাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইয়া সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিনিধি স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনিত হন। এখানকার গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব অধিকাংশই রেলওয়ে ও কাষ্টম হইতে আদায় হয়। এখানে ভূমি রাজস্ব বা ইনকম টাক্সের প্রচলন নাই।

কলম্বোতে তিনটী হিন্দু মন্দির আছে। একটী শিব মন্দির, একটী বিষ্ণুমন্দির ও অপরটী সুব্রহ্মণ্য দেবের মন্দির। কল্যাণী মন্দির— বৌদ্ধদের ইহা একটী বুদ্ধ মন্দির। ইহা অতিশয় প্রাচীন। মন্দিরটী দেখিলে অতিশয় প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। একটী গম্বুজের (cupola) মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি রক্ষিত আছে বলিয়া পুরোহিতেরা বলিয়া থাকে। কিন্তু অস্থি লোকচক্ষুর অগোচরেই রাখা হয়। এই মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধদেবের শয়ান মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে মহামুনি শাক্যসিংহ তৃতীয়বার যখন লঙ্কায় যান তখন তাঁহার শিষ্যেরা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এখানে বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে কিছু না দিলেও

তাহারা কিছু বলে না। তবে সকল যাত্রীই সাধ্যমত পূজা দিয়া থাকে। কলম্বো হইতে ৪ মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত। ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে হইলে ভাড়া ৫৲ পাঁচ টাকা লাগে। গাড়োয়ানেরা অনেক বেশী দাবী করে।

লঙ্কা দ্বীপটী প্রকৃতির লীলাভূমি। যে দিকে চক্ষু ফিরান যায় সেই দিকেই ফল-ফুল-শোভিত চিরশ্যামল বৃক্ষরাজি। একটীও মরাগাছ আমার নেত্রগোচর হয় নাই। বিস্তীর্ণ ময়দান সর্ব্বদাই সবুজ মখমল মোড়া বলিয়া বোধ হয়। সূচ্যগ্র ভূমিও কোমল ঘাসের আবরণ ছাড়া দেখা যায় না। একদিকে সমুদ্রের, অপরদিকে পর্ব্বতের গম্ভীর শোভা, তার মধ্যে বিচিত্র বর্ণের সজীব বৃক্ষরাজী। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

দেশপূজ্য স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "ইউরোপে তিন বৎসর" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, লঙ্কার সাধারণ লোকে রাম রাবণের যুদ্ধের কোন কথা জানে না। আমি কিন্তু এখানকার পর্ণকুটীরবাসী কৃষক ও মজুরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা বলে যে, অতি প্রাচীনকালে ঐ যুদ্ধ হইয়াছিল। রাবণের বাড়ী ঘর সমস্তই সমুদ্রগত হইয়াছে। সীতাপুরা নামক একটী স্থান এখনও বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ আছে ঐ স্থানে লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতাদেবীকে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐটীই নাকি পুরাণ প্রসিদ্ধ অশোক কানন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।

মাহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা পরিগ্রহণ সংখ্যা..........................

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
১৩.০৭/৮১			